প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৭

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদশিল্পী
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
আশীষ চৌধুরী
জয়দুর্গা প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

এটিল ও চিত্রাকে

সূচী

আমাদের প্রকাশিত অনুবাদকের অন্যান্য গ্রন্থ

আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ গল্প

ও হেন্‌রীর গল্প

মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প

মপাসাঁর বাছাই গল্প

মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প

ক্রীতদাস / এরিক করণ্ডার

লরেন্সের সেরা প্রেমের গল্প

রেবেকা / দাফন দ্যু ম্যরিয়া

আনা কারেনিনা / লেভ তলস্তয়

ভ্যালি অফ দ্য ডলস / জ্যাকলিন সুশান

স্বপ্ন নিয়ে / এরিখ মারিয়া রেমার্ক

দ্য আইল্যাণ্ড অফ ডক্টর মোরো / এইচ. জি. ওয়েলস

জ্যাক লণ্ডনের বাছাই গল্প (যন্ত্রস্থ)

পাখিরা

ডিসেম্বরের তিন তারিখে রাতারাতি হাওয়া পালটে শীত শুরু হয়ে গেলো। তার আগে পর্যন্ত বাতাসে ছিলো খুশিয়াল শরতের আমেজ, চষা মাঠে সমৃদ্ধির অন্তরঙ্গ সমারোহ।

যুদ্ধে গিয়ে দৈহিকভাবে অশক্ত হয়ে পড়ায় ন্যাট হকেন নিয়মিত ভাতা পেয়ে থাকে এবং খামারেও সে পুরো সময়ের জন্যে কাজ করে না। সপ্তাহে তিন দিন তার কাজ, সেখানে তাকে হালকা ধরনের কাজই দেয়া হয়। যদিও ন্যাট বিবাহিত এবং ছেলেপিলেও আছে, তবু নির্জনতাই তার ভালো লাগে—একা একা নিজের কাজ করাটাই তার সব চাইতে বেশি পছন্দ।

উপদ্বীপের দূরতম প্রান্তে, সমুদ্র যেখানে খামার-অঞ্চলটাকে দুধার থেকে ঘিরে রেখেছে, সেখানে বাঁধ তৈরি অথবা কোন দরজা মেরামতি করার কাজ দেয়া হলেই খুশি হয় ন্যাট। তারপর ঠিক দুপুর বেলায় কাজ থামিয়ে পাহাড়ের দুরারোহ অংশের ধার ঘেঁষে বসে, স্ত্রীর ভেজে দেয়া মাংসের বড়া খেতে খেতে পাখিগুলোকে লক্ষ্য করে। অশান্ত, অস্থির আর চঞ্চল ওই পাখিগুলো শরতকালে ঝাঁকে ঝাঁকে এই উপ-দ্বীপটাতে এসে হাজির হয়। গতির মধ্যেই জীবন কাটায় ওরা। এই পাক খেতে খেতে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, আবার পরক্ষণেই নতুন চাষ-করা-মাটিতে ফসল খাবার জন্যে স্থিতু হয়ে বসছে। কিন্তু খাবার সময়েও মনে হয় যেন খিদে না থাকতেও ওরা খাচ্ছে, খাচ্ছে অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তারপরেই নিবিড়-অস্থিরতা ফের ওদের আকাশে তুলে আনে—শিস আর চিৎকৃত আহ্বানে শান্ত সমুদ্রে আঁচড় কেটে উপকূল ছেড়ে চলে যায় ওরা।

শুধু তাড়া, শুধু অস্থিরতা—শুধু ডানায় গতির ছন্দ তোলা আর চলে যাওয়া। কিন্তু কোথায়, কোন প্রয়োজনে? শরতের অস্থির অতৃপ্ত আর বিষণ্ণ প্রেরণা ওদের মাঝে এক সম্মোহিনী মায়া ছড়িয়ে দেয়—শীত আসার আগেই গতির মাঝে নিজেদের বিলিয়ে দিতে হবে। ন্যাট ভাবে, হয়তো সাবধানী সঙ্কেতের মতো শরতকালে পাখিদের কাছে একটা খবর পৌঁছে যায়। শীত আসছে, ওদের মধ্যে অনেকেই শীতে ধ্বংস হয়ে যাবে। সময় পূর্ণ হবার আগেই মৃত্যুর আশঙ্কায় কিছু কিছু মানুষ যেমন জোর করে কাজ অথবা মূর্খতা করে থাকে, পাখিগুলোও ঠিক তেমনি করে। ভাবে, কাল আমরা মরে যাবো।

এ বছরটা শুরু হবার পর থেকেই পাখিগুলো যেন আগের চাইতে অনেক বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে। দিনগুলো শান্ত হবার দরুন ওদের এই বিক্ষোভ আরও বেশি প্রকট।

পশ্চিম দিকের পাহাড়গুলোর উঁচুনিচু পথ বেয়ে মিঃ ট্রিগ তাঁর ট্রাক্টরটা চালিয়ে আসছিলেন। বেড়া বাঁধতে বাঁধতে ন্যাট লক্ষ্য করলো, আকাশে চক্রাকারে উড়তে থাকা চিৎকৃত পাখিগুলোর বিশাল মেঘে পুরো যন্ত্রটা আর তার ওপরে বসে থাকা মানুষটা মুহূর্তের জন্যে একেবারে হারিয়ে গেলো।…সে দিনের মতো কাজ-কর্ম শেষ হবার পর ন্যাট মিঃ ট্রিগের কাছে পাখিগুলোর সম্পর্কে কথা তুললো।

'হ্যাঁ, স্বাভাবিকের চাইতে এবারে পাখির সংখ্যা বেশি।' মিঃ ট্রিগ বললেন, 'আমার ধারণা, আবহাওয়াটা বদলাবে—খুব বেশি শীত পড়বে এবারে, তাই পাখিগুলো এতোটা অস্থির।'

কৃষক ভদ্রলোক সঠিক কথাই বলেছিলেন। সেদিন রাতেই আবহাওয়াটা বদলে গেলো।

শোবার ঘরটা পুবমুখো। রাতদুটোর ঠিক পরেই ঘুম ভেঙে ঠাণ্ডা আর শুকনো পুবালী বাতাসের আওয়াজ পেলো ন্যাট। চিমনির ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসে একটা ফাঁপা আওয়াজ উঠছে, ঠকঠক করে

উঠছে, ছাদের নড়বড়ে টালিগুলো। কান পেতে উপসাগর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জনও শুনতে পেলো ন্যাট। তারপর কম্বলটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে, স্ত্রীর পিঠের দিকে একটু ঝুঁকে শুয়ে, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো আবার।

একটু পরেই জানলার শার্শিতে টোকা দেবার শব্দ শুনতে পেলো ন্যাট। যতোক্ষণ সে বিরক্ত হয়ে বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে এগিয়ে না গেলো, ততোক্ষণ হতেই থাকলো শব্দটা। জানলা খুলতেই কি একটা জিনিসে ওর হাতটা ঘষটে গেলো, চামড়া ছড়ে গেলো আঙুলের গাঁটগুলোতে। পরক্ষণেই ডানার ঝটপটানি দেখতে পেলো ন্যাট, তারপরেই ছাদের ওপরে ফের চলে গেলো সেটা।

আসলে ওটা একটা পাখি। কি পাখি, ন্যাট তা জানে না। প্রচণ্ড দমকা হাওয়া নিশ্চয়ই পাখিটাকে জানলার তাকে তাড়িয়ে এনে-ছিলো।

জানলা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে এলো ন্যাট। আঙুলের গাঁটগুলো ভিজে ভিজে মনে হওয়াতে ছড়ে যাওয়া জায়গাতে মুখ লাগালো। পাখিটা তার রক্ত বের করে দিয়েছে। ন্যাট ভাবলো, হয়তো প্রচণ্ড আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে এসে, পাখিটা অন্ধকারে তাকে ঠুকরে দিয়েছে।···ফের ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে স্থিতু হলো সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শার্শিতে ফের সেই টোকা দেবার আওয়াজ—এবারে শব্দটাতে জোর আরও বেশি। ওর স্ত্রীরও ঘুম ভেঙে গেলো এবারে, পাশ ফিরে শুয়ে বললো, 'জানলাটা একটু ছাখো না ন্যাট, কেমন একটা ঠকঠক আওয়াজ হচ্ছে।'

'দেখেছি।' ন্যাট বললো, 'ওটা একটা পাখি, ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে।'

'তাড়িয়ে দাও। শব্দটাতে আমি ঘুমোতে পারছি না।'

দ্বিতীয়বার জানলাটার কাছে উঠে যায় ন্যাট। শার্শি খুলে দেখতে পায়, জানলার তাকে এবারে আর একটা পাখি নয়—অন্তত আধ ডজন। সোজা ওর মুখের দিকে উড়ে আসে পাখিগুলো। চিৎকার

করে ওঠে ন্যাট, দুহাত ছুঁড়ে সরিয়ে দিতে থাকে পাখিগুলোকে। প্রথমবারের পাখিটার মতো এগুলোও ছাদের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে উধাও হয়ে যায় দেখতে দেখতে।

আচমকা বারান্দার ওধারে যে ঘরটাতে বাচ্চাগুলো ঘুমোয়, সেখান থেকে ভয়ার্ত চিৎকার ভেসে আসে।

'জিলের গলা', চিৎকারে ঘুম ভেঙে ওর স্ত্রী বললো।

পরক্ষণেই দ্বিতীয় চিৎকারটা শোনা যায়, এবারে দুটো বাচ্চাই একসঙ্গে চিৎকার করেছে।···হোঁচট খেতে ওদের ঘরে ঢুকতেই অন্ধকারে নিজের শরীরে ডানার আঘাত অনুভব করে ন্যাট। জানলাটা হাট করে খোলা। ওখান দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে পাখিগুলো—প্রথমে ছাদ আর দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে, মোড় ঘুরে বিছানায় বাচ্চাগুলোর দিকে তেড়ে গেছে ওরা।

'ভয় নেই, এই তো আমি এসে গেছি,' ন্যাট চিৎকার করে বলতেই বাচ্চাগুলো আর্ত চিৎকার করে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—পাখিগুলোও অন্ধকারের মধ্যে গোত্তা খেয়ে ফের ছুটে আসে তার দিকে।

'কি ব্যাপার, ন্যাট ? কি হয়েছে ?' ওর স্ত্রী জিগেস করলো।

বাচ্চাগুলোকে বারান্দায় ঠেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয় ন্যাট। এখন ওদের শোবার ঘরে পাখিগুলোর সঙ্গে ন্যাট একেবারে একা। সব চাইতে কাছের বিছানাটা থেকে একটা কম্বল তুলে নিয়ে সেটাকে অস্ত্রের মতো ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাতে থাকে সে। অনুভবে বুঝতে পারে, পাখিগুলোর গায়ে আঘাত করছে কম্বলটা—শুনতে পায় ওদের ডানার ঝটপটানি। কিন্তু তবু ওরা হার স্বীকার করে না, বারবার ফিরে আসে ন্যাটকে আঘাত করতে। আঁচড় কাটে ন্যাটের হাতে, মাথায়। কাঁটা চামচের মতো তীক্ষ্ণ ছোট ছোট ঠোঁটগুলো ছুরির মতো বিঁধিয়ে দেয় ন্যাটের সর্বাঙ্গে।

কম্বলটা এবারে প্রতিরোধের অস্ত্র হয়ে ওঠে। নিজের মাথাটা কম্বলে মুড়িয়ে আরও ঘন অন্ধকারে খালি হাতে পাখিগুলোকে আঘাত করতে থাকে ন্যাট। পাছে পাখিগুলো ওকে অনুসরণ করে, সেই ভয়ে

বারান্দার দরজাটা সে খুলতে ভরসা পাচ্ছিলো না। অন্ধকারে কতোক্ষণ সে এভাবে লড়াই চালিয়েছে, ন্যাট তা জানে না। কিন্তু তার দেহে ডানার আঘাত কম হতে হতে অবশেষে এক সময় একেবারে শেষ হয়ে যায়, পুরু কম্বলের আবরণের ভেতরে থেকেও আলোর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে সে।

তবু কান পেতে অপেক্ষা করে থাকে ন্যাট। কিন্তু দূরের শোবার ঘরটা থেকে ভেসে আসা একটা বাচ্চার ঘ্যানঘেনে কান্নার আওয়াজ ছাড়া কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। মাথা থেকে কম্বলটা খুলে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয় ন্যাট। হিমেল উষার ধূসর আলোয় ঘরটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে পাখিগুলো বেঁচে ছিলো, ভোরের আলো আর খোলা জানলা তাদের বাইরে ডেকে নিয়ে গেছে—মৃতেরা পড়ে রয়েছে মেঝের ওপরে।

ক্লান্ত ন্যাট জানলার কাছে গিয়ে বাইরে সবুজের শোভা আঁকা ক্ষেতখানার দিকে তাকালো। প্রচণ্ড শীত পড়েছিলো—পুবালী বাতাসে বয়ে আসা হিমে মাটির বুক কঠিন আর কালচে। জোয়ারের টানে হিংস্র হয়ে ওঠা সমুদ্র সাদা-মুকুট-পরা উঁচু উঁচু ঢেউয়ে উপসাগরের কোলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। পাখিদের কোন চিহ্ন নেই।

জানলা-দরজা বন্ধ করে বারান্দা পেরিয়ে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ন্যাট।

ন্যাটের স্ত্রী বিছানায় বসেছিলো। একটা বাচ্চা ওর পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, ছোটোটা কোলে—তার মুখে ব্যাণ্ডেজ।

'এখন ঘুমোচ্ছে,' ওর স্ত্রী ফিসফিসিয়ে বললো। 'ওর চোখের কোনে রক্ত লেগেছিলো, নিশ্চয়ই কোন কিছুতে কেটে দিয়েছে। জিল বললো, পাখির কাজ। ও নাকি ঘুম ভেঙে ছাখে, ঘরের মধ্যে পাখি ভর্তি।' ন্যাটের মুখের দিকে তাকিয়ে সমর্থনের চিহ্ন খুঁজতে লাগলো ও। ওকে আতঙ্কিত আর বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিলো।

গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনায় ন্যাট নিজেও যে বিচলিত, প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে উঠেছে, সে কথা স্ত্রীকে বুঝতে দিতে চাইছিলো না। বললো,

'এখনও রয়েছে। মরা পাখি। প্রায় গোটা পঞ্চাশেক।' বিছানায় স্ত্রীর পাশে বসলো ন্যাট, 'যা বিশ্রী আবহাওয়া! সম্ভবত এগুলো এখানকার পাখি নয়। নির্ঘাৎ শীতের তাড়া খেয়ে উত্তর দিক থেকে এখানে পালিয়ে এসেছে।'

'কিন্তু ন্যাট, আবহাওয়া তো মোটে গতকাল রাত্তিরে পালটেছে।' ওর স্ত্রী অস্ফুটে বললো, 'ক্ষেতে-মাঠে এখনও তো ওদের যথেষ্ট খাবার রয়েছে। এখুনি ওরা খিদের জ্বালায় ঘর-দোরে হানা দেবে, তা তো হতে পারে না!'

'আমি বলছি—তাই।' ন্যাট ফের বললো, 'বিশ্রী জল-হাওয়ার জন্যেই এমন কাণ্ডটা হয়েছে।'

ন্যাটের মুখও ওর স্ত্রীর মুখের মতো শুকনো আর ক্লান্ত। কোন কথা না বলে দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলো ওরা। জানলার কাছে গিয়ে ফের বাইরের দিকে তাকালো ন্যাট। আকাশটা সীসের মতো ধূসর আর ভারি। গতকালও যে বাদামী রঙের পাহাড়গুলো আলোয় ঝকঝক করছিলো, এখন সেগুলোকে অস্পষ্ট আর নগ্ন দেখাচ্ছে। এক রাতের মধ্যেই বিষণ্ণ শীত নেমে এসেছে চারদিক জুড়ে।

ইতিমধ্যে বাচ্চাগুলো ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। জিল কিচিরমিচির করে আবোল-তাবোল বকছে, কুঁচো চিংড়ি জনটা কাঁদতে শুরু করেছে আবার। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে ন্যাট শুনতে পেলো ওর স্ত্রী বাচ্চাগুলোকে শান্ত করছে, প্রবোধ দিচ্ছে।

তক্ষুণি নিচে নেমে এলো ওরা। ন্যাট ওদের প্রাতরাশ তৈরি করে রেখেছিলো। 'পাখিগুলোকে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো?' জিগেস করলো জিল।

'হ্যাঁ, সব কটা পাখিই চলে গেছে।' ন্যাট বললো, 'পুবের বাতাস ওদের ঘরের মধ্যে তাড়িয়ে এনেছিলো।'

'আর যেন না আসে, বাব্বাঃ!'

'আমি তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসবো,' ওকে বললো ন্যাট।

গত রাতের অভিজ্ঞতার কথা জিল যেন সবই ভুলে গেছে। ঝরা

পাতাগুলোকে তাড়া করতে করতে ন্যাটের আগে আগে নাচতে নাচতে চললো ও। টুপির আড়ালে ওর মুখে গোলাপী রঙের আভা।

সমস্ত পথটা ন্যাট লক্ষ্য করতে করতে চললো। কিন্তু ক্ষেতের ওধারে বেড়াঝোপের আনাচে কানাচে কিংবা খামারের ওধারে ছোট্ট জঙ্গলটা, যেখানে দাঁড়কাকগুলো জটলা বেঁধে থাকে—কোথাও কোন পাখির সন্ধান পেলো না।

একটু পরেই পাহাড়ি পথ বেয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে বাসটা এসে হাজির হলো। জিলকে তুলে দিয়ে খামারের দিকে হাঁটা ধরলো ন্যাট। আজ তার কাজের দিন নয়, কিন্তু সব কিছুই ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে, নিজেকে সে সন্তুষ্ট করতে চাইছিলো। খামার বাড়ির পেছনের দরজায় পৌঁছে ন্যাট শুনতে পেলো, মিসেস ট্রিগ গান গাইছেন আর রেডিওটা যেন ওঁর গানের বাজনা হিসেবেই বেজে চলেছে।

'মিসেস ট্রিগ আছেন নাকি?' হাঁক পাড়লো ন্যাট।

'এই যে, মিঃ হকেন—' হাসিমুখে মোটাসোটা মহিলাটি দরজার কাছে এগিয়ে এলেন, 'আচ্ছা, এতো ঠাণ্ডা কোত্থেকে এলো বলতে পারেন? রাশিয়া থেকে নাকি? জল-হাওয়ার এমন পরিবর্তন আমি জন্মেও দেখিনি। রেডিওতে বললো, চারদিকেই এমনি চলেছে। সুমেরু বৃত্তের দিকে নাকি একটু নজর দেয়া দরকার।'

'আজ সকালে আমরা রেডিও চালাইনি।' ন্যাট বললো, 'আসলে কাল রাতে আমাদের একটা ঝামেলা গেছে।'

'বাচ্চাদের ঝঞ্ঝাট বুঝি?'

'না।' ব্যাপারটা কি করে বোঝানো যায়, ভেবে পাচ্ছিলো না ন্যাট। এখন, দিনের আলোয়, পাখিদের সঙ্গে যুদ্ধের ঘটনাটা একেবারে অবাস্তব শোনাবে। তবু ঘটনাটা যেমন ঘটেছিলো মিসেস ট্রিগকে সে সেটাই বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মহিলার চোখ দেখেই বোঝা গেলো, ন্যাটের কাহিনীটা উনি গুরুভোজনের ফলস্বরূপ দুঃস্বপ্ন বলেই ধরে নিয়েছেন।

'সত্যিকারের পাখি?' মিসেস ট্রিগের মুখে স্মিত হাসি।

'মিসেস ট্রিগ, পঞ্চাশটা মরা পাখি এখনও ওখানে রয়েছে—রবিন, রেন—ওরা জনিটার চোখ খুবলে নেবার চেষ্টা করেছিলো।'

'খারাপ জল-হাওয়াই বোধহয় ওদের এদিকে নিয়ে এসেছে,' সন্দিগ্ধ চোখে ন্যাটের দিকে তাকালেন মিসেস ট্রিগ। 'একবার ঘরে ঢুকে পড়লে, ওরা তো বুঝতেও পারবে না ওরা কোথায় রয়েছে। হয়তো ওগুলো ভিনদেশী পাখি, ওই সুমেরুবৃত্ত থেকেই এসেছে।'

'না, ওসব পাখি আপনি প্রতিদিনই এখানে দেখতে পান।'

'মজার ব্যাপার!' মিসেস ট্রিগ বললেন, 'সত্যিই এর কোন ব্যাখ্যা নেই। আপনার উচিত গার্ডিয়ান পত্রিকায় চিঠি লিখে এর কারণটা ওদের জিগেস করা। ওদের কাছে হয়তো এর কোন একটা জবাব আছে।...আমি তাহলে চলি, আমার ওদিকে আবার কাজকর্ম রয়েছে।'

বাড়িতে ফেরার সরু পথটা ধরে পা চালালো ন্যাট।...রান্নাঘরে ঢুকে স্ত্রী আর ছোট্ট জনিটার দেখা পাওয়া গেলো। স্ত্রী জিগেস করলো, 'কারুর দেখা পেলে?'

'মিসেস ট্রিগ,' ন্যাট জবাব দিলো। 'উনি আমার কথা বিশ্বাস করেছেন বলে মনে হলো না। যাই হোক, ওখানে ঝামেলা হয় নি।'

'তুমি পাখিগুলোকে সরিয়ে ফ্যালো, নয়তো বিছানা তোলার জন্যেও আমার ও ঘরে ঢুকতে সাহস হচ্ছে না। ভীষণ ভয় লাগছে।'

'এখন ভয়ের কিছু নেই। ওগুলো তো মরা পাখি, তাই নয় কি?'

একটা থলে নিয়ে ওপর-তলায় উঠে এলো ন্যাট, তারপর একটা একটা করে শক্ত হয়ে ওঠা পাখিগুলোকে থলের মধ্যে ভরে নিলো। হ্যাঁ, পঞ্চাশটাই বটে। তবে নেহাতই সাধারণ পাখি—যেগুলোকে বেড়া-ঝোপে দেখা যায়। এমনকি আকারে এগুলো থ্রাশ পাখির মতোও বড়ো নয়। নির্ঘাৎ ভয় পেয়েই ওরা তখন অমন কাণ্ডকারখানা করেছিলো। থলেটা নিয়ে বাগানে এসে, একটা সম্পূর্ণ নতুন সমস্যার মুখোমুখি হলো ন্যাট। মাটির বুক শক্ত হয়ে জমে রয়েছে, তার ওপরে এক কণাও তুষারপাত হয়নি। অর্থাৎ, পুবালী বাতাসের আচমকা

আবির্ভাব ছাড়া গত কয়েক ঘণ্টায় আর কিছুই হয়নি। অস্বাভাবিক কাণ্ড! অদ্ভুত!···উপসাগরে সাদা-মুকুট-পরা ঢেউগুলোর উথাল-পাথাল হয়ে ভেঙে পড়া দেখতে পাচ্ছিলো ন্যাট। ঠিক করলো, পাখিগুলোকে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে কবর দিয়ে আসবে।

কিন্তু মূল ভূখণ্ড থেকে সমুদ্র সৈকতে নেমে এসে, ন্যাট কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলো না—পুবালী বাতাসের জোর এতো প্রচণ্ড। এখন ভাঁটা চলছে।···সশব্দে নুড়ি-পাথর মাড়িয়ে নরম বালির দিকে এগিয়ে গেলো সে। তারপর বাতাসের দিকে পেছন ফিরে, পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা গর্ত খুঁড়ে, পাখিগুলোকে তার মধ্যে ঢেলে দেবার জন্যে থলেটাকে উপুড় করে ধরলো। কিন্তু ঢেলে ফেলতেই দমকা বাতাস ওগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে চললো, পালকের মতো উলটেপালটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেললো সৈকতের সর্বত্র। জোয়ার এসে ওগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, নিজেকে বললো ন্যাট। তারপর চোখ মেলে তাকালো সাদা ঝুঁটিওয়ালা সবুজ ঢেউগুলোর দিকে। প্রথমে মাথা তুলে শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে ঢেউগুলো, তারপর কুঁকড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ছে। ভাঁটার সময় বলে গর্জনটা এখন অনেক কম, তাতে বন্যার বজ্রহুংকার নেই।

তারপরেই ওদের দেখতে পেলো ন্যাট। সমুদ্র পাখি। দূর সমুদ্রে চড়ে বেড়াচ্ছে।

প্রথমে যেগুলোকে সে ফেনার মুকুট বলে ভেবেছিলো, আসলে সেগুলো সমুদ্রপাখি। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওঠা নামা করছে ওরা, মাথাগুলো তুলে রেখেছে বাতাসের দিকে—ঠিক যেন জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে নোঙর করা এক শক্তিমান নৌবহর।

ঘুরে দাঁড়ালো ন্যাট, সৈকত ছেড়ে চড়াই ভেঙে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো সে। ভাবলো, এ ব্যাপারটা কাউকে বলা উচিত—অন্য কারুর জানা উচিত এ ব্যাপারটা। কিছু একটা ঘটছে এবং তার কারণ এই পুবালী বাতাস আর এই জলহাওয়া—যেটা সে ঠিক বোঝেনি।

ন্যাট বাড়ির কাছাকাছি আসতেই, ওর স্ত্রী ওকে দেখে দোরগড়া অব্দি ছুটে এলো। উত্তেজিত স্বরে বললো, 'ন্যাট, রেডিওতে খবরটা বলেছে! এইমাত্র ওরা একটা বিশেষ সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি পড়ে শোনালো। ব্যাপারটা শুধু এখানেই নয়—লণ্ডনেও…দেশের সমস্ত জায়গাতেই হয়েছে। পাখিগুলোর কিছু হয়েছে।…তুমি শুনবে, এসো—বিজ্ঞপ্তিটা ওরা ফের পড়ছে।'

খবরটা শোনার জন্যে ওরা দুজনে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।"

'স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আজ বেলা এগারোটায় প্রচারিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় শহর, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলের আকাশে বিপুল সংখ্যায় পাখিদের জমায়েত হওয়া এবং তার ফলে অবরোধ, ক্ষয়-ক্ষতি, এমন কি কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আক্রমণের সংবাদও এসে পৌঁছুচ্ছে। মনে করা হচ্ছে যে, বর্তমানে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জকে ঘিরে ফেলা মেরুঅঞ্চলীয় বায়ুপ্রবাহের ফলেই পাখিরা এমন বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগী হয়ে দক্ষিণাঞ্চলে চলে আসছে এবং নিদারুণ ক্ষুধায় হয়তো তারা মানুষকেও আক্রমণ করতে পারে। গৃহস্থদের সাবধান করে দেয়া হচ্ছে, তাঁরা যেন বাড়ির জানলা দরজা ও চিমনির দিকে নজর রাখেন এবং নিজ নিজ শিশুদের নিরাপত্তার খাতিরে যথাযোগ্য সাবধানতা অবলম্বন করেন। এই সম্পর্কে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিটি পরে প্রচার করা হবে।'

এক আশ্চর্য উত্তেজনা ন্যাটকে অভিভূত করে তোলো। বিজয়ীর অভিব্যক্তিতে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকায় সে, 'দেখলে তো? সমস্ত সকালটা ধরেই আমার মন বলছিলো, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। এইমাত্র আবার দেখে এলাম, সমুদ্রে হাজার হাজার সমুদ্র-পাখি বসে বসে অপেক্ষা করছে।'

'কিসের জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে, ন্যাট?'

'জানি না', ওর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে ন্যাট। তারপর হাতুড়ি ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি রাখা দেরাজটার দিকে এগিয়ে গেলো।

'ওগুলো দিয়ে কি করবে?'

'ওরা যা বললো—জানলা আর চিমনিগুলোর একটা ব্যবস্থা করবো।'

'তুমি কি ভাবছো বন্ধ জানলা ভেঙে ওরা ভেতরে ঢুকবে? ওই রেন, রবিন আর ওই সমস্ত পাখিগুলো? কিন্তু কি করে তা করবে?'

ন্যাট কোন জবাব দিলো না। সে রবিন আর রেন পাখির কথা ভাবছিলো না। ভাবছিলো সমুদ্রপাখি আর শঙ্খচিলগুলোর কথা। ওপর-তলায় গিয়ে বাকি সকালটা সে জানলাগুলোতে তক্তা আঁটলো, চিমনির ফোকড় বন্ধ করলো। তারপর এক সময় রান্নাঘর থেকে তার স্ত্রী চিৎকার করে জানালো, 'খাবার তৈরি।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি', জবাব দিলো ন্যাট।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর ন্যাটের স্ত্রী বাসনপত্রগুলো ধুতে শুরু করলো আর ন্যাট বেলা একটার খবর শোনার জন্যে রেডিওটা চালিয়ে দিলো। সেই একই ঘোষণা, তবে সংবাদ-প্রসঙ্গটা এবারে আরও বেড়ে গেছে।

'পাখিদের ঝাঁক সমস্ত অঞ্চলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।' ঘোষক জানালো, 'লণ্ডনের আকাশে জমায়েত হওয়া পাখির সংখ্যা এতোই সুবিশাল যে, আজ বেলা দশটার সময় দেখে মনে হচ্ছিলো যেন প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ। ওরা বাড়ির ছাদ, জানলার তাক এবং চিমনির ওপরে আশ্রয় নিচ্ছে। ওদের মধ্যে রয়েছে ব্ল্যাকবার্ড, থ াশ, সাধারণ চড়ুই—তা ছাড়া রাজধানীতে যাদের আশা করা যায়—সেই অসংখ্য পায়রা, স্টারলিং এবং লণ্ডনের নদীতে যাদের প্রায়শই আগমন ঘটে থাকে, সেই কালো-মাথা সমুদ্রপাখির দল। দৃশ্যটা এতোই অস্বাভাবিক যে বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহনগুলো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, দোকানে অফিসে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং দলে দলে মানুষ পাখিগুলোকে লক্ষ্য করার জন্যে রাস্তা এবং পাশপথে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন।'

ঘোষকের কণ্ঠস্বর দিব্যি স্বচ্ছন্দ ও কোমল। ন্যাটের মনে হলো,

লোকটা পুরো ব্যাপারটাকে একটা বিশদ মজার ব্যাপার হিসেবে ধরে নিয়েছে। তবে কিনা ওর মতো আরও হাজারটা মানুষ আছে যারা জানে না, অন্ধকারে এক ঝাঁক পাখির সঙ্গে লড়াই চালানো কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

বোতাম টিপে রেডিও বন্ধ করে দিলো ন্যাট, তারপর রান্নাঘরের জানলাগুলোকে নিয়ে কাজ শুরু করলো। ওর স্ত্রী ওকে লক্ষ্য করছিলো, পুঁচকে জনি ঘুরছিলো মায়ের পায়ে পায়ে।

'ওদের যা করা উচিত তা হচ্ছে,' ন্যাটের স্ত্রী বললো, 'পল্টনী ফৌজ নামিয়ে পাখিগুলোকে গুলি করা।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারে। কিন্তু সেভাবে তারা আক্রমণ চালাবে কি করে?'

'তা জানিনে। তবে একটা কিছু ওদের অবশ্যই করা উচিত।'

ন্যাট মনে মনে চিন্তা করলো, এই মুহূর্তে 'ওঁরা' যে এই সমস্যাটা সমাধানের কথা চিন্তা করছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু লণ্ডন বা অন্যান্য বড়ো বড়ো শহরগুলোতে 'ওঁরা' যা কিছু করার সিদ্ধান্তই নিন না কেন, তা এখানে, প্রায় এই তিনশো মাইল দূরে তাদের কোন কাজেই আসবে না।

'আমাদের খাবার-দাবারের অবস্থা কি রকম আছে?' জিগেস করলো ন্যাট।

'তুমি তো জানো, আসছে কাল বাজার বসবে। রান্না না করা খাবার-দাবার আমি রাখি না। মাংসওলা এক দিন অন্তর ছাড়া আসে না। তবে কাল বাজারে গেলে, আমি কিছু নিয়ে আসতে পারি।'

ন্যাট তার স্ত্রীকে বিচলিত করে তুলতে চাইছিলো না। তাই নিজেই ভাঁড়ার ঘর আর টিনের কৌটোয় করা খাবার রাখার আলমারিটা খুঁজে দেখলো। যা জিনিসপত্র আছে তাতে ওদের কটা দিন চলে যাবে। রান্নাঘরের জানলাগুলোতেও তক্তা মেরে দিলো সে। মোমবাতির সঞ্চয় বড়োই কম। যাক গে, আজ রাতে ওরা তাড়াতাড়ি করেই শুয়ে পড়বে। তার মানে, যদি···

খিড়কির দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ন্যাট। তারপর বাগানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। সারাটা দিন আকাশে সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। এখন বড়োজোর বেলা তিনটে, কিন্তু এরই মধ্যে চারদিকে কেমন একটা আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশটা থমথমে বিষণ্ণ। পাহাড়ের গায়ে সমুদ্রের হিংস্র মাদল বেজে চলেছে একটানা। সৈকতের দিকে যাবার রাস্তাটা আধ-খানা পেরিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো ন্যাট। দেখলো, সমুদ্রে জোয়ার এসেছে। পাখিগুলো উঠে পড়েছে জল ছেড়ে। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, কাতারে কাতারে পাখি পাক খাচ্ছে আকাশে, বাতাসের প্রতিকূলে ডানা তুলে ক্রমাগত ঘুরে চলেছে আকাশের বুকে। ওরাই আকাশটাকে আঁধার করে তুলেছে। এখন ওরা নিশ্চুপ। শুধু চক্কর খেতে খেতে উঠছে আর নামছে, বাতাসের প্রতিকূলতায় যাচাই করে নিচ্ছে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য।

ঘুরে দাঁড়ালো ন্যাট, এক ছুটে ফিরে এলো কুটিরে। স্ত্রীকে বললো, 'আমি জিলকে আনতে যাচ্ছি।'

'কি হয়েছে?' ওর স্ত্রী প্রশ্ন করলো। 'তুমি দেখছি একেবারে সাদা হয়ে গেছো?'

'জনিকে বাড়ির ভেতরে রেখে, দরজাটা বন্ধ করে রাখো। তারপর ঘরের আলো জ্বেলে, পর্দাগুলো টেনে দাও।'

'এখন তো মোটে তিনটে!'

'তা হোক। যা বলছি, তা-ই করো।'

যন্ত্রপাতি রাখার ছাউনি থেকে আগাছা সাফ করার নিড়ানিটা নিয়ে এলো ন্যাট। তারপর রাস্তা ধরে বাসস্টপের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। মাঝে মাঝেই সে কাঁধের ওপর দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে পেছন দিকটা দেখে নিচ্ছিলো। পাখিগুলো এখন আরও উঁচুতে উঠে গেছে, বৃত্তগুলো ছড়িয়ে পড়েছে আরও অনেকটা—বিশাল আকার নিয়ে সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা।

তাড়াতাড়ি পা চালায় ন্যাট। যদিও সে জানে চারটের আগে বাস

আসবে না, তবু তাড়াহুড়ো না করে উপায় নেই। পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে অপেক্ষা করে রইলো সে। বাস আসতে এখনও আধঘণ্টা বাকি।

উঁচু প্রান্তর থেকে মাঠ ঘাট পেরিয়ে পুবালী বাতাস শনশনিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো। বিবর্ণ থমথমে আকাশের পটভূমিকায় দূরে মাটির টিলা-গুলোকে অনেক পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছিলো ন্যাটের। ওর পেছন থেকে কালো মতো কি একটা জিনিস যেন ওপরে উঠে আসছিলো ক্রমশ। প্রথমে সামান্য একটু ময়লা দাগ, তারপর দেখতে দেখতে সেটা ছড়িয়ে পড়ে, ঘন হয়ে ওঠে: দাগটা এক টুকরো মেঘ হয়ে যায়। মেঘটা আবার পাঁচটা খণ্ডে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে উত্তর, পুব, দক্ষিণ আর পশ্চিমে। তারপর সেগুলো আর মেঘ থাকে না—শুধু পাখি আর পাখি হয়ে যায়।

দু-তিন শো ফুট দূর থেকে আকাশ-পথে পাখিগুলোর উড়ে যাওয়া লক্ষ্য করলো ন্যাট। ওদের গতি দেখেই সে বুঝতে পারলো, পাখি-গুলোর উদ্দেশ্য দেশের ভেতর দিকে এগিয়ে যাওয়া—যেন এই উপ-দ্বীপটার লোকজনের সঙ্গে ওদের কোন কাজ-কারবার নেই। ওদের মধ্যে রয়েছে কাক, দাঁড়কাক, ছাতার, জেই এবং অন্যান্য নানান ধরনের পাখি, যারা সাধারণত ছোটখাটো পাখিদের শিকার করে থাকে। কিন্তু আজকের এই বিকেলে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে উড়ে চলেছে ওরা।

দূরভাষের খুপরিটাতে ঢুকে গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরলো ন্যাট।··· দূরভাষ-দফতর থেকে খবরটা নিশ্চয়ই যথাস্থানে জানিয়ে দেওয়া হবে।

'আমি সড়ক থেকে বলছি,' ন্যাট বললো, 'বাস স্টপের কাছ থেকে। আমি জানাতে চাইছি যে, অসংখ্য পাখি ঝাঁক বেঁধে দেশের মধ্য-অঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছে। উপাসাগরে সমুদ্র-পাখিরাও ঝাঁক বাঁধছে।'

'ঠিক আছে,' শ্রান্ত কণ্ঠস্বরে অতি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর।

'খবরটা অবশ্য করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবেন তো?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ,' এবারে রীতিমতো বিরক্তির সুর। তারপরেই ডায়াল-টোনের গরগর শব্দটা ফের শুরু হয়ে যায়। এ মেয়েটিও একটি, ভাবলো ন্যাট, এরও কোন চিন্তা ভাবনা নেই।

বাসটা ক্লান্তভাবে পাহাড় বেয়ে উঠে এলো, জিল নেমে এলো বাস থেকে।

'নিড়ানিটা দিয়ে কি হবে, বাবা?'

'এমনি নিয়ে এসেছি।' ন্যাট বললো, 'এবারে বাড়ি চলো। ঠাণ্ডা পড়েছে, আর ঘোরাঘুরি নয়। দেখি, তুমি কতো জোরে ছুটতে পারো।'

সমুদ্রপাখিগুলোকে এখন দেখতে পাচ্ছিলো ন্যাট। এখনও ওরা নিঃশব্দে মাঠ-ঘাটের ওপরে বৃত্তাকারে উড়ে চলেছে, ক্রমশ ঢুকে পড়ছে স্থলভাগের ভেতরে।

'ছাখো বাবা, ওদিকটাতে ছাখো! কতোগুলো চিল!'

'হ্যাঁ, শীগগিরি চলো।'

'ওরা কোথায় যাচ্ছে?'

'দেশের ভেতরে ঢুকে পড়ছে, মানে যে সব জায়গায় এখনও একটু গরম আছে।' জিলকে হাত ধরে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে ন্যাট।

'অতো তাড়াতাড়ি যেও না, বাবা। আমি তাল রাখতে পারছি না!'

সমুদ্রপাখিগুলো দাঁড়কাক জাতীয় পাখিগুলোকে নকল করছিলো। ঝাঁকে ঝাঁকে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলছিলো ওরা। তারপর এক এক ঝাঁকে হাজার হাজার পাখি মিলে উড়ে যাচ্ছিলো কম্পাসের নির্দেশিত কোণগুলোকে লক্ষ্য করে।

'ও কি, বাবা? চিলগুলো কি করছে?'

অন্য পাখিগুলোর মতো ওদের যেন ওড়ার দিকে আগ্রহ নেই। এখনও ওরা চক্রাকারে মাথার ওপরে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। খুব একটা

উঁচুতেও উঠছে না। যেন কোন সঙ্কেতের অপেক্ষায় রয়েছে ওরা, যেন কোন একটা সিদ্ধান্ত এখনও ওদের জানানো হয়নি।

'চিলগুলো চলে গেলে ভালো হয়, ওদের আমার একটুও ভালো লাগে না।' জিল চিৎকার করে বললো, 'ওরা রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে, বাবা।'

জিলকে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো ন্যাট। খামার বাড়ির মোড়টা ঘুরতেই দেখতে পেলো, মিঃ ট্রিগ গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করছেন। চিৎকার করে ন্যাট তাকে ডাকলো, 'আমাদের একটু গাড়িতে করে পৌঁছে দিতে পারেন?'

চালকের আসন থেকে মুখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকালেন ভদ্রলোক, 'মনে হচ্ছে দিব্যি একটা মজার ব্যাপার চলেছে!' মিঃ ট্রিগের খুশিখুশি আরক্তিম মুখে হাসি ফুটে উঠলো, 'সমুদ্রপাখিগুলোকে দেখেছো? জিম আর আমি গোটাকতক পাখি শিকার করতে বেরুচ্ছি। সবাই একবারে পাখি-পাগল হয়ে উঠেছে, কারুর মুখেই অন্য কোন কথা নেই। শুনলাম, কাল রাত্তিরে তোমরা নাকি মুশকিলে পড়েছিলে? তা নেবে নাকি, একটা বন্দুক?'

ন্যাট মাথা নাড়লো। ছোট্ট গাড়িটা একেবারে বোঝাই, কিন্তু পেছনের আসনে জিলের বসার মতো জায়গা ছিলো।

'আমার বন্দুক চাই না', ন্যাট বললো। 'তবে এক ছুটে জিলকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দিলে অনুগৃহীত হবো। পাখিগুলোকে মেয়েটা বড্ডো ভয় পাচ্ছে।'

'বেশ তো, আমি ওকে বাড়িতে পৌঁছে দেবো। কিন্তু তুমি বাড়িতে না গিয়ে আমাদের সঙ্গে শিকারে চলো না কেন? অনেক পালক ওড়াবো আমরা!'

জিল গাড়িতে উঠে বসলো। মোড় ঘুরিয়ে রাস্তা ধরে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক। ন্যাটও অনুসরণ করলো ওদের। ট্রিগ নির্ঘাৎ ক্ষ্যাপা। এক আকাশ পাখির বিরুদ্ধে একটা বন্দুক কোন কাজে লাগবে?

নিচু আকাশে পাক খেতে খেতে ওরা এখন খামারটার দিকে

এগিয়ে আসছে। তাহলে খামারটাই ওদের লক্ষ্য। নিজের বাড়ির দিকে চলার গতি বাড়িয়ে দিলো ন্যাট। একটু পরেই দেখতে পেলো, মিঃ ট্রিগের গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা ধরে ফিরে আসছে। ওর পাশে এসে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়ালো গাড়িটা।

'বাচ্চাটা এক ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে,' মিঃ ট্রিগ বললেন। 'তোমার স্ত্রী ওর পথ চেয়ে বসে ছিলেন। আচ্ছা, এ ব্যাপারটা কেন হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছো? শহরে সবাই বলাবলি করছে, এটা রাশিয়ানদের কাজ—রাশিয়ানরাই পাখিগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছে।'

'তা তারা কি করে করবে?'

'সে কথা আমায় জিগেস কোরো না। গপ্পো কি করে ছড়ায়, তা তো জানোই।'

'আপনি ঘরের জানলাগুলোতে তক্তা ঠুকে দিয়েছেন?' প্রশ্ন করলো ন্যাট।

'ধ্যাৎ, যত্তো সব! ঘুরে ঘুরে জানলায় তক্তা লাগানোর চাইতে আজ আমার আরও ঢের কাজ আছে।'

'আমি হলে কিন্তু তক্তাগুলো লাগিয়ে ফেলতুম, মিঃ ট্রিগ।'

'তুমি নেহাতই ভীতু! আজ ঘুমোবার জন্যে আমাদের বাড়িতে আসবে নাকি?'

'নাঃ, ধন্যবাদ।'

'বেশ, তাহলে সকাল বেলায় ফের দেখা হবে। সমুদ্রপাখি দিয়ে তোমাকে সকালের জলখাবার খাওয়াবো!'

মুচকি হেসে খামারের প্রবেশ পথের দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিলেন ভদ্রলোক। ন্যাট ফের দ্রুতবেগে পা চালালো। ছোট্ট জঙ্গলটা পেরিয়ে এলো সে, তারপর পুরনো গোলাবাড়িটা, তারপর অবশিষ্ট ক্ষেতটার বেড়া। এক লাফে বেড়াটা পার হতেই ডানার শনশনানি শুনতে পেলো সে—কালো-পিঠের একটা সমুদ্রপাখি আকাশ থেকে ছোঁ মেরে নেমে এলো তার দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ফের আকাশে উঠে গেলো পাখিটা, তৈরি হয়ে নিলো ফের ছোঁ মারার জন্যে। মুহূর্তের মধ্যে

অন্যগুলোও সঙ্গে জুটে গেলো—ছটা, সাতটা, আটটা, এক ডজন।

নিড়ানিটা ফেলে দিলো ন্যাট, ওটা কোনই কাজেই আসবে না। তুহাতে মাথা ঢেকে বাড়ির দিকে ছুট লাগালো সে। কিন্তু আকাশ থেকে পাখিগুলো ক্রমাগত ওর দিকে তেড়ে আসতে লাগলো—এগিয়ে আসতে লাগলো নীরবে, নিঃশব্দে। শুধু ডানার ভয়ঙ্কর ঝটপটানি ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। নিজের হাত, কব্জি আর ঘাড়ে রক্তের স্পর্শ অনুভব করছিলো ন্যাট। শুধু চোখতুটোকে যদি ওদের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তাই যথেষ্ট—আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। প্রতিটি ঝাঁপ, প্রতিটা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পাখিগুলো আরও বেশি করে সাহসী হয়ে উঠছে। নিজেদের কথা ওরা একটুও ভাবছে না। ছোঁ মেরে নিচে নেমে এসে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ছে এবং ডানা ভেঙে পড়ে থাকছে সেখানেই। ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ে থাকা পাখিগুলোর মৃতদেহে হোঁচট খেতে লাগলো ন্যাট। তারপর বাড়ির দরজায় পৌঁছে রক্তাক্ত হাতে সজোরে দরজায় আঘাত করতে শুরু করলো।

'দরজা খোলো—' ন্যাট চিৎকার করে ডাকলো, 'আমি ন্যাট, ভেতরে ঢুকতে দাও।'

পরক্ষণেই মাথার ওপরে বিরাট সামুদ্রিক রাজহাঁসটা দেখতে পেলো ন্যাট। ঠিক ওর দিকে ঝাঁপ দেবার জন্যেই তৈরি হচ্ছে পাখিটা। অন্যান্য সমুদ্র পাখিরা বাতাসের প্রতিকূল দিকে বৃত্তাকারে উড়তে উড়তে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। বাকি শুধু এই একটা—ন্যাটের মাথার ওপরে একটি মাত্র সামুদ্রিক রাজহাঁস। সহসা পাখিটার ডানা-তুটো শরীরের সঙ্গে গুটিয়ে যায়···পাথরের মতো নেমে আসে শয়তান পাখিটা।

ন্যাট চিৎকার করে ওঠে, আর তখুনি খুলে যায় দরজাটা।

ন্যাট কোনক্রমে চৌকাটটা পেরিয়ে আসতেই ওর স্ত্রী সমস্ত শরীর দিয়ে দরজাটা ঠেসে ধরে।

পরক্ষণেই রাজহাঁসটার আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পায় ওরা দুজনে।

আঘাতের জায়গাগুলোতে ন্যাটের স্ত্রী পট্টি বেঁধে দিলো। আঘাত-গুলো তেমন গভীর নয়। হাতের উলটো দিক আর কব্জিদুটোতেই চোট লেগেছে বেশি। টুপি পরা না থাকলে পাখিগুলো ন্যাটের মাথাটাকেও রেহাই দিতো না। রাজহাঁসটার কথাই ধরা যাক না—তেমন সুবিধে পেলে রাজহাঁসটা হয়তো ওর খুলিটাই দু ভাগ করে ফেলতো।

বাচ্চাদুটো বাবার রক্ত দেখে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলো। ন্যাট তাদের বললো, 'এই তো, এবারে সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার ব্যথা লাগেনি।'

ন্যাটের স্ত্রীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিলো। ফিসফিসিয়ে বললো, 'আমি ওগুলোকে মাথার ওপরে উড়তে দেখেছিলাম। মিঃ ট্রিগের সঙ্গে জিল যখন ছুটতে ছুটতে ভেতরে এসে ঢুকলো, ওরা ঠিক তখনই জড়ো হতে শুরু করেছিলো। দরজাটা আমি চেপে বন্ধ করে দিয়েছিলাম বলে শক্ত হয়ে এঁটে গিয়েছিলো ; তাই তুমি আসার সঙ্গে সঙ্গে খুলতে পারিনি।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভাগ্যিস পাখিগুলো আমার জন্যে অপেক্ষা করেছিলো!' ন্যাট বললো, 'জিল হলে তো তক্ষুনি মারা পড়তো। আমি বাসস্টপ থেকে দেখলাম, হাজারে হাজারে পাখি দেশের ভেতরের দিকে উড়ে যাচ্ছে। চিল, বাজ, দাঁড়কাক—সমস্ত বড়ো বড়ো পাখি। ওরা শহরেব দিকে চলেছে।'

'কিন্তু ওরা কি করতে পারে, ন্যাট?'

'আক্রমণ করবে—বাড়ির বাইরে যারা রাস্তাঘাটে থাকবে, তাদের প্রত্যেককে ওরা তেড়ে যাবে। তারপর বাড়ির জানলা আর চিমনি দিয়ে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিছু করছেন না কেন? মেশিনগান দিয়ে ফৌজই

বা কেন নামাচ্ছেন না?'

'তার আর সময় নেই। কেউই প্রস্তুত নয়। ছটার খবরে ওদের বক্তব্যটা শুনবো।'

'আমি পাখিদের আওয়াজ পাচ্ছি,' জিল বললো। 'বাবা', শোনো—'

ন্যাট শুনলো। জানলা থেকে চাপা আওয়াজ আসছে। ডানার ঘষটানি, ঠোকর আর আঁচড় কাটার শব্দ। ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজছে ওরা। জানলার তাকে অনেকগুলো শরীরের ঠাসাঠাসি করার খসখসে আওয়াজ। থেকে থেকে এক একটা ধুপধাপ শব্দ—ছোঁ মেরে নেমে আসা কোন পাখির ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাবার আওয়াজ। ওদের কেউ কেউ ওমনি করেই নিজেদের মারবে, ন্যাট ভাবলো, কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। কক্ষণো না।

'আমি জানলাগুলোতে তক্তা মেরে দিয়েছি, জিল।' ন্যাট প্রকাশ্যে বললো, 'পাখিগুলো ভেতরে আসতে পারবে না।'

জানলাগুলো পরীক্ষা করে দেখলো ন্যাট। তারপর কয়েক টুকরো পুরনো টিন, কাঠ আর ধাতুর ফালি খুঁজে নিয়ে সেগুলো জানলার সঙ্গে গোঁজ দিয়ে তক্তার বাঁধুনিগুলোকে জোরালো করে তুললো। তার হাতুড়ির আওয়াজ পাখিদের আওয়াজকে—ডানার খসখসানি ঠোকরানো এবং আরও ভয়াবহ কাচভাঙার আওয়াজকে—চেপে রাখতে সাহায্য করলো কিছুটা।

'রেডিওটা চালাও,' ন্যাট বললো।

ওপরতলার শোবার ঘরগুলোতে গিয়ে সেখানকার জানলাগুলোও সে শক্তপোক্ত করে তুললো। এতোক্ষণে বাড়ির ছাদেও পাখিগুলোর উপস্থিতি টের পাচ্ছিলো সে—আঁচড় কাটা, ঠোকরানো আর ধাক্কা মারার আওয়াজ আসছে সেখান থেকে। ন্যাট স্থির করলো, রাত্রিবেলা ওরা সবাই রান্নাঘরে ঘুমোবে এবং আগুনটা জ্বেলে রাখা হবে। শোবার ঘরের চিমনিগুলোর সম্পর্কে তার আশঙ্কা হচ্ছিলো। চিমনির মুখে যে কাঠগুলো সে লাগিয়ে এসেছে, সেগুলো হয়তো ধকল সামলাতে পারবে

না। কিন্তু রান্নাঘরে আগুন থাকার জন্যে তারা নিরাপদেই থাকবে।···
ব্যাপারটা নিয়ে ন্যাটকে রসিকতা করতে হবে। বাচ্চাদের কাছে এমন ভান দেখাতে হবে, যেন তারা সবাই মিলে শিবিরে রয়েছে—এমনি একটা খেলা করা হচ্ছে। সব চাইতে খারাপ ঘটনাটাই যদি ঘটে—পাখিগুলো যদি গায়ের জোরে চিমনি দিয়ে শোবার ঘরে ঢোকার পথ করে নেয়, তাহলেও ঘরের দরজা ভাঙতে তাদের অনেকটা সময় লেগে যাবে। হয়তো বা ততোক্ষণে দিনও শুরু হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে পাখিগুলো শোবার ঘরগুলোতেই বন্দী হয়ে থাকবে, কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। ভিড়ে গাদাগাদি করে ওরা নিজেরাই তখন দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে।

গদি-তোশক নিয়ে ন্যাট নিচের তলায় নামতে শুরু করে।

দৃশ্যটা দেখে ওর স্ত্রীর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

'আজ রাত্তিরে আমরা সবাই মিলে রান্নাঘরে ঘুমোবো,' ন্যাটের গলায় খুশির সুর। 'এখানে আগুনের কাছে শুতে অনেক বেশি আরাম। তা ছাড়া জানলায় ওই আহাম্মুখ পাখিগুলোর ঠকঠক শব্দ শুনেও কোন চিন্তায় পড়তে হবে না।'

আসবাবগুলো নতুন করে সাজাতে বাচ্চাদের সাহায্য নেয় ন্যাট। এবং সাবধানের মার নেই ভেবে, পোশাকের আলমারিটা এবারে জানলার সামনে এনে রাখে। আমরা যথেষ্ট নিরাপদ, ভাবলো সে। শুধু খাবার-দাবারের কথাটাই যা একটু চিন্তায় ফেলছে। খাদ্য আর আগুনের জন্যে কয়লা। এগুলো দু-তিন দিনের মতো যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু তার বেশি নয়। ইতিমধ্যে যদি···

নাঃ, এতো আগেভাগে এমন অযথা চিন্তা করার কোন অর্থ হয় না। তা ছাড়া বেতারেও ওঁরা নির্দেশ জানাবেন নিশ্চয়ই।

কিন্তু এতোক্ষণে এতো সমস্যার মধ্যে ন্যাট আচমকা বুঝতে পারলো, বেতারে শুধুমাত্র নাচের বাজনাই ভেসে আসছে। এর কারণটাও সে জানে। স্বাভাবিক অনুষ্ঠানসূচী বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কেবল মাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই এমন হয়ে থাকে।

ছটায় রেকর্ড বাজানো বন্ধ হলো। সময় সঙ্কেত দেওয়া হলো। কিছুক্ষণের বিরতি, তারপর ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। কণ্ঠস্বরটা শান্ত, গম্ভীর। দুপুরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'লণ্ডন থেকে বলছি,' ঘোষক বললো। 'আজ বিকেল চারটের সময় জাতীয় জরুরী অবস্থা জারী করা হয়েছে। জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদে রক্ষার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু এ কথাও বোঝা প্রয়োজন যে বর্তমান সঙ্কটের অচিন্তিত এবং অতুলনীয় পরিস্থিতির নিরিখে সমস্ত ব্যবস্থাই অবিলম্বে কার্যকরী করে তোলা সহজ নয়। তাই প্রতিটি গৃহস্থকে নিজের ঘরবাড়ির সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যে সমস্ত বাড়িতে অধিক সংখ্যক মানুষ একত্রে বাস করেন—যেমন ফ্ল্যাট বাড়ি এবং হোটেল—সেখানে অনাহূতদের প্রবেশ রোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করার জন্যে সকলকে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে হবে। আজ রাত্রে প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই ঘরে থাকতে বলা হচ্ছে। জানানো হচ্ছে যে, পাখিরা বিপুল সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে দেখামাত্রই মানুষকে আক্রমণ করছে এবং ইতিমধ্যে তারা বাড়িঘরের ওপরেও আঘাত হানতে শুরু করেছে। কিন্তু যথাযোগ্য সাবধানতা নিয়ে সেগুলো পাখিদের প্রবেশের অনুপযুক্ত করে তুলতে হবে।

'জনসাধারণকে শান্ত থাকার জন্যে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

'জরুরী অবস্থার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন আগামী কাল সকাল-সাতটা পর্যন্ত বেতার কেন্দ্র থেকে আর কোঁন প্রচার কার্য চালানো হবে না।'

ওরা 'ঈশ্বর রাণীকে রক্ষা করুন' বাজালো। তারপর সব চুপ।

রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালো ন্যাট, ও-ও তাকালো ন্যাটের দিকে।

'রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া আজ আমরা তাড়াতাড়ি সেরে নেবো,' ন্যাট প্রস্তাব করলো। 'একটা মাঝারি গোছের কিছু—যেমন ধরো, সেঁকা পনির—না, কি বলো? মানে এমন একটা কিছু, যা আমরা

সবাই পছন্দ করি।' স্ত্রীর দিকে চোখ টিপে ঘাড় দোলালো ন্যাট। ওর মুখ থেকে সে আতঙ্কের ছবি মুছে ফেলতে চাইছিলো।

শিস, গান আর যথা সম্ভব বকবক করতে করতে খাওয়া সারতে থাকে ন্যাট। ডানার ঘষটানো আর জানলায় ঠোকরের আওয়াজ প্রথম বারের মতো এখন আর অতোটা তীব্র নয় বলেই মনে হচ্ছিলো তার। এক ফাঁকে শোবার ঘর থেকেও একবার ঘুরে এলো সে, কিন্তু ছাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আওয়াজ আর একবারও শুনতে পেলো না। পাখিগুলোর তা হলে বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে, ভাবলো ন্যাট। ওরা বুঝতে পেরেছে যে, ছাদ ভেঙে ভেতরে ঢোকা যাবে না। এবারে ওরা অন্য কোথাও চেষ্টা শুরু করবে।

খাওয়া-দাওয়া চলার মধ্যে কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ওরা যখন টেবিল ছেড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন নতুন একটা শব্দ শোনা গেলো। পরিচিত একটা গুঞ্জনধ্বনি।...'উড়োজাহাজ', ঝলমলে মুখে ন্যাটের স্ত্রী চোখ তুলে তাকালো, 'পাখির সঙ্গে লড়াই করার জন্যে ওঁরা উড়োজাহাজ পাঠিয়েছেন। পাখিগুলোকে ওরা ঠিকই কায়দা করে ফেলবে।..ওটা বন্দুকের আওয়াজ না? তুমি বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছো না?'

হয়তো সমুদ্রের বুকে গুলিগোলা চলছে, ন্যাট ঠিক মতো জানে না। বারদরিয়ায় সমুদ্র পাখিদের ওপরে নৌবাহিনীর বড়ো বড়ো আগ্নেয়াস্ত্রের কোন কার্যকারিতা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু পাখিরা এখন স্থলভাগের ভেতরে চলে এসেছে। লোকজন আছে বলে বন্দুক-গুলো সৈকতে অবশ্যই গুলি বর্ষণ করতে পারবে না।

'উড়োজাহাজের আওয়াজ শুনতে বেশ লাগছে, তাই না?' ওর স্ত্রী বললো।

ওর উৎসাহের খেই ধরে জিলও জনির সঙ্গে লাফালাফি করতে শুরু করে, 'উড়োজাহাজ পাখিগুলোকে মজা বুঝিয়ে দেবে!'

ঠিক তখনই প্রায় মাইল দুয়েক দূরে চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ার একটা শব্দ শোনা যায়। তারপরেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আওয়াজ।

গুঞ্জনধ্বনি অস্পষ্ট হতে হতে ক্রমে দূর সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়।...

'কি হলো?' ন্যাটের স্ত্রী প্রশ্ন করে।

'জানি না,' জবাব দেয় ন্যাট। যে শব্দগুলো তারা শুনতে পেয়েছিলো সেটা যে উড়োজাহাজের ভেঙে পড়ার শব্দ, তা সে স্ত্রীকে বলতে চাইছিলো না।

অভিযান চালানোর জন্যে প্রাথমিক পরিদর্শক বাহিনী পাঠানো কর্তৃপক্ষের পক্ষে যে স্রেফ জুয়া খেলার সামিল হয়েছে, সে বিষয়ে অবশ্যই কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়তো ওঁরাও জানতেন যে, এ জুয়া আত্মহত্যারই নামান্তর। যারা মৃত্যু বরণ করার জন্যে বিমানের চালক-পাখা এবং কাঠামোর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই পাখিদের বিরুদ্ধে লড়তে এসে নিজেদের ভূপাতিত করা ছাড়া উড়োজাহাজগুলো আর কি-ইবা করতে পারতো?

'উড়োজাহাজগুলো কোথায় গেলো, বাবা?' প্রশ্ন করে জিল।

'ডেরায় ফিরে গেছে।' ন্যাট বললো, 'এবারে এসো, শুয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে।'

উড়োজাহাজের গুঞ্জন আর শোনা গেল না, নৌবাহিনীর আগ্নেয় অস্ত্রগুলোও নীরব। জীবন আর প্রচেষ্টার অনর্থক অপব্যয়, নিজেকে বললো ন্যাট। এভাবে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ওদের ধ্বংস করতে পারবো না, বড়ো বেশি দাম পড়ে যাবে। তবে গ্যাস তো আছে। হয়তো ওঁরা গ্যাস ছড়িয়ে চেষ্টা করবেন, মাস্টার্ড গ্যাস। অবিশ্যি তা যদি করা হয়, তাহলে তার আগে আমাদের অবশ্যই সাবধান করে দেয়া হবে। কিন্তু একটা কথা একেবারে ঠিক, দেশের সেরা মাথাগুলো আজ রাতে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে অনেক ভাবনা চিন্তা করবে।

ওপর তলায় শোবার ঘরগুলো নিস্তব্ধ নিঝুম। জানলায় আর আঁচড় বা ঠোকরের কোন শব্দ নেই। যুদ্ধের মধ্যে একটুখানি শান্ত সময়—যদিও দামাল হাওয়াটা এখনও বন্ধ হয় নি। চিমনির ভেতরে বাতাসের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলো ন্যাট। সমুদ্র তেমনি করেই ভেঙে পড়ছে সৈকতের বুকে।

তখনই জোয়ারের কথা মনে পড়লো ন্যাটের। জোয়ারের গতি এখন ঘুরে গেছে, হয়তো সেজন্যেই যুদ্ধের মধ্যে এই শান্ত পরিস্থিতি। পাখিরাও কিছুকিছু নিয়ম কানুন মেনে চলে এবং পুবালী বাতাস ও জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক রয়ে গেছে। হাতঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ন্যাট। প্রায় আটটা। নিশ্চয়ই একঘণ্টা আগে জোয়ার চলে গেছে। তাই এই নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। জোয়ারের সময় আক্রমণ হেনেছিলো পাখিরা। মনে মনে সময়ের হিসেব কষে নেয় ন্যাট। পরবর্তী আক্রমণের আগে তাদের হাতে আর ছঘণ্টা সময়। রাত একটা কুড়ি নাগাদ ফের জোয়ার শুরু হলেই পাখিরা ফিরে আসবে।

নরম গলায় স্ত্রীকে ডেকে ন্যাট ফিসফিসিয়ে বললো, সে বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসবে খামারের সকলে কেমন আছে। আর সেই সঙ্গে দেখে আসবে, টেলিফোনটা এখনও কাজ করছে কিনা—কারণ তাহলে টেলিফোন দপ্তর থেকে তারা হয়তো খবরাখবর জানতে পারবে।

'বাচ্চাগুলোর সঙ্গে আমাকে একলা রেখে তুমি যাবে না,' ওর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলো।

'বেশ, তা হলে আমি সকাল অব্দি অপেক্ষা করবো।' ন্যাট বললো, 'তাছাড়া সাতটার সময় রেডিওতে সংবাদ-বিজ্ঞপ্তিটাও শোনা যাবে। কিন্তু ফের ভাঁটা এলে আমি কিন্তু খামারে যাবার চেষ্টা করবো। ওঁরা হয়তো আমাদের কিছু রুটি আর আলু দিতে পারবেন।'

জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলায় ন্যাটের মন ফের ব্যস্ত হয়ে ওঠে। খামার বাড়ির লোকজনেরা আজ সন্ধ্যা বেলায় নিশ্চয়ই দুধ দুইতে পারেনি। গরুগুলো হয়তো দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু গৃহস্থরা ছিলেন তক্তা আঁটা জানলার আড়ালে—যেমন তারা নিজেরাও এখানে রয়েছে। অবিশ্যি খামার বাড়িতে ওঁরা যদি সাবধানতা নেবার সময় পেয়ে থাকেন, তবেই তেমন হয়েছে।

আস্তে আস্তে চুপিসারে খিড়কির দরজা খুলে বাইরের দিকে তাকায় ন্যাট। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। সমুদ্র থেকে ছুটে

আসা হিমেল বাতাস আগের চাইতেও দুর্জয় বেগে বয়ে চলেছে। অনেক দূরে পাহাড়ের ওপরে কি যেন একটা জ্বলছে। আসলে ওটা চুরমার হয়ে ভেঙে যাওয়া একটা উড়োজাহাজ—বাতাসকে দোসর পেয়ে খড়ের গাদার মতো লকলকিয়ে জ্বলছে অগ্নিকুণ্ডটা।

সিঁড়ির দিকে লাথি ছুঁড়লো ন্যাট। সিঁড়িতে অজস্র মৃত পাখির স্তূপ। এগুলো সবই আত্মহত্যার ঘটনা, ছোঁ মেরে নেমে আসা পাখিদের ঘাড় মটকানো মৃতদেহ। যতদূর নজর যায়, ন্যাট শুধু মরা পাখিই দেখতে পেলো। জ্যান্ত পাখিরা ভাঁটা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের দিকে উড়ে গেছে। সমুদ্র পাখিরা হয়তো এখনও সমুদ্রে চড়ে বেড়াচ্ছে, যেমন ভেসে বেড়াচ্ছিলো সকালের দিকে। মৃত পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে ন্যাটের মনে হলো, সে যদি ওগুলোকে জানলার তাকে একটার পরে একটা জড়ো করে রাখে, তাহলে পরবর্তী আক্রমণের মোকাবিলায় সেগুলো অতিরিক্ত প্রতিরোধের কাজ করবে। খুব একটা না হলেও, তাতে কিছুটা কাজ অবশ্যই হবে। কারণ সে ক্ষেত্রে জ্যান্ত পাখিদের জানলার তাকগুলো অধিকার করে শার্শির ওপরে আক্রমণ চালাতে হলে, আগে মৃত দেহগুলোতে থাবা আর ঠোঁট বসিয়ে সে-গুলোকে টেনে সরাতে হবে।

অন্ধকারের মধ্যেই কাজ শুরু করে দেয় ন্যাট। কাজটা খানিকটা বিচিত্র। মরা পাখিগুলোকে স্পর্শ করতেও তার জঘন্য লাগছিলো, কিন্তু তবু সে কাজ চালিয়ে গেলো। বিকৃত মুখে লক্ষ্য করলো, প্রতিটা শার্শির অবস্থাই জীর্ণ হয়ে এসেছে, স্রেফ তক্তাগুলোই পাখিদের ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। ফাটল ধরা শার্শিগুলোর কাছে রক্তাক্ত মৃত পাখিগুলোকে ঠেস দিয়ে রাখতে গিয়ে ন্যাটের পেট মুচড়ে উঠছিলো। কাজটা শেষ করে বাড়িতে ঢুকে, সে রান্নাঘরের দরজাটার সামনেও একটা প্রতিরোধের বন্দোবস্ত করে সেটাকে দুগুণ বেশি নিরাপদ করে তুললো।

ন্যাটের স্ত্রী ওকে এক পেয়ালা কোকো বানিয়ে দিলো, পিপাসার্তের মতো ন্যাট পান করে নিলো সেটা। মৃদু হেসে বললো, 'সব ঠিক

আছে, কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না। আমরা পার পেয়ে যাবো।'
তারপর তোষকের ওপরে শুয়ে চোখ বন্ধ করলো।

কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেও এক নিদারুণ অস্বস্তি ওর অনুভূতিতে ছায়া ফেলছিলো। একটা কিছু ভুলে যাওয়ার আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো ওর স্বপ্নের মধ্যে। কি একটা কাজ যেন ওর করার কথা ছিলো। কাজটার সঙ্গে ওই জ্বলন্ত বিমানটার যেন কি একটা সংযোগ আছে। শেষ অব্দি স্ত্রী কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে ন্যাটের ঘুম ভাঙালো।

'ওরা ফের শুরু করেছে,' ফুঁপিয়ে উঠলো ওর স্ত্রী। 'গত একঘণ্টা ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি একা একা আর ওই শব্দ শুনতে পারছি না! তা ছাড়া কিসের যেন একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, কিছু একটা পুড়ছে।'

তখনই ভুলে যাওয়া কাজটা মনে পড়লো ন্যাটের। সে আগুন জ্বালাতে ভুলে গিয়েছিলে। আগুনটা এখন প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে।

চকিতে বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বাললো ন্যাট। দরজা জানলায় ঠোকাঠুকির পালা চলেছে বটে, কিন্তু তা নিয়ে আপাতত ওর কোন মাথা ব্যথা নেই। একটা তীব্র কটু গন্ধ রান্নাঘরটা ছেয়ে ফেলেছে এবং গন্ধটা ঝলসানো পালকের। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো ন্যাট—পাখিগুলো চিমনি দিয়ে রান্নাঘরে নেমে আসছিলো।

একরাশ কাঠকুটো আর কাগজ নিভন্ত আগুনের ওপরে ফেলে কেরাসিনের টিনটা নিয়ে এলো ন্যাট। স্ত্রীকে চিৎকার করে বললো, 'পেছনে সরে দাঁড়াও।' তারপর খানিকটা কেরোসিন ছুঁড়ে দিলো আগুনের দিকে।

আগুনের শিখা শনশনিয়ে নল বেয়ে ওপরে উঠতেই, পুড়ে যাওয়া পাখিগুলোর অঙ্গারের মতো কালো দেহ আগুনের মধ্যে এসে পড়লো।

বাচ্চাদুটো কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিলো। 'এগুলো কি, বাবা?' জিল জিজ্ঞেস করলো, 'কি হয়েছে?'

ওর প্রশ্নের জবাব দেবার মতো সময় তখন ন্যাটের নেই। সে

তখন চিমনির নল থেকে মরা পাখিগুলোকে আঁকশি দিয়ে টেনে এনে, মেঝের ওপরে রাখছিলো। আগুনের শিখা চিমনির ওপর দিককার অংশ থেকে পাখিদের বের করে দেবে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে নিচের অংশটা নিয়ে। শরীরে আগুন ধরে যাওয়া অসহায় পাখিগুলোর ঝলসানো দেহ নলের তলার দিকটা একেবারে বুজিয়ে ফেলেছে। জানলা এবং দরজায় ওদের অবিরাম আক্রমণের দিকে ন্যাটের বলতে গেলে কোন ভ্রূক্ষেপেই নেই। ভেতরে ঢোকার মরিয়া প্রচেষ্টায় ওরা যতোই ডানা ঝাপটাক বা ঠোকাঠুকি করুক, জানলা-দরজা ভেঙে ভেতরে ওরা ঢুকতে পারবে না—বরং ঘাড় মটকে মারা পড়বে।

'কান্না থামাও,' বাচ্চাদের ন্যাট বললো। 'ভয়ের কিছু নেই, কান্নাকাটি কোরো না।'

হঠাৎ জানলার তক্তায় আঘাতের শব্দকে ছাপিয়ে রান্নাঘরের ঘড়িটা পরিচিত শব্দে বেজে উঠলো। রাত তিনটে। আর ঘণ্টা চারেকের সামান্য বেশি সময় বাকি। জোয়ার ঠিক কটা অব্দি থাকবে, সে বিষয়ে ন্যাট পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। তবে সে অনুমান করছিলো, সাড়ে সাতটার অনেক আগেই জোয়ারের গতি ঘুরে যাবে।

উনুনের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো ন্যাট। আগুনটা প্রায় মরে এসেছে, কিন্তু চিমনি থেকে আর কোন পোড়া শরীর উনুনের মধ্যে এসে পড়ছে না। আঁকশিটা নলের ভেতর দিয়ে যতোদূর সম্ভব ওপরের দিকে তুলেও সে কোন কিছুর সন্ধান পেলো না। নলটা ভরাট হয়ে যাবার বিপদ এখন কেটে গেছে। দিন-রাত্তির আগুনটা জ্বেলে রাখলে ফের আর অমন হবে না। কাল খামার বাড়ি থেকে আমাকে আরও জ্বালানি নিয়ে আসতে হবে, ভাবলো ন্যাট। ভাঁটার সময় বেরিয়ে, আমাদের যা কিছুর প্রয়োজন তা নিয়ে আসবো। তা হলে দিব্যি চলবে—শুধু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে, এই যা।

ওরা চা আর কোকো পান করলো, রুটি খেলো। ন্যাট লক্ষ্য করলো আর মাত্র আধখানা পাঁউরুটি রয়েছে। থাকগে, রুটি ওরা

ঠিকই পেয়ে যাবে। সকাল সাতটা অব্দি, মানে বেতারে যখন প্রথম খবর বলবে ততোক্ষণ অব্দি ওরা যদি এ ভাবে কাটিয়ে দিতে পারে তা হলে বলতে হবে, সময়টা ওরা তেমন খারাপ ভাবে কাটায়নি।

'আমরা ধূমপান করি, এসো।' ন্যাট স্ত্রীকে বললো, 'সিগারেটের গন্ধে পালক পোড়ার গন্ধ চলে যাবে।'

'প্যাকেটের মধ্যে মাত্র দুটো রয়েছে। আমি ভাবছিলাম, তোমার জন্যে আরও কয়েকটা কিনে আনবো।'

'আমি একটা খাবো,' বললো ন্যাট। এক হাতে স্ত্রী আর এক হাতে জিলকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলো সে। জিলের কোলে জনি। কম্বলগুলো ওদের গায়ের ওপর দিয়ে তোষকের ওপরে ছড়ানো।

'ভিখারীদের প্রশংসা না করে পারা যায় না,' ন্যাট বললো। ওদের অধ্যবসায় আছে। মনে হয় ওরা বুঝি ওদের কাজে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়।'

কিন্তু প্রশংসার কথাবার্তা টিকিয়ে রাখা শক্ত হয়ে উঠলো। টোকা দেবার মতো মৃদু আঘাতের শব্দ তো ক্রমাগত চলছিলোই, তার মধ্যে আচমকা নতুন একটা খরখরে শব্দ ন্যাটের শ্রবণে আঘাত হানলো। মনে হলো যেন তীক্ষ্ণতর কোন ঠোঁট তার বন্ধুদের কাছ থেকে কাজের ভারটা তুলে নিয়েছে। প্রাণপণে পাখিদের নাম মনে করার চেষ্টা করতে লাগলো ন্যাট— ভেবে বের করতে চাইলো, এ-ধরনের বিশেষ কাজ কোন কোন পাখি করে থাকে। এটা কাঠঠোকরার আওয়াজ নয়। কাঠঠোকরা হলে ঠোকরের আওয়াজ আরও হালকা এবং ঘনঘন হতো। কিন্তু এ আওয়াজ আরও গভীর—বেশিক্ষণ ধরে চললে এ আঘাতে জানলা দরজার কাঠ ফালিফালি হয়ে যাবে, যেমন হয়েছে শার্শিগুলোর দশা।

তখন বাজপাখিদের কথা মনে পড়লো ন্যাটের। তবে কি বাজপাখিরা সমুদ্র-পাখিদের জায়গা নিয়েছে? বিশাল শিকারী পাখি বাজার্ডরা জানলার তাকে জায়গা নিয়ে ঠোঁটের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধারালো নখরগুলোকেও ব্যবহার করছে? বাজ, চিল, বাজার্ড,

শকুন। শিকারী পাখিদের কথা ভুলে গিয়েছিলো ন্যাট, ভুলে গিয়েছিলো তাদের অসামান্য শক্তির কথা।···এখনও তিনঘণ্টা সময় বাকি।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ন্যাট, দেখে নিলো দরজাটা জোরদার করার জন্যে কোন্ আসবাবটা ত্যাগ করা যেতে পারে। পোশাকের আলমারিটার জন্যে জানলাগুলো নিরাপদ আছে। কিন্তু দরজাটার ব্যাপারে সে নিশ্চিত নয়। ওপর তলায় উঠে গেলো সে, কিন্তু সিঁড়িটা পেরিয়েই থমকে দাঁড়ালো। বাচ্চাদের শোবার ঘরের মেঝেতে মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। তার মানে, পাখিরা ও ঘরে ঢুকে পড়েছে। অন্য ঘরটা এখনও নিরাপদ। বাচ্চাদের ঘরের দরজাটা যদি ভেঙে পড়ে, সে জন্যে অন্য ঘরের আসবাবপত্র টেনে বের করে সিঁড়ির মাথায় জড়ো করে রাখলো ন্যাট।

'নিচে নেমে এসো, ন্যাট,' ওর স্ত্রী ডাকলো। 'কি করছো তুমি?'

'আমার দেরি হবে না,' ন্যাট চিৎকার করে জানায়। 'এখানটা একটু গোছগাছ করে আসছি।'

স্ত্রী ওপরে আসুক, ন্যাট তা চাইছিলো না। চাইছিলো না, বাচ্চাদের ঘরে হালকা পায়ে চলাফেরার শব্দ বা ঘরের দরজায় ওই ডানা ঘষার আওয়াজ ও শুনতে পায়।

প্রাতরাশের প্রস্তাব তুলে, ঢিমে তালে এগিয়ে চলা ঘড়ির কাঁটা-দুটোর দিকে তাকিয়ে রইলো ন্যাট। তার ধারণা যদি নির্ভুল না হয়, জোয়ারের গতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ যদি বন্ধ না হয়—তা হলে ন্যাট জানে, তারা নিশ্চিত ভাবে হেরে যাবে। আলো বাতাস বিশ্রাম এবং জ্বালানি ছাড়া সারাটা দিন তারা ওই রান্নাঘরে বন্দী হয়ে থাকতে পারবে না।

একটা চটপটে আওয়াজ কানে ঢুকে ন্যাটের আচমকা মরিয়া হয়ে ঘুমোনোর ইচ্ছেটাকে তাড়িয়ে দেয়।

'ওটা কি হচ্ছে?' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করে সে।

'রেডিওর আওয়াজ,' ওর স্ত্রী জানায়। 'আমি ঘড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। এখন প্রায় সাতটা বাজে।'

বেতারের স্বস্তিকর আওয়াজটা নতুন জীবন নিয়ে আসে। অপেক্ষা করে থাকে ওরা। রান্নাঘরের ঘড়িতে সাতটার ঘণ্টা বাজে। কিন্তু চট্‌পট্‌ আওয়াজটা চলতেই থাকে, আর কিছু নয়। কোন সুরসঙ্গতি না, বাজনা না—কিছু না। সিকি ঘণ্টা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে ওরা, কিন্তু কোন সংবাদ বিজ্ঞপ্তিই প্রচারিত হয় না।

'আমরা ভুল শুনেছিলাম,' ন্যাট বললো। 'আটটার আগে ওরা কিছু প্রচার করবে না।'

বেতার যন্ত্রটা ওরা চালু করেই রাখলো। ন্যাট ব্যাটারির কথাটা চিন্তা করছিলো—ব্যাটারিতে আর কতোটা শক্তি অবশিষ্ট আছে, কে জানে। সেটা অক্ষম হলে, কর্তৃপক্ষের কোন নির্দেশই ওরা শুনতে পাবে না।

'আলো ফুটছে,' ন্যাটের স্ত্রী ফিসফিসিয়ে বললো। 'আমি তা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারছি। আর শোনো! পাখিগুলো এখন কিন্তু আর অতোটা জোরে ধাক্কাধাক্কি করছে না।'

ও ঠিকই বলেছিলো। আঁচড় কাটার আওয়াজ, ঠোকার শব্দ—সবই প্রতি মুহূর্তে ক্ষীণতর হয়ে আসছিলো। ডানা ঘষটানো, সিঁড়িতে বা জানলার তাকে জায়গা দখলের ধস্তাধস্তি—সবই তাই।...জোয়ারের মোড় ঘুরে গেছে।

আটটা নাগাদ কোন শব্দই আর রইলো না। শুধুমাত্র বাতাসের শব্দ। আর বেতারের সেই একঘেয়ে অর্থহীন আওয়াজ। অবশেষে এই নিবিড় প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো বাচ্চাদুটো।

সাড়ে আটটায় বোতাম টিপে বেতার যন্ত্রটা বন্ধ করে দিলো ন্যাট।

'খবরটা শুনতে পাবো না কিন্তু,' ওর স্ত্রী বললো।

'খবর হবে না,' ন্যাট বললো। 'নিজেদের ওপরেই আমাদের ভরসা করে থাকতে হবে।'

দরজার কাছে গিয়ে প্রতিবন্ধকগুলো টেনে সরিয়ে ছিটকিনি খুললো

ন্যাট। তারপর সিঁড়ি থেকে পাখিদের ভাঙাচোরা দেহগুলো লাথি মেরে সরিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে বুক ভরে নিশ্বাস নিলো। কাজ করার জন্যে তার হাতে ছ ঘণ্টা সময় এবং ন্যাট জানে তাকে যথা সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে, কোন মতেই তা নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। খাদ্য, আলো এবং জ্বালানি—এগুলোই সব চাইতে প্রয়োজনীয়। এগুলো যদি সে সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে আর একটা রাতও তারা কাটিয়ে দিতে পারবে।

বাগানে এসে জ্যান্ত পাখিগুলোকে দেখতে পেলো ন্যাট। সমুদ্র-পাখিরা আগের মতোই সমুদ্রের জলে চড়তে চলে গেছে। ফের আক্রমণ চালাতে ফিরে আসার আগে তাদের সামুদ্রিক খাদ্য এবং জোয়ারের প্লবতার প্রয়োজন। কিন্তু স্থলচর পাখিদের সে প্রয়োজন নেই। তারা অপেক্ষা করছে আর নজর রাখছে। ন্যাট দেখলো, বেড়াঝোপ গাছগাছালি আর বাইরের মাঠে-প্রান্তরে তারা সারি সারি দল বেঁধে নিস্পন্দ হয়ে বসে রয়েছে। নিজের ছোট্ট বাগানটার শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেলো ন্যাট। পাখিগুলো একটুও নড়লো না, শুধু লক্ষ্য করতে লাগলো তাকে। আমাকে খাবার আনতে হবে, নিজেকে বললো ন্যাট, খাবার আনার জন্যে আমাকে খামার বাড়িতে যেতে হবে।

ফের বাড়িতে ঢুকে জানলা দরজাগুলো একবার দেখে নিলো ন্যাট। তারপর বললো, 'আমি খামারে যাচ্ছি।'

কিন্তু ন্যাটের স্ত্রী পথ জুড়ে দাঁড়ালো। খোলা দরজা দিয়ে ও জ্যান্ত পাখিগুলোকে দেখতে পেয়েছিলো। তাই মিনতি করে বললো, 'আমাদেরও সঙ্গে নিয়ে চলো। আমরা এখানে একা একা থাকতে পারবো না। মরে গেলেও আমি একা একা এখানে থাকবো না।'

'তবে চলো। কয়েকটা ঝুড়ি আর জনির প্রামটাও নিয়ে চলো। প্রামটাতে করে আমরা জিনিসপত্র বয়ে আনতে পারবো।'

হিমেল বাতাসের তীক্ষ্ণ কামড় থেকে আত্মরক্ষার উপযোগী পোশাক পরে নিলো ওরা। ন্যাটের স্ত্রী জনিকে প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে নিয়ে

চললো, ন্যাট ধরলো জিলের হাত।

'কতো পাখি!' জিল কাঁদোকাঁদো গলায় বললো, 'সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে পাখিগুলো!'

'ওরা আমাদের কিছু বলবে না,' ন্যাট আশ্বাস দিলো, 'দিনের আলোয় ওরা কিচ্ছুটি করবে না।'

মাঠ ধরে প্রাচীরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললো ওরা। পাখিগুলো একটুও নড়াচড়া করলো না, শুধু বাতাসের দিকে মাথা ঘুরিয়ে অপেক্ষা করে রইলো। খামারবাড়ির মোড়ে পৌঁছে ন্যাট বাচ্চাদুটোকে নিয়ে স্ত্রীকে বেড়াঝোপটার আড়ালে অপেক্ষা করতে বললো। 'কিন্তু আমি মিসেস ট্রিগের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' ওর স্ত্রী আপত্তি জানালো। 'গতকাল ওঁরা যদি বাজারে গিয়ে থাকেন তাহলে ওঁদের কাছ থেকে আমরা অনেক জিনিসই ধার করে আনতে পারবো। আর···'

'এখানে দাঁড়াও,' ওকে থামিয়ে দিলো ন্যাট। 'আমি এক্ষুনি আসছি।'

গরুগুলো হাম্বা হাম্বা রব তুলে অশান্ত ভাবে উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। বেড়ার একটা অংশে কিছুটা ফাঁক দেখতে পেলো ন্যাট—ভেড়াগুলো ওখান দিয়ে পথ করে খামারবাড়ির সামনের বাগানটাতে অবাধে চড়তে চলে গেছে। বাড়ির চিমনিতে ধোঁয়ার কোন চিহ্ন নেই।

নিবিড় আশঙ্কায় ন্যাটের মন ভরে উঠলো। স্ত্রী আর বাচ্চাদুটোকে নিয়ে খামারবাড়িতে তার আর যাবার ইচ্ছে রইলো না। ভরা বাঁট নিয়ে উঠোনের এ-ধার ওধারে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো বিপদগ্রস্ত গরুগুলোকে ঠেলে সরিয়ে এগুতে লাগলো সে। ট্রিগদের গাড়িটা দাঁড় করানো রয়েছে, ওটা গ্যারাজে ঢোকানো হয়নি। খামারবাড়ির সব কটা জানলাএকেবারে বিধ্বস্ত। উঠোন আর বাড়িটার চতুর্দিকে অসংখ্য সমুদ্রপাখির মৃতদেহ। জ্যান্ত পাখিরা দল বেঁধে বাড়ির পেছন দিককার গাছপালা আর ছাদের ওপরে বসে রয়েছে। একেবারে স্থির, নিশ্চল ওরা। উঠোনেই পড়ে রয়েছে জিমের দেহটা—মানে দেহের অবশিষ্ট অংশটুকু। পাশেই তার বন্দুকটা।

বাড়ির দরজাটা ছিটকিনি দিয়ে আটকানো ছিলো। কিন্তু একটা জীর্ণ জানলা ধাক্কা মেরে খুলে, সেটার মধ্যে দিয়ে ভেতরে গলে যেতে কোন অসুবিধে হলো না ন্যাটের। ট্রিগের দেহটা টেলিফোনের একেবারে কাছাকাছি পড়েছিলো। পাখিরা ওঁকে পাকড়াও করার সময় উনি নিশ্চয়ই টেলিফোন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাহায্য পাবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্রাহযন্ত্রটা ঝুলছে অসহায়ের মতো এবং পুরো যন্ত্রটা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে দেয়াল থেকে। মিসেস ট্রিগের কোন চিহ্ন নেই। উনি নিশ্চয়ই ওপর তলায় আছেন। কিন্তু সে জন্যে ওপরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি? ক্লান্ত হয়ে উঠলো ন্যাট—ওপরে গেলে কি দেখা যাবে, তা সে জানে। মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালো সে, ভাগ্যিস বাড়িতে কোন বাচ্চাকাচ্চা নেই!

জোর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো ন্যাট, কিন্তু মাঝ পথ অব্দি গিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিচে নেমে এলো। ওপর তলায় শোবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে মিসেস ট্রিগের পাদুটো বাইরে বেরিয়েছিলো। ওঁর আশেপাশে গোটা কতক পিঠ-কালো সমুদ্রপাখির দেহ আর একটা ছাতা। ছাতাটা ভাঙা। এখানে থাকা অর্থহীন, ভাবলো ন্যাট। আমার হাতে আর মাত্র পাঁচ ঘণ্টা সময়, কিংবা তারও কম। ট্রিগরা নিশ্চয়ই আমাকে ভুল বুঝবেন না—যা পাওয়া যায়, তা-ই এখন আমি নিয়ে যাবো।

দৃঢ় পায়ে স্ত্রী আর বাচ্চাদের কাছে ফিরে এলো ন্যাট।

বললো, 'আমি গাড়িটাতে মালপত্র তুলতে যাচ্ছি। তারপর সেগুলো বাড়িতে রেখে, ফের মাল নেবার জন্যে এখানে আসবো।'

'ট্রিগদের কি খবর?' ওর স্ত্রী জানতে চাইলো।

'ওঁরা নিশ্চয়ই বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চলে গেছেন।'

'তা হলে আমি কি এসে তোমাকে সাহায্য করবো?'

'না, ওখানটাতে একেবারে বিশ্রী অবস্থা হয়ে রয়েছে। চারদিকে গরু ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমরা বরং এখানেই দাঁড়াও। আমি গাড়িটা নিয়ে আসছি, তোমরা গাড়িতে বসে থাকবে।'

ন্যাট যতোক্ষণ কথা বলছিলো, ওর স্ত্রীর চোখদুটো ততোক্ষণ লক্ষ্য করছিলো ন্যাটকে। ও নিশ্চয়ই তার কথা বুঝতে পেরেছে বলে বিশ্বাস করলো ন্যাট। নয়তো ও নির্ঘাৎ রুটি আর মশলাপাতি খোঁজার জন্যে তাকে সাহায্য করার বায়নাক্কা ধরে থাকতো।

প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নেওয়া হয়েছে বলে তুষ্ট হতে মোট তিন-বার ওদের খামার বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে হলো। সব চাইতে প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে, জানলায় লাগানোর তক্তা। বাড়ির সব কটা জানলাই ন্যাট নতুন করে তক্তা দিয়ে আটকাতে চাইছিলো। তাই খুঁজে খুঁজে কাঠের সন্ধান করতে হলো তাকে।

শেষবার গাড়ি নিয়ে ফেরার পথে বাসস্টপে গিয়ে দূরভাষ ব্যব-হারের খুপবিতে ঢুকলো ন্যাট। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরে বৃথাই সে কট্‌কট্‌ করে হুকটা টেপাটেপি করলো। কোন সাড়া শব্দ নেই। একটা ঢিবির ওপরে উঠে পুরো শহরতলিটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলো, কোথাও জীবনের একটুকু চিহ্ন নেই—শুধু প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকা নিশ্চল নজরদার পাখিগুলো ছাড়া। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পালকে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোচ্ছেও। ওরা নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া করবে, ভাবলো ন্যাট, নিশ্চয়ই শুধু শুধু এ-ভাবে দাঁড়িয়ে বসে থাকবে না। কিন্তু তারপরেই কথাটা মনে পড়লো তার। আসলে খাদ্যবস্তুতে ওদের ভেতরটা বোঝাই হয়ে আছে, রাত্রিবেলা ওরা গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেছে। তাই সকাল বেলায় আর নড়াচড়া করছে না।

অকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো ন্যাট। বিবর্ণ, ধূসর আকাশ। পুবালী বাতাসের প্রবল ঝাপটায় পাতাবিহীন নগ্ন গাছগুলো যেন নুয়ে পড়েছে, কালচে হয়ে উঠেছে। কিন্তু হিমেল বাতাস ক্ষেতে-মাঠে অপেক্ষায় বসে থাকা পাখিগুলোর কোন ক্ষতিই করতে পারেনি। এই হচ্ছে পাখিগুলোকে বাগে আনার সব চাইতে সেরা সময়, নিজেকে বললো ন্যাট। এখন ওরা অনড় লক্ষ্যবস্তু মাত্র—নিশ্চয়ই সমস্ত দেশ জুড়েই তাই। এখন আমাদের বিমান-বহর আকাশে উঠে গিয়ে ওদের ওপরে মাস্টার্ড গ্যাস ছড়িয়ে দিচ্ছে না কেন? কি করছেন

আমাদের তা বড়ো তা বড়ো কর্তা ব্যক্তিরা? তাঁদেরও তো কথাটা জানা উচিত, কারণ তাঁরাও তো নিশ্চয়ই নিজেদের চোখে সব কিছু দেখছেন।

গাড়ির কাছে ফিরে এসে চালকের আসনে উঠে বসলো ন্যাট।

'দু নম্বর দরজাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে চলো,' ওর স্ত্রী অস্ফুটে বললো, 'ডাক-হরকরাটা ওখানে পড়ে রয়েছে। আমি চাই না, জিল তা দেখুক।'

পৌনে একটার সময় বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো ওরা। আর মাত্র একঘণ্টা বাকি।

'তোমরা বরং খাওয়া-দাওয়া সেরে ফ্যালো,' ন্যাট বললো। 'খানিকটা সুরুয়া তোমার আর বাচ্চাদুটোর জন্যে গরম করে নাও। আমার এখন খাবার সময় নেই। আমাকে এখন গাড়ি থেকে সমস্ত মালপত্রগুলো নামাতে হবে।'

বাড়ির ভেতরে মালপত্রগুলো নিয়ে এলো ন্যাট। পরে এগুলো ঠিক মতো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যাবে। সামনের দীর্ঘ সময়টাতে ওরাও তা হলে করার মতো কিছু কাজ পাবে।

কিন্তু জানলা দরজাগুলোর অবস্থা একবার দেখে নেওয়া দরকার। নিয়ম মাফিক বাড়ির চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রতিটা জানলা দরজা পরীক্ষা করে নিলো ন্যাট। তারপর ছাদে উঠে, রান্নাঘর ছাড়া আর প্রতিটা চিমনির খোলা মুখ তক্তা মেরে ঢেকে দিলো। শীত এখন এতো জোরদার যে ন্যাট তা সহ্য করতে পারছিলো না। কিন্তু কাজটা শেষ করতেই হবে। মাঝে মাঝেই সে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো, কোন উড়োজাহাজ আসছে কি না। কিন্তু কেউ এলো না। কাজ করতে করতে কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতার উদ্দেশ্যে অভিশম্পাত দিতে লাগলো ন্যাট। তারপর শোবার ঘরের চিমনিটা ঢেকে, হাতের কাজ থামিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো। কি যেন নড়াচড়া করছে ওখানে—ঢেউয়ের মাঝে মাঝে ধূসর আর সাদা রঙের কতকগুলো কি যেন।

'আমাদের নৌবাহিনী,' বললো ন্যাট। 'ওরা কিছুতেই আমাদের সর্বনাশ হতে দেবে না। উপসাগরের দিকে বাঁক নিচ্ছে ওরা।'

একদৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে ওঠে ন্যাটের। কিন্তু আসলে সে ভুল করেছিলো। ওগুলো জাহাজ নয়, সমুদ্রপাখিরা উঠে আসছিলো জল ছেড়ে। মাঠে ঘাটে ছড়ানো নিস্পন্দ পাখিগুলোও ডানায় ঝটপটানি তুলে, ঝাঁক বেঁধে, ডানায় ডানা মিলিয়ে উঠে পড়ছিলো আকাশের বুকে।

জোয়ারের গতি ফিরে এসেছে আবার।···

মই বেয়ে নিচে নেমে এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো ন্যাট। সবাই তখন খেতে বসেছে। দুটো বেজেছে মাত্র খানিকক্ষণ আগে।

দরজায় ছিটকিনি তুলে, আসবাবপত্রগুলো তার সামনে এনে রাখলো ন্যাট। তারপর আলো জ্বেলে দিলো।

'রাত্তির হয়ে গেছে,' ছোট্ট জনি টুকটুক করে বললো।

ন্যাটের স্ত্রী চাবি ঘুরিয়ে ফের বেতার যন্ত্রটা চালু করে দিয়েছিলো। কিন্তু সেই একঘেয়ে অর্থহীন বিশ্রী শব্দটা ছাড়া আর কিছুই শোনা গেলো না।

'আমি রেডিওর কাঁটাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলাম, কোন বিদেশী স্টেশন ধরা যায় কি না। কিন্তু এই শব্দটা ছাড়া কোথাও কিছু পেলাম না।'

'হয়তো তাদেরও এই একই ঝামেলা চলেছে।' ন্যাট বললো, 'হয়তো সমস্ত ইউরোপ জুড়েই তাই।'

নিঃশব্দে খেতে থাকে সকলে।

একটু পরেই টোকা দেবার আওয়াজ শুরু হয়ে যায়। জানলায়, দরজায়। ডানার খসখস শব্দ, হালকা পায়ে ছোটাছুটি, জানলার তাকে জায়গা দখল নিয়ে ধস্তাধস্তি। আত্মঘাতী সমুদ্রপাখিগুলোর দরজায় মাথা ঠুকে সিঁড়িতে লুটিয়ে পড়ার প্রথম আওয়াজ।···

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ন্যাট ঠিক করলো, খামারবাড়ি থেকে নিয়ে আসা জিনিসপত্রগুলো সে পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখবে।

জানলা আর চিমনির মুখে আঁটা তক্তাগুলো যথেষ্ট শক্ত। খাবার-দাবার, জ্বালানি, কয়েকটা দিনের জন্যে ওদের যা কিছু প্রয়োজন—তা সবই এখন বাড়িতে মজুত। অতএব বৃথা উদ্বিগ্ন হওয়া অর্থহীন। জিনিসপত্র গোছগাছ করার ব্যাপারে স্ত্রী ওকে সাহায্য করতে পারবে, বাচ্চাগুলোও পারবে। এখন থেকে পৌনে নটা অব্দি, মানে ভাঁটা আসা পর্যন্ত, এ-সব করতে করতেই ক্লান্ত হয়ে উঠবে ওরা। ন্যাট তখন ওদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খেয়াল রাখবে, যাতে রাত তিনটে অব্দি ওরা নিঃসাড়ে ঘুমোয়।

জানলাগুলোর সম্পর্কে ন্যাট একটা নতুন পরিকল্পনার কথা চিন্তা করেছে। সেটা হচ্ছে, তক্তাগুলোর সামনের দিকটায় সে কাঁটাতার লাগিয়ে দেবে। খামারবাড়ি থেকে একগাদা কাঁটাতার নিয়ে এসেছে সে। নটা থেকে তিনটের মধ্যে, স্বস্তির সময়টাতেই, অন্ধকারের মধ্যে তাকে এ কাজটা করতে হবে—এটাই হচ্ছে বিশ্রী ব্যাপার। কথাটা আগে কেন মনে হয়নি, ভেবে আফসোস হলো ন্যাটের। যাই হোক, বউ আর বাচ্চারা যতোক্ষণ ঘুমোবে—ততোক্ষণ সেটাই হবে তার আসল কাজ।

জানলায় এখন ছোটোখাটো পাখিগুলো রয়েছে। ওদের ঠোঁটের মৃদু ঠুকঠুকানি আর ডানার নরম ঘষটানোর আওয়াজেই ন্যাট ওদের চিনতে পেরে গেছে। বাজ চিল-শকুনের দল জানলাগুলোকে বাতিল করে দিয়ে দরজার ওপরে তাদের আক্রমণ শানিয়ে তুলেছে।...

দরজা থেকে ফালি ফালি কাঠের চাকলা ওঠার শব্দ শুনতে শুনতে ন্যাট চিন্তা করতে লাগলো—ওদের ছোটোছোটো মস্তিষ্ক, ধারালো ঠোঁট আর তীক্ষ্ণ চোখগুলোতে কতো লক্ষ কোটি বছরের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে ছিলো, যা নিখুঁত আর সুদক্ষ যন্ত্রের বলে বলীয়ান মানুষজাতিকে ধ্বংস করে ফেলার জন্যে ওদের এই আশ্চর্য প্রেরণা যোগাচ্ছে।...

'ওই শেষ সিগারেটটা আমি এবারে ধরাবো,' স্ত্রীকে বললো ন্যাট। 'আমি একটা বুদ্ধু। এই একটা জিনিসই আমি খামারবাড়ি থেকে আনতে ভুলে গেছি।'

হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিয়ে, বিশ্রী শব্দ তোলা বেতার যন্ত্রটাকে চালু করে দিলো ন্যাট। তারপর সিগারেটের শূন্য প্যাকেটটা আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে সেটার পুড়ে যাওয়া লক্ষ্য করতে লাগলো।

দ্য বার্ডস : দাফন দ্য মরিয়া

আর এক জন

বাতি দুটো না ধরানো অব্দি হারগ্রিভস কোন কথা বলেননি। এবং তারপরেও উনি গা থেকে ওভারকোটটা পর্যন্ত খোলেননি। ঘরটা ঠাণ্ডা হলেও, কেমন একটা বিশ্রী গুমোট আর মৃদু সুগন্ধে ভরা। জানলার খড়খড়িগুলো পুরোপুরি বন্ধ না থাকার দরুন বাইরে রাস্তার আলোয় অশান্ত তুষারকণার উপস্থিতি স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রথম, হারগ্রিভস ইতস্তত করছিলেন।

'লক্ষ্যবস্তুটা ছিলো ওখানে,' বিছানার দিকে দেখিয়ে হারগ্রিভস বললেন। 'এই দরজা দিয়ে সে ভেতরে, এখানে এসে ঢুকেছিলো।··· এবারে হয়তো আপনি একটু ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?'

হারগ্রিভসের সাঙ্গনী মাথা নাড়লো।

'না না, আমি বিভ্রান্তি আনার চেষ্টা করছি না।' হারগ্রিভস মৃদু হাসলেন, 'বরং বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টাই করছি।···এবারে আমরা নিচের তলায় যাবো কি?'

শব্দপোক্ত বিরাট বাড়িটায় কোথাও কোন ঘড়ির আওয়াজ পর্যন্ত নেই। কিন্তু গালচের গদির নিচে থাকা সত্ত্বেও সিঁড়ির ধাপগুলো তীক্ষ্ণ-সুরে প্রতিবাদ জানালো। পেছন দিকে, পড়াশুনো করার মতো ছোট্ট একখানা ঘরে গ্যাসের আগুন জ্বলছিলো। দূর থেকেও শোনা যাচ্ছিলো সেটার হিসহিসে শব্দ, নিরেট নীল শিখার মতো হয়ে আগুনটা গর্জন তুলছিলো হিটারের সাদা নকশা কাটা জালির মধ্যে। কিন্তু ঘরের দুরন্ত ঠাণ্ডা তাতে দূর হচ্ছিলো সামান্যই। আগুনটার উলটো দিকে রাখা একখানা কুর্সির দিকে সঙ্গিনীকে এগিয়ে দিলেন হারগ্রিভস।

'ঘটনাটার সম্পর্কে আমি আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে চাই। মনে করবেন না যে আমি....' দাবার চাল দেবার মতো ভঙ্গিমায় হারগ্রিভসের কবজিখানা দ্বিধাগ্রস্তের মতো সঠিক শব্দটাকে হাতড়াতে থাকে, 'আমি অতি পণ্ডিত হবার চেষ্টা করছি।...মনে করবেন, আপনি যেন এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না...এ ব্যাপারের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্কই নেই। তাঁকে যে সমস্যাটার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, সেটা বোঝার পক্ষে এটাই একমাত্র উপায়।'

অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কথাটা বললেন হারগ্রিভস। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে ছিলেন উনি, ভ্রূর নিচ থেকে চোখের দৃষ্টি ওপরের দিকে ছড়ানো। ভারি ওভারকোটটা ওঁর হাটুর দুপাশ দিয়ে ঝুলে রয়েছে। দস্তানাপরা সুস্থির হাত দুখানা কদাচিৎ সামান্য অঙ্গ-ভঙ্গিমা প্রকাশ করছে, নয়তো হাঁটু দুটোকে চেপে ধরছে।

'টনি মারভেলকে দিয়েই তা হলে শুরু করা যাক।' হারগ্রিভস বলতে থাকেন, 'টনি মারভেল লোক ভালো, সবাই তাঁকে পছন্দ করতো। হয়তো ভালো ব্যবসায়ী তিনি নন, ভালো ব্যবসায়ী হবার পক্ষে তাঁর হৃদয় বড্ডো বেশি উদার—কিন্তু শয়তানের মতো বিচার-বুদ্ধি আর অঙ্কশাস্ত্রে চমৎকার ধীশক্তির সাহায্যে তিনি বাস্তব অসুবিধেগুলোকে জয় করে ফেলেছিলেন।

'টনি ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে প্রথম শ্রেণীর সম্মান সহ স্নাতক উপাধীর ছাত্র এবং ওই বিষয় নিয়েই তাঁর পড়াশুনো চালিয়ে যাবার আন্তরিক আগ্রহ-ছিলো। কিন্তু সেই সময় তাঁর কাকা মারা গেলেন, তাই তাঁকেই ব্যবসাটার ভার নিতে হলো। ব্যবসাটা কিসের, তা আপনি জানেন—বিলাস বহুল তিনটে হোটেল, যা টনির কাকা জিম সাজিয়ে গুছিয়ে প্রচণ্ড জমকালো কেতায় চালাতেন এবং যার সব কটাই তখন গোল্লায় যেতে বসেছে।

'সবাই বলেছিলো, ব্যবসার জগতে টনির পক্ষে নিজের কাঁধ ঠেলে ওঠার চেষ্টা স্রেফ পাগলামো। তাঁর ভাই, মানে পূর্বতন শল্যবিদ স্টিফেন মারভেল এ কথাও বলেছিলো যে, টনি শুধু কাকার তাসের

প্রাসাদগুলোকে সবার ঘাড়ে এনে ফেলবে এবং সবাইকে আরও বেশি করে দেনায় ডুবিয়ে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনাটা কি দাঁড়িয়েছিলো, তা তো আপনি জানেন! পঁচিশ বছর বয়সে উনি ব্যবসাটার দায়িত্ব ঘাড়ে নেন, সাতাশ বছর বয়সে হোটেলগুলোকে লাভজনক পরিস্থিতিতে এনে তোলেন এবং তাঁর যখন তিরিশ বছর বয়েস তখন সেগুলো লাভের অঙ্ককে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে যে তা টনিকে পর্যন্ত অবাক করে দেয়।

'পরিস্থিতিটা এমন হয়ে ওঠার কারণ, টনি কখনও কাজে গা-ঢিলে দেননি। এ বিষয়ে ওঁর মন্তব্যটার কথা চিন্তা করুন: 'এ কাজটা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু এটাকে সন্তোষজনকভাবে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারলে, আমরা এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লেগে থাকতে পারবো'। গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলতে, পড়াশুনো। ব্যবসাটা কাঁধে নেবার একটা কারণ হচ্ছে, বৃদ্ধ জিমকে উনি ব্যবসাটা দেখবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। আর একটা কারণ হচ্ছে, ব্যবসার ব্যাপারটাকে উনি এতোই সাধারণ বলে মনে করতেন (বুঝুন কাণ্ড!) যে তিনি দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন, কাজটা কতো সহজ। কিন্তু আসলে কাজটা ততো সহজ ছিলো না। দূরত্বের ব্যাপারটা কোন মানুষের পক্ষেই সামলানো সহজ নয়। কোথায় লণ্ডন, কোথায় ব্রাইটন, আর কোথায় ইস্টবোর্ন! মারভেল-হোটেলগুলোর সম্পর্কে যা কিছু জানার আছে—বালিশের ওয়াড় থেকে শুরু করে লিফটে ব্যবহারের তেলের দাম—সব কিছুই উনি জানতেন। কিন্তু এর ফলে পঞ্চম বছরের শেষে একদিন সকাল বেলায় উনি নিজের অফিস ঘরের মধ্যে একেবারে ভেঙে পড়লেন।

'ওঁর ভাই স্টিফেন তখন ওঁকে সাফ সাফ জানিয়ে দিলো, 'এখান থেকে এখন তোমাকে কেটে পড়তে হবে। সারাটা দুনিয়ায় যেখানে খুশি যাও, গিয়ে ঘুরে বেড়াও। কিন্তু ছুটির সময়টা কোন মতেই ছয় বা আটমাসের কম হলে চলবে না। আর এই সময়টার মধ্যে তুমি তোমার কাজকর্মের কথা চিন্তাও করতে পারবে না। বুঝেছো'?

'গতকাল রাত্রে টনি নিজেই কাহিনীটা আমাকে বলেছেন। উনি

বললেন যে, দূরে থাকার সময় ওঁকে যদি চিঠিপত্রও লিখতেও বারণ করে দেওয়া না হতো, তাহলে পুরো ঘটনাটা হয়তো আদৌ ঘটতো না।

'স্টিফেন বলে দিয়েছিলো, 'কাউকে একখানা পোস্টকার্ডও লেখা চলবে না। যদি তা করো তাহলে একমাত্র ঈশ্বরই তোমার ভরসা হবেন'।

'কিন্তু জুডিথ···'টনি মৃদু প্রতিবাদ করেছিলেন।

'বিশেষ করে জুডিথকে তো নয়ই',স্টিফেন বলেছিলেন। 'তুমি যদি তোমার সেক্রেটারীটিকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করে থাকো, তো সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু হোটেলগুলোর সম্পর্কে লম্বা লম্বা চিঠি লিখে তুমি তোমার সুস্থ হয়ে ওঠার সময়টাকে নষ্ট করে ফেলো না'।

'মনে মনে চিন্তা দেখুন, স্টিফেনের রাগে বিবর্ণ হয়ে ওঠা অভিজাত মুখখানা টনির মুখের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ওঁর হার্লে স্ট্রীটের অফিস-ঘরে পালিশ করা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্টিফেন, পরনে কালো কোট আর ডোরাকাটা পাতলুন। স্টিফেন মারভেলের মধ্যে (এবং কিছু পরিমাণে টনির মধ্যেও) সেই অতি অভিজাত ভাবভঙ্গি ছিলো যা জিম মারভেল চিরদিনই আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কোনদিনই পারেননি।

'টনি আর আপত্তি করেননি। আসলে উনিও যথেষ্ট ইচ্ছুক ছিলেন, কারণ উনি তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলেন। জুডিথের কাছে চিঠি লেখা বারণ হলেও ওর কথা তিনি সব সময়েই চিন্তা করতে পারবেন। তাই আজ থেকে আট মাসেরও আগে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি, সাউদাম্পটন থেকে 'কুইন অ্যান' জাহাজে চেপে তিনি রওনা হলেন। এবং সেদিন রাত্রি থেকেই ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলো ঘটতে শুরু করলো।'

হারগ্রিভস সামান্য সময়ের জন্যে চুপ করে রইলেন। স্বল্পালোকিত ছোট্ট ঘরখানাতে এখনও গ্যাসের আগুনের হিসহিসে শব্দ। হারগ্রিভসের সঙ্গিনীর মুখ দেখেই বোঝা যায়, এ বাড়িতে একটা

মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেছে—এবং তা মাত্র কিছুদিন আগেই। হারগ্রিভস ফের বলতে লাগলেন :

'মাঝরাতে কুইন অ্যান যাত্রা শুরু করে। টনি দেখলেন, ডক ছাড়িয়ে অনেকটা ওপরের দিকে, আকাশের সমান উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজটা। অসংখ্য আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছে তার ডেকগুলো। ডেকের ওপরে চলাফেরা করা যাত্রীদের মনে হচ্ছিলো যেন এক একটা কালো কালো বিন্দু। ডকে জমায়েত হওয়া মানুষগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আনাগোনা করা বিশাল ক্রেনগুলোর কপিকলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। সমুদ্র যাত্রার শুরুতে এক বিচিত্র, আনন্দদায়ক অথচ অস্থির অনুভূতি অনুভব করলেন তিনি, যা তাঁর স্নায়ুগুলোতে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুললো।

'প্রথমটাতে টনি মারভেল একটা স্কুলের ছেলের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। স্টিফেন মারভেল এবং টনির প্রেমিকা জুডিথ গেটস টনির সঙ্গে সাউদাম্পটন অব্দি এসেছিলো। তাঁর কেবিনটা যে কতো সুন্দর, তা দেখাবার জন্যে টনি রবারের গন্ধ ভরা জাহাজী পথ দিয়ে জুডিথকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন। কেবিনের মধ্যে টনির মালপত্র আর এক ঝুড়ি ফল জড়ো করা ছিলো। কেবিনটা যে সুন্দর, সে বিষয়ে কিন্তু সকলেই একমত হলেন।

'জাহাজ থেকে নেমে যাবার সঙ্কেত ঘণ্টা বাজার কয়েক মিনিট আগে ছাড়া টনি একাকীত্বের প্রথম দংশন অনুভব করতে পারেননি। ঠিক শেষ সময়টিতে বিদায়ের পালা শেষ করাটা কারুরই পছন্দ নয় বলে স্টিফেন আর জুডিথ ইতিমধ্যেই জাহাজ থেকে নেমে গিয়েছিলো। অনেক নিচে, ডকের ওপরে দাঁড়িয়েছিলো ওরা। জাহাজের রেলিঙ ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে টনি মারভেল ওদের শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন মাত্র। জুডিথের মুখখানা ছোট্ট, যেন কতো দূরের, অথচ তাতে মৃদু হাসি মাখানো। ওঁর দিকে হাত নাড়ছে জুডিথ। জুডথকে ঘিরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। দেশ ও জলের মধ্যেকার যে ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে উঠবে, ওই অসংখ্য মুখ টুপি আর নগ্ন আলোর নিচে অর্থহীন কলরব

যেন তাকে সংঘাতময় করে তুলছে। তার পরেই ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন টনি। সমস্ত কলগুঞ্জন ছাপিয়ে কাঁপা কাঁপা শূন্যগর্ভ ঘণ্টাটা চিৎকার করে জানিয়ে দিলো, 'যাঁরা যাত্রী নন, তাঁরা তীরে নেমে পড়ুন'! তারপর তার রেশটুকু মিলিয়ে গেলো জাহাজের আনাচে কানাচে। টনির যেতে ইচ্ছে করছিলো না। এখনও অনেক সময় আছে। এখনও তিনি মালপত্র নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়তে পারেন।

'সাউদাম্পটনের জোলো বাতাস মুখে মেখে খানিকক্ষণ জাহাজের বেষ্টনী ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন টনি। নাঃ, এধরনের মানসিকতা স্রেফ বোকামো ছাড়া কিছু নয়। উনি জাহাজেই থাকবেন। জুডিথ এবং স্টিফেনের দিকে শেষবারের মতো হাত নেড়ে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে সরে এলেন উনি। ঠিক করলেন, নিচে গিয়ে জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখবেন। তারপর শূন্যগর্ভ রাত্রিটার অবাস্তবতা অনুভব করতে করতে 'সি' ডেকে নিজের কেবিনে ফিরে এলেন। কিন্তু অবাক হয়ে টনি দেখলেন, কেবিনে তাঁর মালপত্র কিছুই নেই! পোর্টহোলে পরিচ্ছন্ন পর্দা লাগানো গুমোট কেবিনটার সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিলেন টনি। এখানেই তাঁর একটা ট্রাঙ্ক এবং দুটো সুটকেশ ছিলো—সব কটাতেই জাঁকালো লেবেল সাঁটা। ফলের ঝুড়িটার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো। অথচ কেবিনটা একেবারে ফাঁকা।

'সিঁড়ি ধরে ছুটতে ছুটতে ফের যাত্রী-তত্ত্বাবধায়কের অফিস ঘরে গিয়ে ঢুকলেন টনি। টিকিট-জানলার ধাঁচের টেবিলের পেছনে বসা বিব্রত মানুষটা তখন সবেমাত্র কলস্বর ভিড়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন। হাত-ঘন্টি বাজানো এবং নির্দেশ দেবার মাঝামাঝি সময়টাতে টনির দিকে নজর পড়লো তার।

'আমার মালপত্রগুলো···'

'ঠিক আছে, মিঃ মারভেল,' বিব্রত কর্মচারীটি জানালেন, 'সেগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আপনি নিজে বরং এবারে একটু তাড়াতাড়ি করুন'।

'নিজেকে প্রচণ্ড বোকা বলে মনে হচ্ছিলো টনির। 'নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে'? অবাক হলেন তিনি, 'কিন্তু কেন? কে সেগুলো আপনাকে নামিয়ে দিতে বলেছে'?

'কেন'? নাম আর সংখ্যা লেখা এক টুকরো কাগজ থেকে তত্ত্বাবধায়ক ভদ্রলোক আচমকা চোখ তুলে তাকালেন, 'আপনিই বলেছেন'!

'টনি শুধু তার দিকে তাকিয়েই রইলেন।

'দশ মিনিটও হয়নি আপনি এখানে এসেছিলেন', তির্যক চোখে তাকালেন তত্ত্বাবধায়ক। 'এসে জানালেন, আপনি যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আপনার মালপত্রগুলোও আপনি জাহাজ থেকে নামিয়ে দিতে বললেন। আমি তখন বললাম যে, এই শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করার জন্যে আমরা অবশ্যই টিকিটের দাম ফেরত দিতে পারবো না—'

'ফিরিয়ে আনুন'! নিজের কণ্ঠস্বর টনির নিজের কানেই অদ্ভুত শোনালো। 'আমি কক্ষনো আপনাকে ও কথা বলতে পারি না। ফিরিয়ে আনুন মালপত্রগুলো'।

'যেমন আপনার অভিরুচি, স্যার', ঘন্টি বাজিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বললেন, 'তবে যদি তার সময় থাকে'।

'সমুদ্রের করুণতম ধ্বনি অর্থাৎ জাহাজের তীক্ষ্ণ শিস, তখনই মাথার ওপরে বেজে উঠে সাউদাম্পটনের জলে আঘাত করলো। খোলা দরজাগুলোর মাঝখানে 'বি' ডেকে তখন ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার উন্মাদনা।

'তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে এর আগে কোন কথা বলেছিলেন বলে টনির আদৌ কিছু মনে পড়ছিলো না। এ ঘটনাটা দু চোখের মাঝখানে তীব্র ঘুষির মতো তাঁকে আঘাত করেছিলো এবং মুহূর্তের জন্যে তাঁর ইচ্ছে হয়েছিলো, সিঁড়ি তোলার আগে তিনি একছুটে কুইন অ্যান থেকে নেমে যাবেন। এটাও আবার একটা দুঃস্বপ্ন। তাঁর স্নায়ু বিকলতার এক বিশ্রী বৈশিষ্ট্য ছিলো, আচমকা রাত্রিবেলায় তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হতো—

তিনি আর বাস্তবের মানুষ নেই···তাঁর দেহ এবং আত্মা আলাদা হয়ে গেছে···প্রথমটা একটা গ্রন্থিল যন্ত্রের মতো দৈনন্দিন জীবনের হাঁটাচলা বা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মস্তিষ্কটা রয়ে গেছে অন্য জায়গায়। ঠিক যেন, তিনি মরে গিয়েও দেখতে পাচ্ছেন তাঁর দেহটা নড়াচড়া করছে!

'মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনার জন্যে টনি তখন তাঁর পরিচিত মানুষদের দিকে মনোযোগী হতে চেষ্টা করলেন। যেমন, জুডিথ। জুডিথের হালকা বাদামী রঙের চোখ, মাথা ঘোরালে ওর চিবুকের কোমল রেখা এবং ওর অফিসের পোশাকের কথা মনে পড়লো টনির। জুডিথ তাঁর প্রেমিকা, তাঁর সচিব, তাঁর অনুপস্থিতিতে জুডিথ তাঁর সমস্ত জিনিসের দিকে নজর রাখবে। জুডিথকে তিনি ভালোবাসেন এবং এখনও জুডিথ তাঁর কি ভীষণ কাছাকাছি রয়েছে।···কিন্তু না, জুডিথের কথা তিনি চিন্তা করবেন না। তার বদলে ভাই স্টিফেন, জনি ক্লিভার এবং অন্য যে বন্ধুর কথা মনে পড়লো—তার কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি। এমন কি মৃত জিম মারভেলের কথাও মনে পড়লো টনির। মানসচিত্র ফুটিয়ে তোলায় তাঁর চিন্তাশক্তি এতো প্রখর যে সেই মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়কের অফিসঘরের মুখোমুখি মৃদুমন্দ বাতাসে ভরা লাউঞ্জে বসে তাঁর মনে হলো—টবে রাখা পাম গাছটা যে কোণটাতে রয়েছে, সেখানে থেকে বৃদ্ধ জিম তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

'বুঝতেই পারছেন, টনি যখন তাঁর মাথার ওপরে মুখর হয়ে ওঠা জাহাজের তীক্ষ্ণ শিস শুনছিলেন, তখন সেই সংক্ষিপ্ত মুহূর্তটিতেই তাঁর মনের মধ্যে এতো সব ভাবনা বয়ে গেলো।

'তত্ত্বাবধায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচে নেমে এলেন টনি। ডেক থেকে ওপরে ওঠা এবং নিচে নেমে আসা যাত্রীদের কলগুঞ্জনের জন্যে তিনি কৃতজ্ঞতা অনুভব করছিলেন। কেউই তাঁর দিকে এতটুকু মনোযোগ দেয়নি—কিন্তু তাঁরা অন্তত সেখানে রয়েছেন, এটুকুই যথেষ্ট।

'কেবিনের দরজা খুলে দোরগড়াতেই নিস্পন্দ হয়ে থমকে দাঁড়ালেন টনি।

'জাহাজের চালক-পাখা তখন ঘুরতে শুরু করেছে। হঠাৎ একটা নিদারুণ ঝাঁকুনি সমস্ত জাহাজটাকে কাঁপিয়ে তুললো। কুইন অ্যানের যাত্রা শুরু হয়েছে। যেন ঝাঁকুনি সামলাতেই কেবিনের দরজাটা আঁকড়ে ধরলেন টনি, তারপর কেবিনের ভেতরে বিছানাটার দিকে তাকালেন। বিছানার সাদা চাদরে একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তল পড়ে রয়েছে—যেটা আগে সেখানে ছিলো না।'

গ্যাসের আগুনে হিটারের অ্যাজবেস্টাজের পাতগুলো তেতে লাল হয়ে উঠেছিলো। সেণ্ট জনস উডের বাড়িতে ছোট্ট ঘরখানায় ফের স্তব্ধতা নেমে এসেছে। হারগ্রিভস—অর্থাৎ পুলিস বিভাগের অপরাধ তদন্ত শাখার সহযোগী কমিশনার স্যার চার্লস হারগ্রিভস—নিচের দিকে ঝুঁকে হিটারের শিখাটা নামিয়ে দিলেন। গ্যাসের প্রবল হিস-হিসে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর কণ্ঠস্বরটাও যেন পালটে গেছে বলে মনে হলো।

'দাঁড়ান!' হাত তুলে হারগ্রিভস বললেন, 'আপনার মনে কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়, আমি তা চাই না। মনে করবেন না আতঙ্কটা—যা ঘটতে যাচ্ছে তার স্তিমিত পূর্বাভাষ—বিশ্ব পরিভ্রমণের সমস্ত সময়টাতেই টনিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তা নয় এবং সেটাই সমস্ত ঘটনাটার মধ্যে সব চাইতে বিচিত্র অংশ।

'টনি নিজে আমাকে বলেছেন, ওটা ছিলো নিতান্তই সংক্ষিপ্ত একটা শিহরণ, কুইন অ্যান যাত্রা শুরু করার আগে ও পরে সব মিলিয়ে তার মেয়াদ ছিলো সবশুদ্ধ পনেরো মিনিট। কোন কিছুই বাস্তব নয়—এটা সে ধরনের কোন অলৌকিক অনুভূতি নয়। টনির মনে হয়েছিলো, এটা হিংস্রতা ঘৃণা বিপদ অথবা আর যা-ই বলুন না কেন, তার নিশ্চিত উপস্থিতি—যা চারদিক থেকে তাঁকে চেপে ধরছে। ব্যাটারি থেকে ওঠা দুর্বল বিদ্যুৎশক্তির স্পর্শের মতো জিনিসটা অনুভব করেছিলেন তিনি। কিন্তু জাহাজটা খোলা সমুদ্রের দিকে মিনিট

পাঁচেক এগিয়ে চলার পর ও ধরনের সমস্ত ধারণাই তাঁর মন থেকে চলে গেলো, ঠিক যেন একটা বিশ্রী কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন টনি।…ব্যাপারটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। কারণ দুষ্ট আত্মা আছে বলে ধরে নিলেও—তারা দেশের একটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, আধ মাইল দূরে গেলেই তাদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়, তারা জল পেরুতে পারে না—এ সব কথা চিন্তা করা শক্ত। কিন্তু একটা সময় টনি সত্যি সত্যিই স্বয়ংচল পিস্তলটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ইঞ্জিনের গর্জন তার কানে এসে আঘাত করছিলো, ভয়ঙ্কর একটা প্রবৃত্তি তাঁর হাতটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে পিস্তলের নলটাকে মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়েছিলো এবং…

'তারপরেই কে যেন টনির ভেতর থেকে বলে উঠলো, 'থামো'! সোজা হয়ে দাঁড়ালেন টনি। সত্য জ্বর থেকে ওঠা মানুষের মতো নিজেকে মনে হচ্ছিলো তাঁর। সমস্ত শরীরে ঘাম আর কাঁপুনি। কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে ফের তিনি বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিলেন টনি, তারপর পোর্টহোলের কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিলেন। টনি বলেছেন, তখন থেকেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করেন। পিস্তলটা কি করে তাঁর কেবিনে গেলো, তা তিনি জানতেন না। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, চকিত অন্ধকারময় কোন মুহূর্তে তিনি নিজেই ওটা নিয়ে এসেছিলেন। এখন নতুন চোখে ওটার দিকে তাকিয়ে জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্পর্কে এক নতুন অনুভূতি অনুভব করলেন তিনি। তাঁর মনে হলো, তিনি যেন মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়েছেন।

'আপনি হয়তো ভেবেছেন যে পাছে পিস্তলটাকে ছুঁতে হয়, সেই ভয়ে টনি ওটাকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি তা করেননি। তাঁর কাছে ওটা তখন ধাঁধার একটা অংশ। অনেকক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে রইলেন টনি—বেলজিয়ামে তৈরি গুলি ভরা একটা ব্রাউনিং '৩৮। প্রথম কয়েকটা দিন পরে, যখন ওটা তিনি দৃষ্টির আড়ালে—ট্রাঙ্কের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রেখে দিয়েছিলেন, তখনও

ওটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছেন। পিস্তলটা তাঁর দুঃস্বপ্নের এক টুকরো বাস্তব প্রমাণ, যা তিনি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন।

'নিউইয়র্কের শুল্ক বিভাগীয় ছাউনিতে পিস্তলটা কোন বিস্ময়ের উত্তেজনা জাগালো বলে মনে হলো না। ওটা সঙ্গে নিয়েই টনি ঘুরে বেড়ালেন ক্লিভল্যাণ্ড, শিকাগো আর সল্ট-লেক সিটিতে···গেলেন সানফ্রান্সিসকোয়···তারপর ঝলমলে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হনলুলুতে। ইয়াকোহামার শুল্ক বিভাগ পিস্তলটা ওঁর কাছ থেকে নিয়েই নিচ্ছিলো, মোটা ঘুষ কবুল করে সে যাত্রা রেহাই পাওয়া গেলো। তারপর থেকে তিনি ওটা ট্রাঙ্কে না রেখে নিজের কাছেই রাখতেন এবং কোন সময়েই তাঁকে খানাতল্লাশী করা হয়নি। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই পিস্তলটা ভারত মহাসাগরের দুর্দান্ত গরম, লোহিত সাগরের আবছা অন্ধকার আর ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি পেরিয়ে এলো। প্রথম শীতের দিনগুলোতে ঘুরে বেড়ালো পোর্ট সৈয়দ আর কায়রোতে। তারপর নেপলস, মার্সেই আর জিব্রাল্টারে। যাত্রা শুরু করার আট মাসের কিছু পরে টনি মারভেল—আবার সুস্থ সতেজ হয়ে ওঠা মানুষটা—যখন এস. এস. চিপেনহ্যাম ক্যাসেল থেকে সাউদাম্পটনে এসে নামলেন, তখন সেই বিশ্রী শীতের রাতে পিস্তলটা তাঁর পেছনের পকেটে গোঁজা ছিলো।

'সেদিন রাতে তুষারপাত হয়েছিলো, মনে আছে আপনার? যাই হোক, জাহাজ থেকে নামার পর বোট-ট্রেনটা গাঢ় কুয়াশার ভেতর দিয়ে গর্জন তুলে এগুতে লাগলো। ট্রেনে অসংখ্য মানুষের ভিড়, কিন্তু সকলের দেহের গরমেও কোন কাজ হচ্ছিলো না।

'টনি জানতেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে কেউই সাউদাম্পটনে থাকবে না। তাঁর ভ্রমণ-তালিকা আগে থেকেই ঠিক করা ছিলো এবং একখানা পোস্টকার্ডও লেখা বারণ বলে তাঁকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, তাও তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। কিন্তু ক্রিসমাসে যাতে সময় মতো বাড়িতে পৌঁছনো যায়, সেজন্যে তাঁকে ভ্রমণ-তালিকা বদল করে জাহাজে চাপতে হয়েছিলো। এক সপ্তাহ আগে বাড়িতে ফিরে সবাইকে তিনি একেবারে অবাক করে দেবেন।

আটটা মাস তিনি অর্থহীন শূন্যতার মধ্যে কাটিয়েছেন। এবারে আর দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই তিনি বাড়িতে পৌঁছে যাবেন, আবার দেখতে পাবেন তাঁর জুডিথকে।

'ট্রেনের স্বল্পালোকিত কামরাতে টনির সহযাত্রীরা কেউই বড়ো একটা কথাবার্তা বলছিলেন না। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা তাঁদের আলাপ-আলোচনাকে নিঙড়ে শুকনো করে ফেলেছিলো, পরস্পরকে তাঁরা প্রায় ঘৃণা করতে শুরু করেছিলেন তখন। এমন কি তুষারপাতও তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় এক এক টুকরো স্ফুলিঙ্গ জাগিয়ে তুলছিলো মাত্র।

'সত্যি, এ একেবারে সনাতনী কেতার ক্রিসমাস'! বললেন একজন।

'তা যা বলেছেন'! কুয়াশায় অস্পষ্ট হয়ে ওঠা জানলার শার্শিতে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে আর একজন তাঁকে সমর্থন জানালেন।

'একেবারে যাচ্ছেতাই রকমের ঠাণ্ডা', তৃতীয় ব্যক্তি গজগজ করতে থাকেন। 'আচ্ছা, এঁরা কি কোনদিনই ট্রেনগুলোকে গরম রাখার ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে না? আমি সত্যি সত্যি এবারে অভিযোগ জানাবো'!

'তারপর সহানুভূতিসূচক দু'চারটে কথাবার্তা বলে যাত্রীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পত্রিকার আড়ালে আশ্রয় নিলেন। পত্রিকাগুলো যেন সাদা একটা শূন্য দেয়াল, তার আড়ালে ওঁরা আকণ্ঠ দেশের সংবাদ পাঠ করছিলেন।

'তার মানে, অন্য ভাষায় বলতে গেলে, (টনিও তখন এমনি ভেবেছিলেন) টনি আবার ইংলণ্ডে ফিরে এসেছেন। ফিরে এসেছেন নিজের দেশে। নিজের পত্রিকাটা তিনি পড়ার ভান করছিলেন মাত্র। আসলে তিনি তখন হেলান দিয়ে বসে চাকার ঝিকঝিক আওয়াজ আর ট্রেনের গতি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে এলোমেলো হয়ে হারিয়ে যাওয়া তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ শুনছিলেন।

'ট্রেন থেকে নেমে কি করবেন তা টনি সঠিক ভাবেই জানতেন। বড়োজোর দশটার সময় তাঁরা ওয়াটারলুতে গিয়ে পৌঁছবেন। পৌঁছেই

তিনি এক লাফে একটা ট্যাক্সিতে উঠে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ছুটবেন। বাড়ি থেকে স্নান সেরে, মাথা আঁচড়ে যতো শীগগিরি সম্ভব গিয়ে হাজির হবেন হ্যাম্পস্টেডে, জুডিথের ফ্ল্যাটে। অথচ এ চিন্তাটা টনিকে আনন্দে উচ্ছল করে তোলার বদলে, তাঁর হৃৎপিণ্ডের চারধারে একটা বিচিত্র শীতল অনুভূতি জাগিয়ে তুললো। নিজের মনেই হাসলেন টনি। মনটা অন্যত্র সরিয়ে নেবার চেষ্টায় দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ফের পত্রিকাটা খুলে ধরলেন, এক এক করে পৃষ্ঠা উল্টে প্রতিটা কলমে চোখ বোলাতে লাগলেন আগ্রহহীন নিখাদ উৎসাহে। হঠাৎ পরিচিত একটা বিষয়ে টনির চোখে পড়ে গেলো···পরিচিত একটা নাম। মাঝের পৃষ্ঠায় নেহাতই একটা বৈশিষ্ট্যহীন খবর।

'খবরের কাগজে টনি তখন নিজের মৃত্যু সংবাদ পড়ছিলেন। খবরটা ঠিক এই রকম :

"মারভেল হোটেলস লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী, আপার এভিন্যু রোডের সেণ্ট জনস উড নিবাসী মিঃ অ্যাণ্টনি ডিন মারভেলকে তাঁর নিজস্ব বাসভবনের শয়নকক্ষে গতকাল রাত্রে গুলিবিদ্ধ ও মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। একটা বুলেট তার মুখের তালু ভেদ করে মস্তিষ্কে ঢুকে গিয়েছিলো। ছোট একটা স্বয়ংচল পিস্তল তাঁর হাতেই পাওয়া যায়। মিঃ মারভেলের গৃহ-পরিচারিকা মিসেস রিচই তাঁর দেহটা আবিষ্কার করেন, যিনি······"

'আত্মহত্যা!

'জাহাজে থাকতে অনুভূতিটা যেমন আচমকা টনিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, ঠিক তেমনি আবার আচম্বিতে টনির ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বাস্তব জগৎ থেকে সেই অলীক পৃথিবীতে নিয়ে গেলো। ট্রেনের কামরাটাতে, আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আলো ছিলো ভীষণ মিটমিটে। কাজেই এটা হয়তো খুবই স্বাভাবিক যে তিনি মুখোমুখি উঁচু করে তুলে ধরা খবরের কাগজগুলোর একটা শূন্য দেয়ালই শুধু অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন···যেন তাঁর সহযাত্রীরা কেউ কামরাটাতে নেই···যেন তারা সবাই তাঁকে ফেলে চলে গেছে, শুধু

রেখে গেছে কাগজের পর্দাটা—যা ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে সামান্য।

'হ্যাঁ তিনি তখন সম্পূর্ণ একা।

'অন্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন টনি, তারপর করিডোরে যাবার জন্যে এক টানে কামরার দরজাটা খুলে ফেললেন। বন্ধ জায়গাটাতে তাঁর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিলো। কামরার আলোর দিকে কাগজটা উঁচু করে তুলে ধরে, ফের তিনি পড়ে ফেললেন সংবাদটা।

'নাঃ, ভুল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। বর্ণনাটা যথেষ্ট বিশদ, সবই তাঁর অতীত আর বর্তমানের কথা···

"···তাঁর সহোদর, হার্লো স্ট্রীটের বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসক মিঃ স্টিফেন মারভেলকে দ্রুত সংবাদ জানানো হয়।···তাঁর প্রেমিকা, মিস জুডিথ গেটস···জানা গেছে যে গত সেপটেম্বর মাসে মিঃ মারভেল স্নায়ু-বিকলন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তখন থেকে দীর্ঘ বিশ্রামও তাঁকে রোগমুক্ত করে তুলতে পারেনি।···"

'ভয়ে ভয়ে পত্রিকার তারিখটার দিকে তাকালেন টনি। কিন্তু পত্রিকায় সেদিনেরই তারিখ, তেইশে ডিসেম্বর। তার অর্থ, আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে তিনি গুলি খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

'এবং পিস্তলটা এখন তাঁরই পাতলুনে, পেছনের পকেটে রয়েছে।

'খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখলেন টনি। চাকার ঝাঁকুনিতে তাঁর পায়ের নিচে ট্রেনের নাচুনি। তারপরেই একটা মৃদু শিস বাজালো ট্রেনটা। শব্দটা কুইন অ্যানের শিসের কথা মনে করিয়ে দিলো টনিকে। ছায়া ছায়া করিডোরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি। সমস্ত করিডোরটা নির্জন, শুধু একটি মাত্র মানুষ জানলার বেষ্টনীতে কনুই রেখে বাইরে উড়ে চলা তুষারকণাগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। লোকটাকে আর একজন যাত্রী বলেই ধরে নিলেন টনি।··· ট্রেনটা ওয়াটারলুতে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত তাঁর কিছু মনে হয়নি। কিন্তু করিডোরে দেখা সেই যাত্রীটির সঙ্গে তাঁর মনের একটা অস্পষ্ট ছাপ, অবচেতন মনের কোন স্মৃতি, কেমন করে যেন মিলে-মিশে

এক হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমে মনে হয়েছিলো, মানুষটার কাঁধের আকৃতিই এর কারণ। তারপর টনি বুঝতে পারলেন, লোকটা প্রাচীন আমলের বাদামী রঙা ফারের কলার লাগানো লম্বা কোটটা পরে রয়েছে বলে, তাঁর অমন মনে হচ্ছে। কিন্তু ওয়াটারলুতে লোকটাকে পাগলের মতো ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে নামতে দেখেই তাঁর মনে পড়লো, বৃদ্ধ জিম মারভেল সর্বদা ওই ধরনের কলার পরতেন। যাই হোক, মালপত্রের রসিদ হাতে নিয়ে টনি যখন জোর কদমে গার্ডের কামরায় গিয়ে তাঁর ট্র্যাঙ্ক এবং স্যুটকেস দুটো চাইলেন, তখন তাঁর চারদিকে এতো ভিড় যে তিনি নিজের হাত দুটোও নাড়তে পারছিলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হচ্ছিলো, বাদামী ফারটা যেন তার কাঁধে চাপ দিচ্ছে।

'একটা কুলি টনিকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলো। চালককে ঠিকানা জানিয়ে, কুলিকে বখশিশ দিয়ে, ট্যাক্সিতে চেপে বসলেন তিনি। তা সত্ত্বেও—যতোক্ষণ প্রয়োজন, কুলিটা যেন তার চাইতেও অনেকটা বেশি সময় ট্যাক্সির দরজাটা খুলে রাখলো।

'দরজাটা বন্ধ করে দাও'। টনি নিজেকে চড়া গলায় বলতে শুনলেন, 'জলদি করো'।

'হ্যাঁ স্যার', এক লাফে পেছিয়ে গেলো কুলিটা। দরজাটা, বন্ধ হয়ে গেলো সশব্দে। কুলিটা কিন্তু তারপরেও ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে, দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। ধাবমান ট্যাক্সির পেছন দিককার ছোট্ট জানলাটা দিয়ে টনি দেখলেন, লোকটা তখনও ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে।

'ট্যাক্সির ভেতরটা অন্ধকার, আর জায়গাটা এতো ছোট যে টনির মনে হচ্ছিলো,যেন চিত্রগ্রাহীদের কালো চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন সামান্যই। তবু সাবধানে হাতড়ে হাতড়ে আসনের খালি অংশটার সর্বত্র একবার ভালো ভাবে পরীক্ষা করে নিলেন, কিন্তু কিছুই পেলেন না।'

কাহিনীর এই পর্যায়ে এসে দু-এক মিনিট নিশ্চুপ হয়ে রইলেন

হারগ্রিভস। অসুবিধের সঙ্গেই এতোক্ষণ কথা বলছিলেন তিনি। তাঁর কথাগুলো যে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক সে আশঙ্কায় নয়—সঠিক শব্দগুলোই যেন খুঁজে পাওয়া শক্ত বলে মনে হচ্ছিলো তাঁর। হাঁটুর ওপরে দস্তানায় মোড়া তাঁর আঙুলগুলো খুলছিলো আর মুঠিবদ্ধ হয়ে উঠছিলো বারবার।

এই প্রথম বার হারগ্রিভসের সঙ্গিনী—মিস জুডিথ গেটস—তাঁকে বাধা দিলো। অগ্নিকুণ্ডটার ওধারে, ছায়ার ভেতর থেকে জুডিথ বললো, 'একটু শুনুন। প্লিজ!'

'হ্যাঁ, বলুন?'

'টনিকে যিনি অনুসরণ করছিলেন…' জুডিথ কোনক্রমে বললো, 'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে এ-কথা বলছেন না যে তিনি…তিনি…'

'তিনি, কি?'

'মৃত—'

'আমি জানি না, তিনি কে।' অপলক চোখে জুডিথের দিকে তাকিয়ে হারগ্রিভস জবাব দিলেন, 'শুধু এটুকু জানি যে তার কোটে ফারের কলার ছিলো।… আমি আপনাকে টনির কাহিনীটাই বলছি, যেটা আমি নিজে বিশ্বাস করি।'

'একই কথা,' হাতের পাতায় নিজের চোখদুটোকে আড়াল করে নিলো জুডিথ। 'আপনি যাঁর কথা ভাবছেন, উনি সেই ব্যক্তি হলেও কিছু এসে যায় না। জীবিত বা মৃত, কোন অবস্থাতেই তিনি টনির চারদিকে কোন দুষ্ট প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবেন না।…জিম মারভেল টনিকে সত্যিই ভালোবাসতেন। নিজের বিষয়-সম্পত্তির প্রত্যিটি পাই-পয়সা তিনি টনিকেই দিয়ে গেছেন, স্টিফেনকে একটি কানাকড়িও দেননি। চিরদিনই তিনি টনিকে বলেছেন, তিনি টনির দেখাশুনো করবেন।'

'এবং করেছেনও ঠিক তাই,' হারগ্রিভস বললেন।

'কিন্তু—'

'শুনুন,' হারগ্রিভস ধীরে ধীরে বললেন, 'দুষ্ট প্রভাবটার উৎস কিন্তু

আপনি এখনই বুঝতে পারেননি। টনি নিজেও তা পারেননি। তিনি শুধু এটুকু জানতেন যে একটা ট্যাক্সির অন্ধকার জঠরে বসে তুষারে ভেজা পেছল রাস্তা ধরে তিনি ছুটে চলেছেন। এবং ভালো বা মন্দ— যা-ই তাঁকে অনুসরণ করুক না কেন, তিনি সেটা সহ্য করতে পারছিলেন না।···তবু ট্যাক্সি চালক যদি সতর্ক থাকতো, তা হলে সব কিছুই হয়তো ভালোভাবে শেষ হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সির চালক সতর্ক বা সাবধানী ছিলো না। সেটা ছিলো বছরের প্রথম তুষারপাত এবং চালক হিসেব কষতে ভুল করে ফেলেছিলো। গাড়িটা যখন আপার এভিনু রোড থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে, তখন সে প্রচণ্ড গতিতে বাঁক নেবার চেষ্টা করলো। সঙ্গে সঙ্গে চাকা হড়কে যাবার অসহায় দোলানি অনুভব করলেন টনি···দেখতে পেলেন কাচের বিভাজকটা কাত হয়ে পড়েছে, কালো রঙের একটা গাছের গুঁড়ি তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। গুঁড়িটা বড়ো হতে হতে অবশেষে বাতাস আঁটকানোর কাচে সজোরে ধাক্কা মারলো, অনড় চাকা নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো গাড়িটা।

'বাঁক না নিয়ে আমার আর কোন উপায় ছিলো না', চালক চিৎকার করে জানালো। 'ফারের কলার পরা এক বুড়ো ভদ্রলোক একেবারে হঠাৎ সামনে···'

'অতএব বুঝতেই পারছেন, টনিকে একা একা পায়ে হেঁটে বাড়িতে ফিরতে হয়েছিলো। পাঁচ-সাত পা হাঁটার আগেই তিনি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, কিছু একটা তাঁকে অনুসরণ করছে। দুশো গজের দূরত্ব, শুনলে খুব একটা বেশি দূর বলে মনে হয় না। প্রথম ডান দিকের বাঁক, তারপরে প্রথম বাঁ দিক, তারপরেই বাড়ি। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে যেমন মনে হয়,এ ক্ষেত্রেও তেমনি রাস্তাটা যেন সীমাহীন বলে মনে হচ্ছিলো। ট্যাক্সিচালককে টনি ছেড়ে আসতে চাইছিলেন না। আর ট্যাক্সিচালক মনে করেছিলো, উনি তার সততায় সন্দেহ করছেন, ভাবছেন গাড়ির চাকা সারানো হলে সে মালপত্রগুলো পৌঁছে দেবে না। আসল কারণটা কিন্তু তা নয়।

'রাস্তার প্রথম অংশটা টনি জোর কদমেই চললেন, অনুসরণরত মানুষটাও তার পেছনে সেই একই তালে হেঁটে চললো। রাস্তার আলোয় টনি লোকটার কোটের ভিজে ফারের কলারটাই শুধু দেখতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু তা ছাড়া আর কিছু নয়। টনি তখন হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন, যাকে প্রায় দৌড়ানোই বলা চলে। যদিও অনুসরণরত মানুষটার চলনভঙ্গিতে কোন প্রভেদই বোঝা যাচ্ছিলো না, কিন্তু তখনও সে টনির ঠিক পেছনটিতেই ছিলো। লোকটা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে টনি একটুও মাথা ঘামাননি। কারণ যা মৃতও হতে পারে, তার সঙ্গে মোলাকাতের সময় মানুষ ওসব তুচ্ছ প্রভেদের কথা চিন্তা করে না। একমাত্র যে কথাটা তাঁর মনে হয়েছিলো তা হচ্ছে, 'ও'কে' কিছুতেই পরিচিত হতে দেওয়া চলবে না—কারণ তাহলেই সর্বনাশ।

'পেছনের মানুষটার সঙ্গে টনির দূরত্ব কমে আসছিলো, টনি ছুটতে শুরু করলেন। পায়ের নিচে তুষারে প্যাচপেচে হয়ে ওঠা নোংরা কালো রাস্তা। একটু ছুটেই রাস্তার পরিচিত বাঁকটা দেখতে পেলেন তিনি। কাছেই নিচু পাথুরে দেয়ালের ওধারে তাঁর বাড়ির সামনের দিককার বাগান। টনি দেখলেন, কালোর ওপরে সাদা অক্ষরে লেখা পথ-সঙ্কেতটা এক কোণে লটকানো রয়েছে। তারপরেই সহসা এক অন্ধ আতঙ্কে বিদ্ধ হয়ে তিনি তীব্র গতিতে বাড়ির সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

'সমস্ত বাড়িটা তখন অন্ধকার। পকেট থেকে বরফের মতো ঠাণ্ডা চাবিগুলো বের করলেন টনি, কিন্তু স্নানের জলে ঠিকরে পড়া সাবানের মতো চাবির গোছাটা তাঁর হাত পিছলে মেঝের ওপরে পড়ে গেলো। অন্ধকারের মধ্যেই হাতড়ে হাতড়ে চাবি খুঁজতে লাগলেন টনি, আর সেই মুহূর্তেই কে যেন সদর দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকলো। বাস্তবিক, দরজার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজটা টনি সত্যিই শুনতে পেয়েছিলেন। যাই হোক, অবশেষে চাবিগুলো তিনি খুঁজে পেলেন এবং আলৌকিক ভাবে তালাটারও সন্ধান পেয়ে, অন্দর-মহলের দরজাটা খুলে ফেললেন।

'কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছিলেন টনি। কারণ পেছনের

মানুষটা ততোক্ষণে সামনের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। টনি বলেছেন, অতো কাছ থেকে রাস্তার আলোয় লোকটার ফারের কলার তাঁর আরও বেশি ভিজে এবং পোকায় কাটা বলে মনে হয়েছিলো—শুধু এটুকু বর্ণনাই উনি দিতে পেরেছেন। যাই হোক, তিনি তখন দরজা খোলা অন্ধকার হলঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, পরিচিত জিনিসগুলোকে পর্যন্ত চিনতে পারছেন না, মনে করতে পারছেন না আলোর সুইচটা কোথায়।

'অন্য মানুষটা তখন ভেতরে এসে ঢুকেছে।

'টনির মনে পড়লো, তাঁর পেছনের পকেটে এখনও সেই অস্ত্রটা রয়েছে যেটা তিনি তামাম দুনিয়ায় বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করার জন্যে ওভার কোটের নিচে হাতড়াতে লাগলেন তিনি। কিন্তু এই দুর্বল প্রচেষ্টাটুকুও কোন কাজের হলো না, পিস্তলটা তাঁর হাত ফসকে গালচের ওপরে ছিটকে পড়লো। আগন্তুক ততোক্ষণে তাঁর ছ ফুট দূরত্বের মধ্যে এসে পড়েছিলো বলে টনি আর অনড় হয়ে রইলেন না—দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলেন।

'সিঁড়ির মাথায় পৌছে ঝুঁকি সত্ত্বেও এক ঝলক নিচের দিকে তাকালেন টনি। আগন্তুকও তখন থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে আসা হালকা নীলাভ আলোয় টনি দেখলেন, গালচে থেকে পিস্তলটা কুড়িয়ে নেবার জন্যে সে নিচের দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

'বোতাম টিপে ওপরের হলঘরের আলো জ্বালতে শুরু করলেন টনি। চিৎকার করে কিছু একটা বললেন। তারপর নিজের শোবার ঘরের দরজা খুলে আরও আলো জ্বালতে শুরু করলেন। দুটো আলো জ্বালার পর বিছানার দিকে চোখ পড়লো তাঁর—সেখানে কেউ একজন তখন শুয়েছিলো।

'বিছানায় শুয়ে থাকা মানুষটা কিন্তু আলো এবং গোলমাল সত্ত্বেও উঠে বসেনি। একটা চাদরে তার আপাদমস্তক ঢাকা। আবরণের

আড়াল থেকেও বোঝা যায়, লোকটার চেহারা নিতান্তই জীর্ণ-শীর্ণ। টনি মারভেল তখন যা করলেন, তা সম্ভবত তাঁর জীবনের সব চাইতে দুঃসাহসী কাজ। এগিয়ে গিয়ে তিনি চাদরের ওপরের দিকটা টেনে সরিয়ে দিলেন এবং চোখ নামিয়ে নিজের মুখের দিকেই তাকালেন। টনি দেখলেন, একটা মৃত মুখ শূন্য দৃষ্টিতে বিছানা থেকে ওপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'আঘাত? হ্যাঁ। কিন্তু আরও বেশি আতঙ্ক? না। কারণ ওই মৃত মানুষটা নিঃসন্দেহে বাস্তব—তাঁর নিজের মতো ও-ও একটা রক্ত-মাংসের মানুষ। লোকটাকে দেখতে অবিকল টনির মতো। কিন্তু এখন এটা আর বাস্তব পৃথিবী এবং অলীক জগতের প্রশ্ন নয় বা পাগল হয়ে যাবার মতো প্রশ্নও নয়। মানুষটা বাস্তব। এবং তার অর্থ—প্রতারণা, জুয়াচুরি।

'ঘরের বাইরে থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'তুমি তাহলে বেঁচে আছো!' ঘুরে দাঁড়িয়ে টনি দেখলেন, তাঁর ভাই স্টিফেন দোর-গোড়া থেকে তাঁর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। স্টিফেনের পরনে তাড়া-হুড়ো করে জড়িয়ে আসা একটা লাল রঙের বহির্বাস, চুলগুলো এলোমেলো, মুখে ভেঙে পড়া মানুষের ছাপ।

'স্টিফেন চিৎকার করে বলছিলো,'আমি এ কাজ করতে চাইনি'।··· ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও টনি অনুভব করলেন, কথাগুলো কোন অপরাধের স্বীকারোক্তি। এ ধরনের অস্ফুট উক্তিতে বক্তার প্রতি করুণার উদ্রেক হয়।

'জাহাজে আমি সত্যি সত্যি তোমাকে খুন করতে চাইনি,' স্টিফেন বললো। 'তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমি তোমাকে আঘাত করতে পারতাম না, তাই না? শোনো—'

'স্টিফেন (আপনাকে আমি আগেই বলেছি) তখন বহির্বাসটা গায়ে জড়িয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। কি কারণে সে দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে পেছনের হলঘরের দিকে তাকালা, টনি তা জানেন না। হয়তো পেছন দিকে সে কোন শব্দ শুনতে পেয়েছিলো৷ কিংবা হয়তো চোখের

কোণ দিয়ে কিছু একটা দেখতে পেয়েছিলো। কিন্তু ঘুরে তাকিয়েই সে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে শুরু করলো।

'টনি আর কিছু দেখতে পাননি, কারণ হলঘরের আলোটা তখনই নিভে গিয়েছিলো। আতঙ্কটা ফের এসে হাজির হয়েছিলো তাঁর পেছনে। তিনি নড়াচড়া করতে পারছিলেন না, কারণ তিনি একটা হাত দেখতে পেয়েছিলেন। ঠিক হাত নয়, বলতে গেলে হাতের একটা ঝট-কানি। বাইরের অন্ধকার থেকে হাতটা তীর বেগে এগিয়ে এসে শোবার ঘরের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দেয়। তারপর বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে টনিকে। হাতটা স্টিফেনকে কিন্তু বাইরের অন্ধকার হলঘরেই রেখেছিলো, স্টিফেন আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছিলো তখনও।

'টনিকে যে ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো, সেটা অবিশ্যি ভালোই হয়েছিলো। পরে সেটা পুলিসী ঝামেলা থেকে রক্ষা করেছিলো টানকে।

'অবশিষ্ট প্রামাণিক এজাহার পাওয়া গেছে বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা মিসেস রিচের কাছ থেকে। দোতলার হলঘরের শেষ প্রান্তে, স্টিফেনের শোবার ঘরের পাশেই ওঁর ঘর। চিৎকারের শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যায়।···

'মিসেস রিচের মনে হলো, চাপা গোঙানি আর ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দটা ওঁর ঘরের দরজা পেরিয়ে স্টিফেনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। বিছানা থেকে নেমে গায়ে সবেমাত্র বহির্বাসটা জড়িয়ে নিতেই উনি স্টিফেনের ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেলেন এবং বাইরের হলঘরে বেরিয়ে আসতেই আটচল্লিশ ঘণ্টায় মধ্যে দ্বিতীয় বার শুনতে পেলেন পিস্তলের গুলির আওয়াজ।

'করোনারের আদালতে মিসেস রিচ এই বলে নিজের বিবৃতি পেশ করবেন যে, গুলিটা ছোঁড়ার পরে কেউই স্টিফেনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেনি বা বেরুতে পারতোও না। কারণ যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করে দরজাটা খোলার আগে পর্যন্ত উনি এক দৃষ্টিতে ওই দরজাটার দিকেই

তাকিয়ে ছিলেন। দরজাটা যখন খুললেন, তখন সব শব্দ থেমে গেছে।...খুব কাছে থেকে কপালের ডানদিকে স্টিফেনকে গুলি করা হয়েছিলো। গুলিটা সম্ভবত সে নিজেই ছুঁড়েছিলো, কারণ রক্তের ছোপ লাগানো বিছানার চাদরের একটা ভাঁজ থেকেই আবিষ্কার করা হয়েছিলো অস্ত্রটা। ঘরের মধ্যে অন্য একটি প্রাণীও ছিলো না, সব কটা জানলাও ছিলো ভেতর থেকে বন্ধ। আর একটি মাত্র বিশ্রী জিনিস যা মিসেস রিচ খেয়াল করেছিলেন তা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে নরম কাপড় এবং ভেজা ফারের একটা তীব্র অরুচিকর গন্ধ।'

হারগ্রিভস আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছিলো, তিনি কাহিনীটার সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছেন। বহিরাগত কেউ থাকলে হয়তো এ কথাও মনে করতে পারতো যে হারগ্রিভস এই আতঙ্কগুলো-কে অতিরিক্ত জোরালো ভাবে বর্ণনা করেছেন—কারণ তাঁর উলটো দিকে বসে থাকা মেয়েটি ছু'হাতে নিজের চোখ ছুটো চেপে রেখেছিলো। কিন্তু নিজের কাজ সম্পর্কে হারগ্রিভস সম্পূর্ণই অবগত ছিলেন।

'তা হলে?' হারগ্রিভস শান্ত গলায় বললেন, 'তা হলে ঘটনাটার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, তাই নয় কি?'

চোখ থেকে নিজের হাত ছুটো সরিয়ে নিলো জুডিথ, 'ব্যাখ্যা?'

'হ্যাঁ, স্বাভাবিক ব্যাখ্যা,' পুনরাবৃত্তি করলেন হারগ্রিভস। 'ভয় নেই, টনি পাগল হচ্ছেন না। মস্তিষ্কের বিক্ষোভ বা 'চকিত অন্ধকার' তাঁর মধ্যে কোনদিনই আসেনি—ওগুলো তাঁর কল্পনা মাত্র। সমস্ত ব্যাপার-টাই ছিলো স্টিফেনের পরিকল্পিত একটা নিষ্ঠুর জঘন্য কারসাজী। কিন্তু সেটা মিথ্যে হয়ে গিয়েছিলো। যদি সেটা সফল হতো, তা হলে স্টিফেন অতি নিখুঁত ভাবে একটা হত্যাকাণ্ড সেরে ফেলতে পারতো।'

জুডিথের মুখে ঝিলিক দিয়ে ওঠা চকিত আশার দীপ্তি হারগ্রিভসের হৃদয় স্পর্শ করলো। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ হতে দিলেন না।

'আট মাস পেছনে ফিরে গিয়ে ঘটনাটা আমরা গোড়া থেকে শুরু করি, আসুন।' হারগ্রিভস বলতে থাকেন, 'টনি একজন প্রচুর সম্পদ-

শালী যুবাপুরুষ। অন্য দিকে 'বিশিষ্ট ব্যক্তি' স্টিফেন ধার-দেনায় জর্জরিত এবং সর্বক্ষণই তিনি দেউলিয়া হয়ে যাবার মুখোমুখি। টনি যদি মারা যান, তাহলে পরবর্তী আত্মীয় হিসেবে স্টিফেনই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জন করবে। কাজেই স্টিফেন স্থির করলো, টনিকে মরতে হবে। কিন্তু ভেষজবিদ স্টিফেন হত্যার ঝুঁকি সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলো না। যতোই ধূর্ততার সঙ্গে পরিকল্পনা ছকে নেওয়া যাক না কেন, সব সময়েই 'কিছুটা সন্দেহ' থেকে যায়। এবং স্টিফেনের ওপরে সন্দেহ পড়তে বাধ্য। শিকারী গোয়েন্দা, তাদের ঝঞ্ঝাটে প্রশ্ন, ময়না তদন্তের রিপোর্ট—এ সবের ঝুঁকি নিতে সে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলো। কিন্তু আজ থেকে আট মাসেরও কিছু আগে আচমকা সে আবিষ্কার করে ফেললো, নিজের সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ না রেখে কি করে সে টনিকে সরিয়ে ফেলতে পারে। সেণ্ট জুডস হাসপাতালে বিনা-পারিশ্রমিকে কাজ করতো স্টিফেন। একদিন সেখানে সে রুপার্ট হেজ নামে ভাঙাচোরা চেহারার এক প্রাক্তন স্কুল-শিক্ষকের সন্ধান পেলো। কথায় বলে, পৃথিবীতে ঠিক একই রকমের দেখতে দুটি করে মানুষ আছে। হেজের সঙ্গে টনির সামান্যতম অমিলও ছিলো না। সত্যি কথা বলতে কি, টনির সঙ্গে তার মিল এতোই সাংঘাতিক যে তাকে দেখে স্টিফেন একেবারে আঁতকে উঠেছিলো। হেজ তখন ক্ষয় রোগে মরতে বসেছে, বড়ো জোর এক বছরের বেশি তার আর আয়ু নেই। বাকি জীবনটা বিলাসিতায় কাটানো এবং নরম বিছানায় স্বাভাবিক কারণে মৃত্যুকে বরণ করার জন্যে সে তখন যে কোন পরিকল্পনাই আগ্রহের সঙ্গে শুনতে প্রস্তুত। স্টিফেন তাকে নিজের মতলবটা বুঝিয়ে বললো।

'স্থির হলো, টনিকে গোটা পৃথিবী ঘুরে আসার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং যেদিন রাত্রে জাহাজ ছাড়ার কথা, সেদিনই তাকে জাহাজে ওঠার অনুমতি দেওয়া হবে। ওই একই জাহাজে পকেটে পিস্তল নিয়ে অপেক্ষা করবে হেজ। স্টিফেন বা অন্য বন্ধুবান্ধবরা সুবিধে মতো আগেভাগে জাহাজ ছেড়ে নেমে আসার পর হেজ তাঁকে

অন্ধকার বোট-ডেকে এগিয়ে যাবার প্ররোচনা যোগাবে এবং সেখানেই টনির মাথায় গুলি চালিয়ে হেজ তাঁর দেহটা জাহাজ থেকে জলে ফেলে দেবে।

'আচ্ছা, বন্দর ছাড়ার ঠিক আগের সময়টাতে সমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্যে তৈরিএকটারাক্ষুসে জাহাজযে হত্যাকাণ্ড চালাবার পক্ষেএকেবারে আদর্শ জায়গা—তা কি আপনি কোনদিনই ভেবে দেখেননি ?···পরে কেউই আপনাকে মনে করতে পারবে না। যাত্রীরা কেউ কিছু খেয়াল করবে না, তারা তখন আবেগে ভীষণ উত্তেজিত। খালাসীরা কিছু লক্ষ্য করবে না, তারা তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। জমায়েত হওয়া জনতার বিভ্রান্তি একেবারে চরম।···আর ওদিকে জলে পড়ার পরে আপনার শিকারটির অবস্থা কি হবে ? প্রথমে তলিয়ে গিয়ে, পরক্ষণেই সে চালক-পাখার ভয়ঙ্কর খপ্পরে গিয়ে পড়বে—ফলে তাকে আর চেনার উপায় থাকবে না। দেহটা যখন আবিষ্কৃত হবে—যদি আদৌ তা হয়—তাহলেও জাহাজ কোম্পানী নিশ্চয়ই তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বে না। কারণ জাহাজের যাত্রী তালিকা থেকে কেউই নিরুদ্দেশ হবে না।···সেটা কি করে সম্ভব হবে, জানতে চাইছেন ? হেজ জাহাজের যাত্রী তত্ত্বাবধায়কের কাছে গিয়ে টনির মালপত্রগুলো জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবার নির্দেশ জানাবে। বলবে যে সে যাত্রা বাতিল করে দিচ্ছে। তারপর টনিকে খুন করে সে-ও জাহাজ থেকে হেঁটে নেমে আসবে, যেন···'

মেয়েটি অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

'তাহলে বুঝতেই পারছেন,' হারগ্রিভস ঘাড় নাড়েন, 'হেজ তখন জাহাজ থেকে নেমে আসবে, যেন সে-ই টনি। বন্ধু-বান্ধবদের বলবে, শেষ অব্দি তার রওনা হতে ভরসা হয়নি.। সকলেই তাতে খুশি হবে। আর কেনই বা হবে না ? ওমনি ধারা আচরণ তো টনির পক্ষে একেবারেই স্বাভাবিক।

'তারপর উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হেজ তার অবশিষ্ট স্বাভাবিক জীবনটা টনির ভূমিকায় অভিনয় করে যাবে।···আমার কথাটা লক্ষ্য করুন :

তার স্বাভাবিক জীবন—যার আয়ু বড়ো জোর এক বছর। অতিরিক্ত অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে তিনি তখন অবশ্যই তাঁর ব্যবসা-পত্তর দেখাশুনো করতে পারবেন না। আপনি তাঁর প্রেমিকা—আপনার সঙ্গেও তিনি খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ করবেন না। বেফাঁস কিছু বলে ফেললেও, সেটার কারণ হবে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ।···তাঁর ফুসফুসের রোগটাকে বাড়তে দেওয়া হবে। এবং বছরের শেষে বন্ধু-বান্ধবদের শোক সাগরে ভাসিয়ে···

'চমৎকার ভাবে মতলবটা ফেঁদেছিলো স্টিফেন। খুন? খুন বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন, মশাই? ডাক্তাররা যতো ইচ্ছে পরীক্ষা করে দেখুন না। পুলিস যেমন খুশি প্রশ্ন করুক।···যা কিছুই করা হোক না কেন, স্টিফেন মারভেল সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ বিছানায় শুয়ে থাকা হতভাগা শয়তানটা সত্যি সত্যিই স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছে।

'কিন্তু ঘটনাটা গোলমাল হয়ে গেলো। খুনী হবার মতো মানসিকতা হেজের ছিল না। তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, কিন্তু লোক হিসেবে সে নিশ্চয়ই ভালো ছিলো। কাজটা করবে বলে সে স্টিফেনকে কথা দিয়েছিলো সত্যি, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে সে কিছুতেই টনিকে খুন করতে পারলো না। পিস্তলটা ফেলে দিয়ে সে তখন ছুট লাগালো। কিন্তু টনি যে তখনও জীবিত, জাহাজ থেকে নেমে এসে সে তা স্বীকার করতে পারেনি। আসলে একটা বছরের সুমধুর সুখ-বিলাস আর সেই সঙ্গে পীড়িত ফুসফুসে স্নিগ্ধ প্রলেপ দেবার জন্যে টনির সমস্ত ধন-ঐশ্বর্য নিজের হেফাজতে পাওয়া —এ দুয়ের প্রলোভন হেজ সামলাতে পারেনি। স্টিফেনের কাছে সে কাজটা সেরে এসেছে, এমনি একটা ভান দেখালো আর স্টিফেনও তাতে আনন্দে নাচতে শুরু করলো। কিন্তু একে একে মাসগুলো যখন কেটে যাচ্ছিলো, হেজ কিন্তু তখন নাচছিলো না। সে জানতো, টনি মারা যাননি এবং শীঘ্রিই সেটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। টনি যেদিন বাড়িতে ফিরে আসছেন বলে তার মনে হয়েছিলো, তার

এক সপ্তাহ আগেই সত্য ঘটনার মুখোমুখি হবার বদলে হেজ একটা চিঠিতে পুলিশকে সব কথা জানিয়ে, নিজেকে গুলি করে।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর হারগ্রিভস ফের বললেন, 'আমার ধারণা, টনির সম্পর্কে সমস্ত কিছুই আপনাকে বুঝিয়ে বলা হলো।'

জুডিথ গেটস নিজের ঠোঁটদুটিকে কামড়ে ধরলো। ওর সুন্দর মুখখানা কুঁচকে উঠছিলো এবং নিজের সক্ষম হাতদুটির অনর্থক কেঁপে কেঁপে ওঠা ও কিছুতেই সামলাতে পারছিলো না।

'হে ভগবান!' জুডিথ অস্ফুটে বললো, 'আমার ভয় ছিলো…'

'হ্যাঁ', হারগ্রিভস বললেন, 'আমি তা জানি।'

'তবে এতেও কিন্তু সব কিছু বোঝা গেলো না। ওই ‥'

'আমি বলেছি, টনির সম্পর্কে সব কিছু বুঝিয়ে বলা হয়েছে', ওকে থামিয়ে দিলেন হাবগ্রিভস। 'শুধু সেটা নিয়েই আপনার মাথা ঘামানো প্রয়োজন। টনি মুক্ত, আপনিও মুক্ত। আর স্টিফেন মারভেলের মৃত্যুটা আত্মহত্যার ঘটনা—সবকারী নথিপত্রে তাই-ই লেখা আছে।'

'কিন্তু তা অসম্ভব!' জুডিথ চিৎকার করে ওঠে। 'স্টিফেনকে আমি পছন্দ করতাম না। আমি চিরদিনই জানতাম, টনিকে সে ঘৃণা করে। কিন্তু নিজের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হয়ে পড়লেও আত্মহত্যা করার মতো মানুষ সে নয়। আসলে আতঙ্কের ব্যাপারটাই যে আপনি ব্যাখ্যা করেননি, তা কি বুঝতে পারছেন না? ও ব্যাপারে আমার যা ধারণা আপনার ধারণাও তা-ই কিনা, তা আমাকে জানতেই হবে। বাদামী ফারের কলার পরা সেই লোকটা কে? কে সেদিন রাত্রে টনিকে বাড়ি অব্দি অনুসরণ করে এসেছিলো? শয়তানের প্রভাব থেকে ওকে সরিয়ে রাখার জন্যে কে সর্বক্ষণ ওর কাছে কাছে ছিলো? কে ওর সেই অভিভাবক? প্রতিহিংসা নেবার জন্যে কে গুলি করেছিলো স্টিফেনকে?'

স্যার চার্লস হারগ্রিভস ধিকিধিকি করে জ্বলতে থাকা গ্যাসের আগুনটার দিকে চোখ নামিয়ে তাকালেন। ঠোঁট থেকে নাসারন্ধ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সূক্ষ্ম রেখায় তাঁর দুর্জ্ঞেয় মুখখানাতে বিচিত্র কুঞ্চন।…তাঁর মস্তিষ্ক অনেক রহস্যকে ধরে রেখেছে। তাঁরা পরস্পরকে

বুঝতে পেরেছেন জানলে, এ রহস্যটাও তিনি সেখানে চাবি বন্ধ করে রাখতে প্রস্তুত।

'আপনিই বলুন আমাকে,' বললেন হারগ্রিভস।

নিউ মার্ডারস ফর ওল্ড : কার্টার ডিকসন

ফাঁদ

এমরি সিনক্লেয়াররা সুখী হতে পারতেন। নিউইয়র্কের ইস্ট সেভেন্টিয়েথ স্ট্রীটের যে বাড়িতে ওঁরা বাস করতেন, সেটা বাদে পাম বিচের একটা মহার্ঘ শীতকালীন আবাসও তাঁদের নিজস্ব। তাছাড়া টাকা-পয়সা তো অগণিত। কিন্তু পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হবার আগেই এমরি সিনক্লেয়ার তাঁর ভাগ্য গড়ে তোলার পর, পঁয়তাল্লিশের আগেই সেটাকে দ্বিগুণ করে তোলার চেষ্টা করছিলেন। ফলে অবহেলা এবং একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হেলেন সিনক্লেয়ার ব্যয়বহুল দোকানে অঙ্গ সংবাহন ও সৌন্দর্যচর্চা করেই দিন কাটাতো। হেলেনের বয়েস যদিও ছত্রিশ, কিন্তু দেখে তিরিশের চাইতে এক দিনও বেশি বলে মনে হতো না।

এমরি সিনক্লেয়ার তাঁর মহিলা সচিবটিকে রাগারাগি করে বিদেয় না করলে, সব কিছুই হয়তো ভালো ভাবে চলতো। কিন্তু সব মহিলাই জন্মগত ভাবে বুদ্ধিহীনা—এমনি একটা ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে, এমরি ওকে তাড়িয়ে পল ফেনটনকে নিযুক্ত করলেন। অল্পবয়সী এই যুবাপুরুষটি যে অবিবাহিত এবং আকর্ষণীয়, তা আবিষ্কার করতে মিসেস সিনক্লেয়ারের দেরি হলো না।

ইস্ট সেভেন্টিয়েথের বাড়ির চারতলায় একখানা ঘরে—এমরি সিনক্লিয়ার যেটাকে পড়াশুনোর ঘর বলতেন সেখানে—এমরি বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসা চালাতেন। তামাম দুনিয়ায় বিশাল মূলধন ছড়িয়ে এমরি পতনোন্মুখ সরকার, একনায়কের গুপ্তহত্যা অথবা ফসল

ফলানোর ব্যর্থতার সংবাদ নিয়ে জুয়ো খেলতেন। এবং একান্ত সচিবকে তিনি নিজের বাড়িতেই রাখতে চাইতেন।

নিজের স্বাভাবিক কাজকর্ম করা ছাড়া, পল ফেনটন মিসেস সিনক্লেয়ারের ব্যক্তিগত হিসেবপত্রও দেখাশুনো করতো। ডিনার পার্টিতে হেলেনের কোন পুরুষ সঙ্গীকে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হলে প্রায়শঃই এই সুদর্শন, সুবেশধারী যুবকটির ডাক পড়তো। অন্যান্য সময়ে, এমরি সিনক্লেয়ার যখন খুব বেশি ব্যস্ত থাকতেন, তখন সে অত্যন্ত খুশি হয়েই হেলেনকে থিয়েটারে নিয়ে যেতো।

এভাবে খুব বেশি দিন কাটার আগেই হেলেন সিনক্লেয়ারের সহজাত মেয়েলি অনুভূতি ওকে জানিয়ে দিলো, ঘটনাটা কি ঘটছে। পল দিব্যি মজাই পাচ্ছিলো, এবং হেলেন যদিও জানতো যে এমরিকে ধোঁকা দেবার ঝুঁকিটুকু ওকে নিতেই হচ্ছে, তবু সেই বিপদের সম্ভাবনাটা ওদের রোমাঞ্চকর সম্পর্কের মধ্যে একটা নিজস্ব আস্বাদ এনে দিয়েছিলো।

কিন্তু শান্ত ও সংযতভাবে যে প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিলো, বাসনায় ঝলসে উঠে তা ওদের দুজনকেই বিস্মিত করে তুললো—বিহ্বল হয়ে উঠলো দুজনেই। দুজনেই স্থির নিশ্চিত হলো, পরস্পরকে ছাড়া তারা জীবন কাটাতে পারবে না। হেলেন বাধা না দিলে, পল তো সোজা এমরি সিনক্লেয়ারের কাছে গিয়ে তাঁকে সব কথা জানিয়েই দিতো— তাতে চাকরি খোয়াতে হলেও সে পরোয়া করতো না। কিন্তু একটি সাদাসিধে সুন্দরী মহিলা বলে মনে হলেও, হেলেনের নরম চিবুকে এক অসাধারণ দৃঢ়তা এবং ওর গাঢ় নীল চোখ দুটির কোমল আবেদনের গভীরে এক নিদারুণ ধূর্ততা লুকিয়ে থাকতো। বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইলে এমরি সিনক্লেয়ারের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে, সে বিষয়ে হেলেনের মনে এতোটুকুও অলীক আশা ছিলো না। নিজস্ব অর্থ বলতে হেলেন সিনক্লেয়ারের কিছুই নেই এবং পলও, যতোদিন তার চাকরিটা আছে ততোদিনই মাইনে পাবে। ঠাণ্ডা জলের ফ্ল্যাটে প্রেম করা, হেলেনের জন্যে নয়। তাছাড়া যে সম্পত্তির মূল্য দশ লক্ষ ডলারেরও বেশি

বলে ও জানে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কোন ইচ্ছেই ওর ছিলো না।

পরবর্তী কয়েকটা সপ্তাহ হেলেন শুধু ওই সমস্যাটার কথাই চিন্তা করে দিন কাটালো। সত্যি কথা বলতে কি, কোন সময়েই চিন্তাটা ওর মনের বাইরে থাকেনি। কখনো কখনো এমরি সিনক্লেয়ারের স্থূল গোলাপী মুখে ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম হাসি দেখতে পেয়েছে বলেও মনে হয়েছে ওর—ভেবেছে, তা হলে এমরি সিনক্লেয়ার সব কিছু জেনে শুনেই ইঁদুর-বেড়াল খেলার মতো পরিস্থিতিটা উপভোগ করছেন কি না। এ ব্যাপারটা হতাশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে হেলেনকে চাপা রাগে ভরিয়ে তুললো। অবাক বিস্ময়ে হেলেন আবিষ্কার করলো, ওই মানুষটাকে ও সরিয়ে ফেলার ('খুন' শব্দটা ওঁর পছন্দ নয়) কথা চিন্তা করছে। কিন্তু উগ্র হিংস্রতা থাকবে না, অথচ অব্যর্থ হবে—এমন কোন পথের কথা ও কিছুতেই ভেবে বের করতে পারছিলো না। তবু হাল ছেড়ে দেবার পাত্রী নয় হেলেন সিনক্লেয়ার এবং শেষ পর্যন্ত একটা মারাত্মক পরিকল্পনাও ওর মাথায় এসে গেলো।

সেবারে শীতের দিনে ইস্ট সেভেন্টিয়েথের বাড়িটা বন্ধ করার আগে পর্যন্ত সুযোগটা আসেনি। হেলেন তখন তিনতলায় এমরি সিনক্লেয়ারের পড়ার ঘরে বসে অপেক্ষা করছিলো, এমরি কয়েকটা কাগজপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন পলকে। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। সব কিছুই গোছগাছ করে নেওয়া শেষ। আসবাবগুলোতে যাতে ধুলো না পড়ে, সেজন্যে সেগুলোকে ঢেকে রাখা হয়েছে। মালপত্রগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিচের হল-ঘরে। চাকর-বাকরদের পাওনা-গণ্ডাও মিটিয়ে দেওয়া শেষ।

পল এগিয়ে এলো ওর কাছে, 'মিসেস সিনক্লেয়ার, এই যে আপনাদের টিকিট।'

হেলেন দেখলো, এমরি সিনক্লেয়ার ওঁকে লক্ষ্য করছেন। লোকটার ওই বিদ্রূপের হাসিকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে হেলেন। উনি যে কি চিন্তা করছেন, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। এ এক আশ্চর্য হেঁয়ালি।

'ধন্যবাদ, পল,' শোভন-সুন্দর হাসি ছড়ালো হেলেন।

'পলকে এক্ষুণি এই কাগজগুলো নিয়ে শহরের মাঝখানে ল্যাজার্ডদের কাছে যেতে হবে,' এমরি বললেন। 'তাই আমি জনসনকে বলে দিয়েছি, ওকে সে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। আমাদের জন্যে আর গাড়ির দরকার হবে না। আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়েই এয়ার-পোর্টে চলে যাবো।' পলের দিকে ঘুরে তাকালেন এমরি, 'বার্টনকে বলে দাও, পনরো মিনিটের মধ্যে আমাদের জন্যে একটা ট্যাক্সি যেন বাইরে তৈরি থাকে।'

পল যখন অন্তর্গৃহ সংযোগে খানসামার সঙ্গে কথা বলছে, হেলেন তখন দ্রুত নিজের মনে চিন্তা করে নিচ্ছিলো। পল চলে যাওয়ার পরে বাড়িতে এমরির সঙ্গে ও একাই থাকবে। আসন ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ও। হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে উঠলেও, বাইরে প্রশান্ত ভাবেই বললো, 'তাহলে আমি বার্টনকে বলে দিচ্ছি, সে চলে যেতে পারে। ট্যাক্সি ডেকে আনার পরে তাকে আমাদের আর দরকার হবে না।'

নিচের তলায় নিজের ঘরে বসে কান পেতে রইলো হেলেন—মনে মনে ঠিক করে নিলো, পল চলে যাবার পর ও কি করবে। আগে থেকেই ঠিক করা আছে, এমরি আর ও একই সঙ্গে বিমানঘাঁটিতে যাবে। সেখান থেকে হেলেন উড়ে যাবে ফ্লোরিডায়—পাম বিচে নিজেদের বাড়িটা খোলার আগে, সেখানেই হেনডারসনদের সঙ্গে একটা মাস থাকবে ও। আর এমরি যাবেন শিকাগোতে—সেখানকার মোনাহান ক্লাবে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে, তিনি হেনডারসনদের বাড়িতে এসে হেলেনের সঙ্গে মিলিত হবেন। ওদিকে নিজের পরিজনদের সঙ্গে থাকার জন্যে পল যাচ্ছে ফিলাডেলফিয়াতে।···সব কিছুই একেবারে নিখুঁতভাবে সাজানো রয়েছে। তিন সপ্তাহ অব্দি কিচ্ছুটি জানা যাবে না। মোনাহান ক্লাবে এমরি হাজির না হলে সবাই ধরে নেবে, উনি আগেকার পরিকল্পনাটা পালটে নিয়েছেন। কিন্তু যদ্দিনে ওঁর নিরুদ্দেশ হবার খবরটা রটে যাবে, তদ্দিনে অনেক দেরি হয়ে

গেছে।…এখন হেলেনকে যা করতে হবে, তা নেহাতই সহজ, শুধু সঠিক সময়টুকুর অপেক্ষা। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পরে, শুধু একটা টেলিফোন—ব্যস। একেবারে অব্যর্থ কাজ।

সদর দরজায় শব্দ শুনে উঠে দাঁড়ালো হেলেন। ও যখন জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন গাড়িটা সবেমাত্র চলতে শুরু করেছে। …পল চলে গেছে। এবাবে ওকে যা কবতে হবে তা হচ্ছে, বার্টনকে সরিয়ে দেওয়া। দ্রুত হাতে কোট, হাতব্যাগ আর দস্তানাজোড়া তুলে নিলো হেলেন। তারপর শেষবারের মতো আয়নার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, ফারেব ছোট্ট টুপিটা মাথায় ঠিকঠাক করে নিয়ে, লিফটে চেপে একতলায় নেমে এলো।

'শোনো বার্টন, মিঃ সিনক্লেয়ার তাঁর মত পালটে ফেলেছেন,' বার্টনকে বললো হেলেন। 'উনি আরও দেরি করে যাবেন। তুমি ওঁর ব্যাগগুলো এই হলঘবেই রেখে দাও, আর আমার গুলো ট্যাক্সিতে তোলো। আর হ্যাঁ—ট্যাক্সিওয়ালাকে বলো, আমি আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেরুচ্ছি।'

বার্টন ফিরে আসতেই হেলেন বললো, তাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না—এবারে সে চলে যেতে পারে। বার্টন বিদায় নিলো। সদর দরজাটা ঠিক মতো বন্ধ আছে কিনা একবার দেখে নিয়ে, ঘড়ির দিকে তাকালো হেলেন। সাড়ে দশটায় ওদের রওনা হওয়ার কথা, তার মানে আধ ঘণ্টা থেকে আর ছ'মিনিট বাকি।…সামনের হলঘর থেকে পেছনের রান্নাঘর অব্দি টানা বারান্দাটায় আলো জ্বেলে একটা দেয়াল আলমারি খুললো হেলেন। আলমারির ভেতরকার দেয়ালে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের প্রধান বোতাম আর ফিউজের বাক্স। তার ঠিক নিচের তাকেই একটা কাগজের বাক্সে নানান ধরনের ফিউজের সংগ্রহ। ফিউজগুলো খুঁজে খুঁজে দেখতে থাকে হেলেন—কতকগুলো ভালোই আছে, কতকগুলো পুড়ে গেছে। পুড়ে যাওয়া একটা ফিউজ বের করে, তাকের ওপরে রাখলো ও। তারপর সামনের হলঘরে ফিরে গিয়ে, লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।…হেলেনের চার-

পাশে সমস্ত বাড়িটা তখন ঠাণ্ডা আর নিস্তব্ধ। ওর মনে হতে লাগলো, ও যেন এক জন্ম ধরে ওই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোন কিছু চিন্তা না করে থাকার চেষ্টা করলো ও, কিন্তু ওর কল্পনা বয়ে চললো অবাধে। শেষ অব্দি সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো ওর—ভেবে পেলো না, এ অবস্থায় কাজটা ও করে উঠতে পারবে কি না।

সহসা এমরির ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে শক্ত হয়ে উঠলো হেলেন। এমরির ভারি পায়ের শব্দ লিফটে গিয়ে ঢুকলো।...মোটরের অস্পষ্ট গুঞ্জন কানে যেতেই বারান্দা ধরে এক ছুটে ফিউজের বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো হেলেন—তারপর 'লিফট' লেখা ফিউজটা টেনে বের করে, সেখানে পুড়ে যাওয়া ফিউজটা গুঁজে দিলো। ভালো ফিউজটা কাগজের বাক্সে রেখে, এবারে আলমারিটা বন্ধ করে দিলো ও ...তারপর বুক ভরে শ্বাস নিলো একবার।...যে অংশটাকে ওর সব চাইতে বেশি ভয়, এবারে তারই পালা।

দ্রুত পায়ে বারান্দা ধরে এগুতে এগুতে হেলেন শুনতে পেলো, ওপরে লিফটের দরজায় মানুষটা সজোরে ধাক্কা মারছে। ও যখন সামনের হলঘরে এসে পৌঁছলো, তখন শব্দটা শুঁড়িপথ দিয়ে নিচে নেমে এসে বজ্রের মতো আঘাত হানলো ওর কানের পর্দায়, আতঙ্কে ভরিয়ে তুললো ওকে। মর্মর পাথরে বাঁধানো মেঝেতে গোড়ালির ঠকঠক শব্দ তুলে হেলেন খানিকটা এগিয়ে যেতেই আচমকা থেমে গেলো আওয়াজটা। কিন্তু ও যখন প্রায় সদর দরজায় পৌঁছে গেছে, তখনই সেটা শুরু হলো আবার—প্রচণ্ড জোরে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সারা বাড়িটা জুড়ে...সেই সঙ্গে একটা প্রাণপণ আর্ত-চিৎকার—যা হিম তীক্ষ্ণতায় বিদ্ধ করে তুললো হেলেনের হৃৎপিণ্ডটাকে।

এক মোচড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেই, সজোরে সেটা বন্ধ করে দিলো হেলেন। ওপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখলো, নিচের থেকে ট্যাক্সিচালকটা তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। লোকটা কি শুনতে পেয়েছে নাকি? ভাবলো হেলেন। হাতব্যাগে কিছু খোঁজার ভান করে কান পেতে রইলো খানিকক্ষণ। নাঃ, বন্ধ দরজার এধারে

থেকে কিছু শুনতে পাওয়া সম্ভব নয়···আর দরজাটা ও খুলেছিলো শুধু এক মুহূর্তের জন্যে।

নিজেকে সামলে নিয়ে এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে, ট্যাক্সিতে উঠে বসলো হেলেন।

'শীগগিরি চলুন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও, 'নয়তো প্লেন ধরতে পারবো না।'

প্লেনে একটা ঘুমের বড়ি খেয়ে নিলো হেলেন এবং পরিসেবিকাকে জানিয়ে দিলো, ওকে যেন বিরক্ত করা না হয়। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন ওরা ফ্লোরিডার আকাশে।···হেনডারসনরা বিমানঘাঁটিতেই ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—ঝলমলে রোদের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে সমুদ্র সৈকতে তাঁদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চললো সকলে।

পরবর্তী সামান্য কয়েকটা দিন হেলেন সিনক্লেয়ার কিছু চিন্তা না করে থাকতে চেষ্টা করলো। ও সাঁতার কাটলো, টেনিস খেললো, দোকান থেকে এটা সেটা কিনে বেড়ালো। রাত্রিবেলা প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও পার্টি থাকতো, আর বিছানায় উঠেই ঘুমের বড়ি খেয়ে নিতো ও। নিজের বিবেকবোধকে ও এভাবেই কোণঠাসা করে রাখতে পেরেছিলো কিন্তু ষষ্ঠ রাত্রিতে ও স্বপ্ন দেখলো, কে যেন ওর শোবার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারছে। দরজাটা ও খুলে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু দরজার হাতলটা ওর হাতের মধ্যেই খুলে এলো। ওদিকে ধাক্কা মারার শব্দটা হয়েই চলছিলো অবিরাম। প্রচণ্ড আতঙ্কে দরজায় লাথি মারতে লাগলো হেলেন, হাতের থাবা বসিয়ে প্রাণপণে খোলার চেষ্টা করলো দরজাটাকে। কিন্তু একখণ্ড নিরেট মর্মর পাথরের মতো দরজাটা অনড় হয়েই রইলো।

ঘামে ভেজা শরীরে চিৎকার করে জেগে উঠলো হেলেন। খানিক-ক্ষণ বিছানায় বসে কান পেতে রইলো ও। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ নিঝুম। কারুরই কোন সাড়া নেই।···যে প্রশ্নটাকে ও এতোদিন মনের মধ্যে সরিয়ে রেখেছিলো, এখন সেটাই একেবারে সামনাসামনি এসে

হাজির হলো। লোকটা কি এতোদিনে মারা গেছে? প্রশ্নটা এড়াতে পারে না হেলেন। ওর মনটার যেন একটা আলাদা জীবন আছে, যেটা সম্পূর্ণভাবে ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ভয়ঙ্কর স্পষ্টতায় ও দেখতে পেলো, লিফটের খাঁচায় আটকে রয়েছেন এমরি সিনক্লেয়ার···সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছেন···হামাগুড়ি দিচ্ছেন মেঝের ওপরে···লাথি মারছেন লিফটের দরজায়····এবং ধীর ও নিশ্চিতভাবে মরে যাচ্ছেন একটু একটু করে।

আর সহ্য করতে পারছিলো না হেলেন। অন্তত কাউকে যদি বলা যেতো ঘটনাটা!···রাত-টেবিলে রাখা দূরভাষ যন্ত্রটার দিকে তাকালো ও—ভাবলো পলের সঙ্গে কথা বলবে কি না। কথামুখটা তুলে নিয়ে দূরপাল্লার লাইনের জন্য নম্বরও ঘোরালো। কিন্তু সংযোগকারিণী সাড়া দেবার আগেই, নামিয়ে রাখলো যন্ত্রটা।···ব্যাপারটা বিপজ্জনক। হেলেন অনুভব করলো, এটা এমন একটা ঘটনা যা ওকে চিরদিনই নিজের মধ্যে রেখে দিতে হবে।···

প্রতিটি দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে হেলেন সিনক্লেয়ারের মন আরও বেশি করে সহজ হতে শুরু করলো। এবং তিন সপ্তাহ বাদে, যা ঘটেছিলো তার সবটাই হারিয়ে গেলো অতীতের গভীরে।

সেদিন রাতে হেলেনের জন্মদিন উপলক্ষে হেনডারসনরা একটা ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। হেলেন যখন লুইস হেনডারসনের সঙ্গে গাড়িতে চেপে চুল বাঁধার দোকানে যাচ্ছে, তখন লুইস আচমকা জিগেস করে বসলো, 'এমরি কটার সময় এসে নামছেন?'

প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠলো হেলেন। আজকের দিনেই যে মানুষটার এসে পৌঁছোনোর কথা, তা ও ভুলেই গিয়েছিলো।

'বিকেল নাগাদ আসবে বোধহয়,' জবাব দিলো ও।

'উনি যদি আমার বুড়োটার মতো মানুষ হন,' লুইস বললো, 'তা হলে আসছে বছর ওঁর মনে পড়বে যে, আজ তোমার জন্মদিন।'

'এমরি সত্যিই তেমনি মানুষ,' হাসলো হেলেন।

হিংস্র আনন্দে হেলেনের মনে পড়লো, কয়েক মাস আগে সুন্দর একটা পান্নার হার দেখেছিলো ওরা দুজনে। এমরি বলেছিলেন, দামটা বড্ডো বেশি। কিন্তু সেই সঙ্গে কথা দিয়েছিলেন, হেলেন নিউইয়র্কে ফিরে এলেই হারটা উনি হেলেনকে কিনে দেবেন।

ভোজসভা শুরু হবার আগে খানিকটা বিশ্রাম নেবার জন্যে বিকেলের দিকে ওপর তলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো হেলেন এবং মনে মনে চিন্তা করে নিলো, এমরি এসে না পৌঁছলে ও কি করবে। হেনডারসনদের কাছে ও এমন ভাব দেখাবে, যেন ও ভীষণ চিন্তিত—কিন্তু রাতটা কাটার আগে কিছুই করবে না। তারপর শিকাগোতে মোনাহান ক্লাব আর ফিলাডেলফিয়ায় পলকে ফোন করবে। পলকে ও বলবে, ও নিউইয়র্কে ফিরে যাচ্ছে—পল যেন বার্টনকে ফোন করে ইস্ট সেভেন্টিয়েথের বাড়িটা খুলে রাখতে বলে। এমরি যে নিরুদ্দেশ হয়েছেন, সে খবরটাও পলকে ও কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়ে দিতে বলবে। এতেই সুন্দরভাবে সমস্ত কাজটা মিটে যাবে। হেলেন যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবে, ততোক্ষণে ঘটনার অপ্রীতিকর অংশটা শেষ হয়ে গেছে।···মনের আনন্দে ইউরোপ, পল এবং একটা শান্ত বিয়ের দিবাস্বপ্নে বুঁদ হয়ে রইলো হেলেন।

পরে, সাজগোছ সেরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এলো ও। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতেই যাঁর মুখোমুখি হলো, তিনি স্বয়ং এমরি সিনক্লেয়ার।···

শেকড় নামানো গাছের মতো অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো হেলেন। অনুভব করলো, ওর মুখ থেকে সমস্ত রক্ত দ্রুত সরে যাচ্ছে। বুঝতে পারলো, নিশ্চয়ই জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ও। কথা বলার চেষ্টা করলো—কিন্তু ঠোঁটদুটো শুধু নড়েই উঠলো, কোন শব্দ বেরুলো না।

হাতে একটা গ্লাস নিয়ে হেলেনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এমরি সিনক্লেয়ার। মুখে সেই বিদ্রূপের হাসি।

'হ্যালো হেলেন,' এমরি বললেন, 'দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন একটা ভূত দেখে ফেলেছো!'

ঘটনাটা কি ঘটেছিলো ভাবতে ভাবতে, নির্বাক বিস্ময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলো হেলেন। ওঁর পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব ছিলো না। নিশ্চয়ই ট্যাক্সিওয়ালা—কিংবা বার্টন। হ্যাঁ, বার্টনই। একমাত্র তার কাছেই একটা চাবি ছিলো। হয়তো সে কোন জিনিস নিতে ভুলে গিয়েছিলো, তাই ফিরে গিয়েছিলো বাড়িতে।···

একটা কুর্সিতে বসে পড়লো হেলেন।

'আমার শরীরটা ভালো লাগছে না,' বলতে চেষ্টা করলো ও; কিন্তু নিতান্তই মৃদুস্বরে উচ্চারিত হলো কথাগুলো।

কোন কথা না বলে পান্থশালা থেকে ওর জন্যে একটা পানীয় নিয়ে এলেন এমরি। জল বিহীন স্কচ। জিনিসটা গিলে ফেললো ও।

'কথা বলার চেষ্টা কোরো না,' ওর মুখোমুখি বসে একটা চুরুট ধরালেন এমরি।

চুপচাপ শান্ত হয়েই বসে রইলো হেলেন—অনুভব করলো, একটু একটু করে ওর শক্তি ফিরে আসছে। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে এমরিকে লক্ষ্য করছিলো ও, পড়ে নিতে চেষ্টা করছিলো তাঁর মুখের অভিব্যক্তিটুকু। 'ও আমাকে অনুমানের ওপরে রাখবে, নিজে থেকে কিছু বলবে না,' ভাবলো হেলেন।

'এখন তোমাকে আগের চাইতে ভালো দেখাচ্ছে,' কিছুক্ষণ পরে এমরি বললেন। 'একটা বিস্ময় সহ্য করতে পারবে?'

সামনের দিকে ঝুঁকে ওকে লক্ষ্য করছিলেন এমরি। কিন্তু হেলেন কিছুই বললো না।

চুরুটটা ছাইদানে রেখে পকেটে হাত ঢোকালেন এমরি সিনক্লেয়ার।

'এবারে কিন্তু আমি এটা ভুলিনি,' পকেট থেকে একটা কালো বাক্স নিয়ে ওঁর হাতখানা বেরিয়ে এলো। বাক্সটা হেলেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে খুট্ করে ডালাটা খুলে ধরলেন এমরি, 'নাও—'

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে হাত বাড়ালো হেলেন। বাক্সের মধ্যে, সাদা সাটিনের ওপরে একটা পান্নার হার বেছানো। হারটার দিকে তাকিয়ে

ফের এমরির দিকে তাকালো ও···বিভ্রান্ত বিস্ময়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলো এমরির সারা মুখ।

'তুমি কখন···'

'আমাদের চলে আসার দিন সকাল বেলা, যখন শহরের মাঝখানে গেলাম, তখনই এটা নিয়ে এসেছিলাম। শিকাগোতে উড়ে যাবার আগেই আমি এটা কিনে নিতে চেয়েছিলাম কিনা!'

'তুমি শহরে···গিয়েছিলে?' নিজেকে প্রশ্ন করতে শুনলো হেলেন!

'সে জন্যেই তো তোমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে যাইনি,' হেলেনের দিকে এক টুকরো হাসি ছুঁড়লেন এমরি। 'পলকে আমি বলে গিয়েছিলাম, সে যেন তোমাকে জানিয়ে দেয় যে তার বদলে আমিই ল্যাজার্ডদের কাছে কাগজপত্রগুলো নিয়ে গেছি। তুমি আমার আসল মতলবটা ধরে ফেলবে, আমি তা চাইনি। আমি চেয়েছিলাম, এটা দিয়ে আমি তোমাকে অবাক করে দেবো।'

'পল তাহলে ওপর-তলায় ছিলো?' আর্তনাদ করে উঠলো হেলেন।

'ছিলো বৈকি! কাজকর্মগুলো সেরে ফেলার জন্যে আমি তাকে রেখেই গিয়েছিলাম।'

নিজেকে সামলাবার জন্যে কুর্সিটা ধরে টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালো হেলেন। ওর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি ছড়ালেন এমরি, 'আমার ব্যাগগুলো নিয়ে আসার জন্যে আমি আবার বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম এবং সে তখন সেখানেই ছিলো।'

বিস্ফারিত চোখ আর ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে মুখে ওঁর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো হেলেন।

শান্ত গলায় এমরি সিনক্লেয়ার আরও বললেন, 'আর আমি যখন বাড়ি থেকে চলে আসি, তখনও ছিলো।'

দ্য ট্র্যাপ : স্ট্যানলি অ্যাবট

ট্রেনটা দেরি করেছিলো। নাটালি যখন আবিষ্কার করলো, হাই টাওয়াব স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ও একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন নিশ্চয়ই রাত নটা বেজে গিয়েছিলো।

স্পষ্টতই স্টেশনটা রাতের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে এটা পথ-চলতি একটা বিরতি মাত্র, কারণ এখানে কোন শহর নেই।···কি করবে, ঠিক বুঝতে পারছিলো না নাটালি। ও ধরেই নিয়েছিলো, ডাক্তার ব্রেসগার্ডল হাতের কাছে হাজির থাকবেন। লণ্ডন ছাড়ার আগে, ও এখানে এসে পৌঁছনোর সময়টা জানিয়ে কাকাকে একখানা তাব পাঠিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ট্রেনটা দেরি করছিলো বলে, উনি হয়তো এসে আবার চলে গেছেন।

অনিশ্চিতভাবে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে, দূরভাষ ব্যবহারের খুপরিটা দেখতে পেলো নাটালি। ডাক্তার ব্রেসগার্ডলের শেষ চিঠিটা ওর ব্যাগের মধ্যেই ছিলো, তাতে তাঁর ঠিকানা এবং ফোনের নম্বর—ছুই-ই রয়েছে। খুপরির দিকে এগুতে এগুতে ব্যাগ হাতড়ে চিঠিটা খুঁজে পেলো নাটালি।

কিন্তু ফোন করাটাও খানিকটা সমস্যাজনক বলে প্রমাণিত হলো। লাইনের সংযোগ পাবার আগে পর্যন্ত সময়টা যেন সীমাহীন এবং তারপরেও লাইনে প্রচণ্ড গোলমালের আওয়াজ। খুপরির কাচের দেয়ালের এধার থেকে স্টেশনের ওধারে পাহাড়গুলোর দিকে এক পলক তাকিয়ে, অসুবিধের কারণটা যেন অনুমান করতে পারলো নাটালি। শত হলেও এটা পশ্চিমের দেশ, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো ও। এখানকার পরিস্থিতি হয়তো এখনও কিছুটা সেকেলে।

'হ্যালো, হ্যালো!'

লাইনের অপর প্রান্ত থেকে একটি মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কানে তালা ধরানোর চাইতেও জোরে চিৎকার করছেন মহিলা। এক-

টানা সেই গোলমালের আওয়াজটা এখন আর নেই—পেছনের শব্দটা শুনে মনে হয়, পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া অনেকগুলো কণ্ঠস্বরের অনর্গল বকবকানি।

'আমি নাটালি রিভার্স কথা বলছি,' সামনের দিকে ঝুঁকে, সুস্পষ্টভাবে, সরাসরি দূরভাষের কথামুখের মধ্যে নিজের নামটা ছুঁড়ে দিলো নাটালি। 'আচ্ছা, ডাক্তার ব্রেসগার্ডল্ ওখানে আছেন কি ?'

'কে কথা বলছে, বললেন ?'

'নাটালি রিভার্স। আমি ওঁর ভাই-ভাইঝি হই।'

'কি হন, বলছেন ?'

'ভাইঝি,' ফের বললো নাটালি। 'আমি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?'

'একটু ধরুন।'

কিছুক্ষণের বিরতি এবং বিরতির সময়টুকুতে পটভূমিকার কণ্ঠস্বরগুলো যেন জোরালো হয়ে ওঠে। তারপরেই এক অনুনাদী পুরুষ কণ্ঠ শুনতে পায় নাটালি—যা ওই অস্পষ্ট কলগুঞ্জনের ভেতর থেকে আলাদা করে নেওয়া খুবই সহজ।

'ডাক্তার ব্রেসগার্ডল্ বলছি।···সত্যি নাটালি, এ-একেবারে অপ্রত্যাশিত আনন্দ !'

'অপ্রত্যাশিত ? কিন্তু আমি তো আজ বিকেলেই লণ্ডন থেকে তোমাকে তার পাঠিয়েছিলাম !' নিজের কণ্ঠস্বরে অধৈর্যের আলতো ছোঁয়া অনুভব করে নিজেকে সামলে নেয় নাটালি, 'তারটা কি এসে পৌঁছায়নি ?'

'আমার আশঙ্কা, এদিকটাতে ওদের কাজকর্ম খুব একটা ভালো নয়,' ত্রুটি-স্বীকারের ভঙ্গিমায় সামান্য হাসলেন ব্রেসগার্ডল্। 'না, তোমার তারবার্তা এসে পৌঁছোয়নি—তবে তারটা তুমি করেছিলে বলেই মনে হচ্ছে।' ফের হাসলেন উনি, 'তুমি এখন কোথায় রয়েছো ?'

'হাই টাওয়ার স্টেশনে।'

'ওহো, ঠিক একেবারে উলটো দিকে।'

'উলটো দিকে?'

'হ্যাঁ, পিটারবি থেকে। তুমি ফোন করার ঠিক আগেই, ওঁরা আমাকে ফোন করেছিলেন। অ্যাপেনডিক্স সম্পর্কে কি সব যেন বললেন—আসলে হয়তো পেট খারাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু আমি সোজা ওখানে যাবো বলে কথা দিয়েছি।'

'এখনও সাধারণ চিকিৎসার জন্যে লোকে তোমাকে ডাকে, এ কথা আমাকে বলতে এসো না।'

'অবস্থাটা যে জরুরী, সোনা! এ অঞ্চলে ডাক্তার বড্ড বেশি নেই। তবে ভাগ্যিস রোগীও বেশি নেই!' হাসতে শুরু করেই সংযত হয়ে উঠলেন ডাক্তার ব্রেসগার্ডল্, 'শোনো—তুমি তো বলছো, তুমি স্টেশনে রয়েছো। তা তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে আসার জন্যে আমি মিস প্লুমারকে পাঠাচ্ছি। তোমার সঙ্গে মালপত্র খুব বেশি আছে কি?'

'শুধু একটা ব্যাগ। বাকিগুলো অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে নৌকোয় আসছে।'

'নৌকোয়?'

'কেন, চিঠিতে তোমাকে জানাইনি?'

'হ্যাঁ, ঠিক—জানিয়েছিলে বৈকি। যাকগে, শোনো—মিস প্লুমার সোজা তোমার কাছে রওনা হচ্ছেন কিন্তু।'

'আমি প্ল্যাটফর্মের সামনে অপেক্ষা করবো।'

'আচ্ছা।' আরও একবার মৃদু শব্দ তুলে হাসলেন ডাক্তার ব্রেস-গার্ডল্, 'এখানে এখন আবার একটা ছোটখাটো পার্টি চলেছে!'

'আমি সেখানে অনধিকার প্রবেশকারী হবো না তো? মানে, তুমি যখন আমাকে ঠিক আশা করোনি…'

'আরে না না, মোটেই তা নয়! ওঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবেন।…তুমি তাহলে প্লুমারের জন্যে অপেক্ষা করো, কেমন?'

সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেলো, প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলো নাটালি।… বিস্ময়কর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই একটা স্টেশন ওয়াগন এসে হাজির

হলো সেখানে এবং রাস্তা থেকে পিছলে গিয়ে একেবারে ধার ঘেঁষে থমকে দাঁড়ালো।

'চলে আসুন', সাদা উর্দি গোছের কোঁচকানো পোশাক পরা ধূসর চুলের একটি লম্বা-পাতলা চেহারার মহিলা গাড়ি থেকে নেমে এসে নাটালিকে হাত তুলে ডাকলেন। 'এটা আমি পেছন দিকে তুলে দিচ্ছি,' এক ঝটকায় নাটালির ব্যাগটা তুলে নিয়ে গাড়ির পেছনের অংশে ছুঁড়ে দিলেন উনি। 'এবারে আপনি উঠে পড়ুন—তারপর আমরা একেবারে বোঁ করে চলে যাবো।'

নাটালি গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করা অব্দি প্রায় অপেক্ষা না করেই, দুর্ধর্ষ মিস প্লুমার মোটর চালু করে দিলেন—এক লাফে ফের রাস্তায় উঠে পড়লো গাড়িটা। অবিলম্বে স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তর অব্দি লাফিয়ে উঠলো, কুঁকড়ে উঠলো নাটালি। সঙ্গে সঙ্গেই ওর বিক্ষোভ লক্ষ্য করলেন মিস প্লুমার, 'দুঃখিত। আসলে ডাক্তার বাবু রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন বলে আমি খুব বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবো না।'

'হ্যাঁ, বাড়িতে অভ্যাগতরাও তো রয়েছেন!…উনি বলেছেন আমাকে।'

'এখন বললেন?' মোড়ের মাথায় মিস প্লুমার একটা তীক্ষ্ণ বাঁক নিতেই গাড়ির চাকাগুলো করুণ চিৎকার তুলে বৃথাই প্রতিবাদ জানালো।

আলোচনার মধ্যে আশঙ্কা ডুবিয়ে দেবে বলে স্থির করলো নাটালি।

'আচ্ছা, আমার কাকা কেমন ধরনের মানুষ?' প্রশ্ন করলো ও।

'কেন, আপনি কোনদিন তাঁকে দেখেননি?'

'না। আমি যখন খুব ছোট, তখন আমার বাবা-মা অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান। ইংলণ্ডে আমি এই প্রথম বার আসছি। সত্যি কথা বলতে কি, এই প্রথম আমি ক্যানবেরা ছেড়ে বাইরে এলাম।'

'আপনার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা।'

'দুমাস আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় তাঁরা শেষ হয়ে গেছেন,' বললো নাটালি। 'কেন, কাকা আপনাকে কিছু বলেন নি?'

'না, মানে···আমি তো খুব একটা বেশি দিন ধরে ওঁর সঙ্গে কাজ করছি না।' গাড়িটা হিংস্র ভাবে বাঁক নিলো আবার। মিস প্লুমার বললেন, 'মোটর দুর্ঘটনা, তাই না? আসলে কিছু কিছু লোক গাড়ি চালানোর কিছুই বোঝে না। ডাক্তারবাবুও তাই বলেন।' মুখ ঘুরিয়ে নাটালির দিকে তাকালেন উনি, 'তা হলে আমি ধরেই নিচ্ছি যে আপনি এখানে থাকতে এসেছেন। তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। কাকা যখন আমার অভিভাবক নিযুক্ত হলেন, তখনই আমাকে আসতে লিখেছিলেন।···তাই ভাবছিলাম, কাকা কি ধরনের মানুষ হতে পারেন। চিঠি থেকে কিছু বলা তো খুবই কঠিন।' মিস প্লুমার নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লেন। কিন্তু ওঁর আস্থা অর্জনের জন্যে নাটালি ফের বললো, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটু ভয় ভয়ও করছে। মানে, এর আগে মানসিক রোগের কোন চিকিৎসকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি কিনা।'

'হয়নি?' কাঁধ ঝাঁকালেন মিস প্লুমার, 'তা হলে তো আপনার ভাগ্য দিব্যি ভালোই বলতে হবে! আমি ঢের দেখেছি। বলতে পারেন, এ ব্যাপারে সবজান্তা। তবে এ কথা বলতেই হবে যে ডাক্তার ব্রেসগার্ডেল এঁদের মধ্যে সব চাইতে সেরা।···উনি অনেক কিছুই মেনে নেন।'

'শুনেছি, ওঁর খুব ভালো পশার।'

'হ্যাঁ, ও ধরনের রোগীর তো অভাব নেই! বিশেষ করে বড়লোক-দের মধ্যে। আমি তো বলবো আপনার কাকা দিব্যি করে নিয়েছেন—ঘর···বাড়ি···সবকিছুই দেখবেন।'

আরও একবার সাংঘাতিক ভাবে বাঁক নিলো গাড়িটা। তারপর দুই সিংহ-দরজার মাঝখান দিয়ে এক সুদীর্ঘ গাড়ি-বারান্দা ধরে, দূরে একরাশ গাছগাছালির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বিশাল অট্টালিকার দিকে তীব্রগতিতে ছুটে চললো। শার্সি লাগানো জানলার ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট আলোর সামান্য একটু আভাস লক্ষ্য করলো নাটালি এবং সেটুকুই কাকার বাড়ির অলঙ্কৃত দেউড়িটা দেখতে সাহায্য করলো ওকে।

'ইস্, কি বিচ্ছিরি লাগছে,' বিড়বিড় করে নিজেকে বললে ও।

'কি হয়েছে?'

'শনিবারের রাত্তির—বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগতরা রয়েছেন। আর এদিকে এতখানি পথ পেরিয়ে এসে আমার পোশাকের যা দশা!'

'ও কথা আর চিন্তা করবেন না।' মিস প্লুমার ওকে আশ্বস্ত করলেন, 'এখানে লৌকিকতার কোন বালাই নেই। আমি যখন এখানে আসি, তখন ডাক্তারবাবু আমাকে এ কথাটাই বলেছিলেন। বাড়ি থেকে দূরে এসে, এটাও একটা বাড়ি।'

চমৎকার একটা কালো লিমুজিন গাড়ির পেছনে এসে আচমকা থমকে দাঁড়ালো স্টেশন ওয়াগনটা।

'বেরিয়ে আসুন!' সুদক্ষ দ্রুততায় পেছনের আসন থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে, ঘাড় ফিরিয়ে নাটালিকে ডাকলেন মিস প্লুমার। তারপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চাবিটা খুঁজতে লাগলেন।

'টোকা দেবার কোন মানে নেই,' মিস প্লুমার বললেন, 'ওঁরা তা শুনতেই পাবেন না।'

দূরভাষে কথা বলার সময় পেছন থেকে যে মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো, সামনের দিকে এখন সেটাই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। মিস প্লুমার দ্রুতপায়ে চৌকাট পেরিয়ে গেলেন, নাটালি দাঁড়িয়ে রইলো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে।

'আরে, আসুন আসুন!'

নির্দেশ মেনে ভেতরে এসে ঢুকলো নাটালি। মিস প্লুমার ওর পেছনে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই ভেতরের অনভ্যস্ত উজ্জ্বলতায় চোখ ঝলসে উঠলো ওর। দেখলো, একটা লম্বাটে বারান্দা গোছের জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। ঠিক সামনেই বিশাল এক সারি সিঁড়ি। সিঁড়ির বেষ্টনী এবং দেয়ালের একটা কোণে একটা টেবিল আর একখানা কুর্সি। ওর বাঁ দিকে কারুকাজ করা ঘন রঙের একটা দরজা—স্পষ্টতই সেটা ডাক্তার ব্রেসগার্ডেলের ব্যক্তিগত অফিস ঘরে ঢোকার পথ, কারণ

তাঁর নাম লেখা ছোট একটা পেতলের ফলক দরজার গায়ে লাগানো রয়েছে। নাটালির ডান দিকে বিশাল একটা খোলা বৈঠকখানা—জানলাগুলো বন্ধ, ভারি পর্দা ঝোলানো। ওখান থেকেই সামাজিক মেলামেশার গুঞ্জন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে।

সিঁড়ির দিকে এগুবার পথে বৈঠকখানাটার দিকে এক ঝলক তাকালো নাটালি। পুরো এক ডজন অভ্যাগত একটা বিরাট টেবিলকে ঘিরে ঘোরাফেরা করছেন, অঙ্গভঙ্গি সহকারে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন বিশেষ পরিচিত মানুষদের মতো ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায়। টেবিলের ওপরে পানীয়সহ অনেকগুলো বোতলের ছন্দিল বিন্যাস। আচমকা একরাশ হাসির রোল বুঝিয়ে দিলো, অজ্ঞ একজন অভ্যাগত ডাক্তারের আতিথেয়তা সম্পর্কে কটাক্ষময় ইঙ্গিত প্রকাশ করেছেন।

কেউ যাতে দেখতে না পায়, সেজন্যে দ্রুতপায়ে জায়গাটা পেরিয়ে এলো নাটালি। তারপর মিস প্লুমার ব্যাগটা নিয়ে ওকে অনুসরণ করছেন কিনা দেখার জন্যে এক পলক পেছনের দিকে ফিরে তাকালো। মিস প্লুমার ওকে অনুসরণ করছিলেন সত্যি, কিন্তু ওঁর হাত দুটি শূন্য। নাটালি সিঁড়ির কাছে পৌঁছতেই মাথা নাড়লেন মিস প্লুমার।

'এখুনি তো আপনি ওপরে যাচ্ছেন না, তাই না?' অস্ফুটে বললেন উনি। 'আসুন, সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে নিন।'

'আমি ভাবছিলাম, আগে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নেবো।'

'দাঁড়ান—আমি আপনার আগে গিয়ে, আপনার ঘরটা একটু ঠিকঠাক করে আসি। জানেনই তো, ডাক্তারবাবু আমাকে আগে থেকে কিছু বলেননি।'

'কিন্তু সত্যিই তার কোন দরকার নেই। আমি একটু হাত-মুখ ধুয়ে নিলেই…'

'ডাক্তারবাবু এখন যে কোন মুহূর্তেই ফিরে আসবেন। আপনি বরং তাঁর জন্যে অপেক্ষা করুন।'

গাড়ি চালানোর সময়কার সেই একই গতি ও তৎপরতায় নাটালির একখানা বাহু চেপে ধরে, ওকে আলোকিত ঘরটায় মাঝখানে

টেনে আনলেন মিস প্লুমার, 'ইনি হচ্ছেন ডাক্তারবাবুর ভাইঝি, মিস নাটালি রিভার্স—অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন।'

কথাবার্তার প্রচণ্ড গোলমালের মধ্যে যদিও মিস প্লুমারের কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যায়নি, তবু বেশ কয়েকটি মাথা ওর দিকে ঘুরে তাকালো।

বেঁটেখাটো চেহারার খোশমেজাজী এক মোটাসোটা ভদ্রলোক হাতের অর্ধশূন্য গ্লাসটা নেড়ে নাটালিকে অভিবাদন জানালেন, 'সোজা অস্ট্রেলিয়া থেকে, অ্যাঁ? তবে তো আপনি নিশ্চয়ই তৃষ্ণার্ত!' নিজের পানপাত্রটা নাটালির দিকে এগিয়ে দিলেন উনি, 'ঠিক আছে, আপনিই এটা নিন। আমি আর একটা নিয়ে নেবোখন।'

নাটালি কিছু বলার আগেই ঘুরে গিয়ে ফের টেবিলের ভিড়ে মিশে গেলেন ভদ্রলোক।

'মেজর হ্যামিলটন,' মিস প্লুমার ফিসফিসিয়ে বললেন। 'সত্যিই খুব ভালো মানুষ। তবে মনে হচ্ছে, এখন উনি অল্পসল্প মাতাল হয়ে পড়েছেন।'

মিস প্লুমার সরে যেতেই অনিশ্চিতভাবে হাতের গ্লাসটার দিকে তাকালো নাটালি। জিনিসটা কোথায় সরিয়ে রাখবে তা ঠিক বুঝতে পারছিলো না ও

'আমাকে এটা নিতে অনুমতি দিন।' ধূসর চুল, কালো গোঁফ, দীর্ঘকায় এবং রীতিমতো বিশিষ্ট দর্শন এক ভদ্রলোক সামনের দিকে এগিয়ে এসে নাটালির হাত থেকে পানপাত্রটা তুলে নিলেন।

'ধন্যবাদ।'

'না না, তবে মেজরকে আপনি মার্জনা করে দেবেন। জানেনই তো, মজলিশী মেজাজ বলে কথা!' ঘাড় নেড়ে প্রচণ্ড নিচু-গলার-পোশাক পরা এক মহিলার দিকে দেখালেন উনি···হাসিতে মুখর হয়ে ওঠা তিন ভদ্রলোকের সঙ্গে মহা উৎসাহে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন মহিলা। 'তবে কিনা যেহেতু এটা একটা বিদায়োৎসব···'

'আরে, আপনি এখানে!' বেঁটেখাটো যে মানুষটাকে মিস প্লুমার

মেজর হ্যামিলটন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি ফের নাটালির চারদিকের কক্ষপথে এসে হাজির হলেন। ওঁর হাতে নতুন এক পাত্র পানীয়, রক্তিম মুখে নতুন হাসির ঝিলিক। 'আমি আবার ফিরে এসেছি, ঠিক একটা বুম্যারাঙের মতো—তাই না?'

প্রাণখোলা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন মেজর হ্যামিলটন। তারপর একটু থেমে বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় তো বুম্যারাঙ আছে, তাই নয় কি? গ্যালিপোলিতে আমি বেশ কিছু অস্ট্রেলিয়ান দেখেছিলাম। তবে তা অবিশ্যি বেশ কিছুদিন আগে—বোধহয় আপনার জন্মেরও আগে···'

'প্লিজ, মেজর—' দীর্ঘকায় মানুষটি নাটালির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। লোকটার উপস্থিতিতে আশ্বস্ত হবার মতো কি যেন রয়েছে, কি একটা যেন ভীষণ পরিচিত বলেও বলে মনে হচ্ছে। লোকটাকে আগে কোথায় দেখে থাকতে পারে, ভাবতে থাকে নাটালি। লক্ষ্য করে, এগিয়ে গিয়ে মেজরের হাত থেকে পানপাত্রটা ছিনিয়ে নিচ্ছেন ভদ্রলোক।

'দেখুন, এখানে তো···ইয়ে, মানে···' মেজর আমতা আমতা করতে থাকেন।

'আপনি কিন্তু যথেষ্ট টেনে ফেলেছেন। তাছাড়া যাবার সময়ও তো প্রায় হয়ে এলো।'

'পথের জন্যে একটা···' চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবেদনের ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন মেজর। 'অন্য সবাই তো খাচ্ছে!' নিজের গ্লাসটা কেড়ে নেবার জন্যে আচমকা ঝাঁপ দিলেন উনি, কিন্তু দীর্ঘকায় ভদ্রলোক সুকৌশলে ওঁকে এড়িয়ে গেলেন। ঘাড় ফিরিয়ে নাটালির দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন উনি। তারপর মেজরকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় ওঁকে অনুনয় করে বোঝাতে শুরু করলেন। মেজর ঘাড় নাড়লেন। বাড়াবাড়ি রকমের ঘাড় নাড়া···মাতালের মতো।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো নাটালি। পিয়ানোর সামনে টুলের ওপরে বসে থাকা একেবারে নিঃসঙ্গ এক বয়স্কা মহিলা ছাড়া

কেউই ওর দিকে এতোটুকু মনোযোগ দিচ্ছে না। অমন নিস্পলক চোখে মহিলাকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, নিজেকে একটা উৎসবের দৃশ্যে একজন অনধিকার প্রবেশকারীর মতো মনে হলো নাটালির। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিতেই সেই চরম নিচু-গলার-পোশাক পরা মহিলার দিকে চোখ পড়লো ওর। এবং সেই মুহূর্তেই আচমকা নিজের পোশাক পালটে নেবার ইচ্ছেটার কথা মনে পড়াতে, মিস প্লুমারকে দেখার আশায় দোরগড়ার দিকে তাকালো ও। কিন্তু কোথাও মিস প্লুমারকে দেখা গেলো না।

'মিস প্লুমার', সিঁড়ির কাছে ফিরে এসে চিৎকার করে ডাকলো নাটালি।

কোন সাড়া নেই।

ঠিক তখনই চোখের কোণ দিয়ে নাটালি লক্ষ্য করলো, ওধারের দরজাটা সামান্য খুলে রয়েছে। বস্তুত, ও তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অতি দ্রুত খুলে গেলো দরজাটা এবং একটা কাঁচি হাতে নিয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিস প্লুমার। নাটালি ফের ওঁকে ডেকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই প্রায় ছুটতে ছুটতে উলটো দিকে চলে গেলেন মহিলা।

এখানকার মানুষগুলো সত্যিই কেমন যেন অদ্ভুত, নিজেকে বললো নাটালি। কিন্তু মজলিশ চলার সময় সর্বত্র কি এই একই ধরনের ব্যাপার হয় না?

মিস প্লুমারকে অনুসরণ করতে গিয়ে খোলা দরজাটার সামনে থমকে দাঁড়ালো নাটালি···অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো ওর কাকার অফিস ঘরের দিকে।

ছোট্ট ঘর, সারি সারি বই, চামড়ায় মোড়া শক্তপোক্ত আসবাবগুলো বইয়ের তাকগুলোর কাছে জড়ো করে রাখা। মানসিক রোগীদের জন্যে নির্দিষ্ট কৌচখানা দেয়ালের কাছে এক কোণে সাজানো রয়েছে। তার কাছেই মেহগিনি কাঠের বিশাল একটা টেবিল। দূরভাষ যন্ত্রটা ছাড়া টেবিলের ওপরটা একেবারে ফাঁকা, বাদামী

তারের একটা শীর্ণ ফাঁস সাপের মতো পাক খেয়ে বেরিয়ে এসেছে যন্ত্রটা থেকে।

ফাঁসটা দেখে কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছিলো নাটালি। নিজের গতিবিধি সম্পর্কে সচেতন হবার আগেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো ও, তাকিয়ে রইলো দূরভাষ থেকে নেমে আসা বাদামী রঙের তারটার দিকে। এবং তারপরেই বুঝতে পারলো, কিসের জন্যে ওর অমন অস্বস্তি লাগছিলো।

তারের শেষ প্রান্তটা দেয়ালের সংযোজক অংশ থেকে নিঁখুতভাবে কেটে দেওয়া হয়েছে।

'মিস প্লুমার!'…মহিলার হাতে ধরা কাঁচিটার কথা মনে করে অস্ফুটে বললো নাটালি। কিন্তু ফোনের তারটা উনি কাটলেন কেন?

মুখ ফেরাতেই নাটালি দেখলো, দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটি ঠিক তখনই দোরগড়া পেরিয়ে ওর পেছনে এসে দাঁড়ালেন।

'ফোনটা আর দরকার হবে না,' যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক বললেন। 'আমি তো আপনাকে বলেই ছিলাম, শত হলেও এটা বিদায় উৎসব।' সামান্য শব্দ করে ঈষৎ হাসলেন উনি।

এতোক্ষণে নাটালি বুঝতে পারলো, ভদ্রলোকের মধ্যে কোন জিনিসটা ওর কাছে অদ্ভুত রকমের চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছিলো। স্টেশন থেকে দূরভাষে কথা বলার সময় এই হাসির শব্দটাই শুনতে পেয়েছিলো ও।

'আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে রহস্য করছেন!' নাটালি উচ্ছ্বসিত স্বরে বললো, 'আপনিই ডাক্তার ব্রেসগার্ডেল, তাই না?'

'না,' নাটালির পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। 'আসলে আপনি আসবেন বলে কেউই আশা করেনি। যখন আপনার ফোনটা এলো, তখন আমরা এখান থেকে রওনা দিতে যাচ্ছিলাম। তাই কিছু একটা বলতেই হয়েছে।'

এক মুহূর্তের নিদারুণ স্তব্ধতা। তারপর, 'আমার কাকা কোথায়?' জিগেস করলো নাটালি।

'ওই তো, ওখানে।'

দীর্ঘকায় মানুষটার পাশে দাঁড়িয়ে, কৌচ আর দেয়ালের মাঝামাঝি জায়গাটাতে যা পড়েছিলো—তার দিকে তাকালো নাটালি। এক পলকের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারলো না ও।

'বিচ্ছিরি ব্যাপার,' ঘাড় নাড়লেন লম্বা মানুষটি। 'অবিশ্যি ব্যাপারটা এতো আচমকা ঘটে গেলো···মানে আমি সুযোগটার কথা বলছিলাম।···তারপর ওরা সবাই মদ নিয়ে পড়লো···'

মানুষটার কণ্ঠস্বর ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনির রেশ জাগিয়ে তুলছিলো। নাটালি বুঝতে পারলো, মজলিশী গোলমাল শেষ হয়ে গেছে। চোখ তুলে দেখলো, ওঁরা সকলে দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন ওকে।

পরক্ষণেই সারি ভেঙে মিস প্লুমার দ্রুত পায়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। ওঁর কোঁচকানো উর্দির ওপরে একটা বেমানান ফারের চাদর জড়ানো।

'ইস!' হাঁপাতে হাঁপাতে মিস প্লুমার বললেন, 'কাকাকে তাহলে খুঁজে পেয়েছেন!'

ঘাড় নেড়ে সামনের দিকে এক পা এগিয়ে এলো নাটালি, 'একটা কিছু আপনাকে করতেই হবে—প্লিজ!'

'তাও তো আপনি অন্যদের দেখেননি,' মিস প্লুমার বললেন, 'কারণ তারা সব ওপর তলায় রয়েছে।···মানে ডাক্তারবাবুর কর্মচারীরা।··· একেবারে বীভৎস দৃশ্য!'

পুরুষ ও মহিলা সকলেই ঘরে ঢুকে মিস প্লুমারের পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাকিয়েছিলেন নিঃশব্দে। তাঁদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো নাটালি, 'এ তো একেবারে পাগলের কাজ! যে করেছে তার পাগলা গারদে থাকার কথা!'

'আহা বাছা আমার!' দ্রুত হাতে দরজা বন্ধ করে, তাতে চাবি লাগিয়ে দিলেন মিস প্লুমার। নিশ্চুপ দর্শকরা এগিয়ে এলো সামনের দিকে। 'এটাই তো একটা পাগলা গারদ···'

এ হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম : রবার্ট ব্লচ

সাদা চোখে বোঝা না গেলেও, স্রোতের বেগ একেবারে স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত ভাঁটার টান ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছিলো। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্তহীন পরিবর্তনের ধারায় সমুদ্র থেকে গর্জন তুলে জোয়ারের স্রোত আবার যাত্রা শুরু করলো, ছুটে এলো সমুদ্র থেকে নদীতে এবং সব শেষে রে গার্ভিনের প্রায় শেষ হয়ে আসা বাড়িটার মুখোমুখি, এই দুরারোহ খাঁড়িটার বুকে।

খাঁড়ির ওধারে দড়িদড়াবিহীন ফেরিঘাটটা থেকে একটা দামাল উত্তর-পুব মুখো বাতাসের স্রোত সিকি মাইল দূরে নদীর মুখ পর্যন্ত ঝলমলে সবুজ প্রান্তরের মতো ছড়িয়ে থাকা নয়ানজুলির দীর্ঘ ঘাস-গুলোতে ঢেউয়ের নাচন জাগিয়ে তুলেছিলো।

ফেরিঘাটের শেষপ্রান্তে বেষ্টনীর ওপরে হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়ে-ছিলো লয়েড রিড। নিচের নৌকায় দাঁড়ানো মানুষটার দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'মালটার অবস্থা কি রকম আছে, রে?'

'এক মুখো লাইনের ওজন ধরে রাখতে হলে এটার পেছনে খাটতে হবে।' ভারি নৌকোটাতে লগি মেরে কাদা প্যাচপেচে তীরে নেমে পড়লো রে গার্ভিন। তারপর পকেট থেকে একটা লম্বা ছুরি বের করে কাঠের সামর্থ্য যাচাই করার জন্যে ছুরিটার দীর্ঘ ফলা দিয়ে একটা থামে আঘাত করতে শুরু করলো।

'ফেরিঘাটটার বয়েস কতো হবে বল্ তো, লয়েড? দশ, বিশ বছর?'

'এটা সেই একই ফেরিঘাট কি না, জানিনে। তবে আমি যখন বাচ্চা ছিলুম, তখনও এখানে একটা ফেরিঘাট ছিলো। মনে পড়ে, বাবার সঙ্গে আমি এখানে চলে আসতুম।...সে আজ কিছু না হলেও পঁচিশ বছর আগেকার কথা।'

ফলা মুড়ে ছুরিটা পকেটে রেখে দিলো গার্ভিন, 'পুরনো বাড়িটার সঙ্গে এটাও পুড়ে গেলে ভালো হতো।' ফেরিঘাটের ঠিক তলায় এসে দাঁড়ালো সে। তারপর দুহাতে একটা আড়াআড়ি ভাবে লাগানো খুঁটি শক্ত করে চেপে ধরে, সজোরে সেটাকে ঝাঁকুনি দিতে শুরু করলো।

'এই, কি হচ্ছে!' চিৎকার করে উঠলো রিড, 'ভেঙে যাবে যে!'

ফেরিঘাটের ওপরে লোহার খুঁটি তিনটের কথা চিন্তা করে নিলো গার্ভিন। ঠিক করলো, সোমবার দিন কুলি জুটিয়ে ওগুলোকে তীরে নিয়ে রাখবে। এর চাইতে সেটা বরঞ্চ অনেকটা নিরাপদ হবে।

শেষবারের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে খুঁটিটাকে আলগা করে নিলো গার্ভিন।

'সাবধানে নামাস, রে।' রিড বললো, 'খুঁটিগুলো কিন্তু খুব একটা মজবুত করে লাগানো নেই…'

হঠাৎ ভারি রাইফেল থেকে ছুটে বেরুনো গুলির শব্দের মতো একটা আচমকা আওয়াজে রিডের কথা হারিয়ে গেলো। টুকরো টুকরো কাঠের ফালি আর পচাকাঠের গুঁড়ো নিয়ে সরাসরি গার্ভিনের ঠিক ওপর থেকে ধসে পড়লো শব্দটা।

গার্ভিনের প্রতিক্রিয়াটা ছিলো একেবারে সহজ প্রবৃত্তি জাত—এমন কি রিড চিৎকার করে ওঠার আগেই যেন একটা দুর্বোধ্য সাবধানী সঙ্কেতের মতো ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গিয়েছিলো সে।…একপাশে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিলো গার্ভিন—কিন্তু তার ন্যাকড়ার জুতো-জোড়া তীরের কাদায় পিছলে যাবার দরুন, হাত-পা ছড়িয়ে সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়লো।

লোহার খুঁটিগুলো নেমে আসছে…সরে পড়ো এখান থেকে!…কথাটা মনে হতেই গার্ভিনের বুকের ভেতরটা জমে উঠলো। শরীরের প্রতিটি পেশীতে জোর দিয়ে চার হাত পায়ে পিছল মাটির বুকে হামা-গুড়ি দিয়ে এগুবার চেষ্টা করছিলো সে, কিন্তু স্বপ্নে দৌড়নো মানুষের মতো একটুও এগুতে পারছিলো না।…আর একটুখানি…আর কয়েক ফুট মাত্র—

হঠাৎ কি একটা জিনিস যেন গার্ভিনের ডান পায়ের গোড়ালিটাকে মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরলো, পায়ে একটা তীব্র যন্ত্রণার শিহরণ অনুভব করলো সে। গার্ভিন শুনতে পেলো, যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠেছে। তারপর এক মুহূর্তের সামান্য স্তব্ধতা এবং তারপরেই চতুর্দিকে জল ছিটিয়ে খাঁড়ির কিনারায় কি যেন একটা ধসে পড়লো।

ভিজে মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো গার্ভিন। হাতের আঙুল-গুলো মুঠিবদ্ধ করে আর চোখ দুটো সজোরে বন্ধ করে রেখে, গোড়ালির যন্ত্রণাটা জয় করে নেবার চেষ্টা করছিলো সে। 'হতচ্ছাড়া খুঁটিগুলো ভেঙে পড়েছে,' ভাবলো গার্ভিন, 'পাটা ভেঙেছে আমার।'

'রে! রে!'

মাথা তুলে দুরারোহ তীরভূমির দিকে তাকালো গার্ভিন।… পিছল খেয়ে খাঁড়ির দিকে নেমে আসতে আসতে কোনক্রমে নিজেকে সামলে রাখছে রিড।…

'রে, তুই ঠিক আছিস তো!'

'মনে হচ্ছে, নিজের শক্তি কতোটা, তা আমি ঠিকমতো জানতাম না,' একটু হাসি ছড়াবার চেষ্টা করলো গার্ভিন। 'একেবারে স্যামসন!'

কাছে এসে ওর পায়ের দিকে তাকালো রিড, 'তুই…তুই তোর পা-টা টেনে বের করতে পারবি তো?'

'জানি না,' মাথা ঘুরিয়ে নিজের গোড়ালিটার দিকে তাকাবার জন্যে কনুইয়ের ওপরে ভর রেখে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ উঁচু করে তুলে ধরলো গার্ভিন। একটা লোহার খুঁটি আড়াআড়ি ভাবে তার গোড়ালির ওপরে এসে পড়েছে, কাদামাটির মধ্যে ঠেসে রেখেছে গোড়ালিটাকে।

'চেষ্টা করে দেখি,' পা-টা টেনে নেবার চেষ্টা করলো গার্ভিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পায়ে আবার তীব্র যন্ত্রণার প্রবাহ বয়ে গেলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো গার্ভিন, ফের পা-টা অনড় করে রাখলো সে।

'গোড়ালিটা ভেঙেছে…নির্ঘাৎ ভেঙে গেছে…'

'তাও তো তোর কপাল ভালো।' রিড বললো, 'ছুটো খুঁটি একটুর জন্যে তোর গায়ে পড়েনি!'

'হ্যাঁ, ভালো তো বটেই! এবারে মালটা আমার পায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দাও।'

'সরিয়ে দেবো?' শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো রিড, 'রে, এটা একটা দশ ইঞ্চি মোটা লোহার খুঁটি। ওজন কমসে কম চারশো পাউণ্ড, কিংবা তার চাইতেও বেশি। অতো উঁচু থেকে পড়েও এটা যে তোর পা-টাকে ছু-টুকরো করে দেয়নি, তা তোর পরম সৌভাগ্য!'

'আমি কতোটা ভাগ্যবান তা নিয়ে বকবকানি থামিয়ে এবারে কাজের কাজ কিছু করবি কি?'

ছুকাঁধে ঝাঁকুনি তুলে মাথাটা একটু চুলকে নিলো রিড। তারপর গার্ভিনের পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে, ওর পায়ের ওপরে যেখানে খুঁটিটা পড়েছিলো সেখানটা ভালো করে লক্ষ্য করলো। খুঁটিটার শেষ প্রান্ত এখনও ফেরিঘাটের থামগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফের মাথা চুলকালো রিড, 'কি কাণ্ড!···কিন্তু তুই তো আমার পিঠের অবস্থা জানিস, রে। এটা তোর পায়ের ওপর থেকে সরাবার চেষ্টা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব।'

লয়েডের পিঠের ব্যাপারটা গার্ভিন জানে। সবাই জানে। বিমান বাহিনীর সৈনিক হিসেবে একটা বি· ১৭তে থাকার সময় যেভাবে সে আঘাতটা পেয়েছিলো, যেভাবে ইংলিশ চ্যানেলের ওপরে একটা জ্বলন্ত উড়োজাহাজ থেকে তাকে প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিলো —তার জন্যে লয়েড রীতিমতো সম্মানের দাবিদার। অক্ষমতার ভাতা পাবার সূত্রে আঘাতটা তার আয়ের একমাত্র উৎসও বটে।

'আমি তোর ওপরে চোটপাট করতে চাইনি, লয়েড!' এক মুহূর্ত চোখ ছুটো বন্ধ করে একটু ভেবে নেবার চেষ্টা করলো গার্ভিন, 'ছাখ, আমার পায়ের নিচে যদি খানিকটা গর্ত খুঁড়ে দিতে পারিস, তা হলে আমি হয়তো পা-টা আস্তে করে বের করে নিতে পারবো।'

'ঠিক বলেছিস। ওতেই কাজ হবে।'

গার্ভিনের গোড়ালির কাছে দুহাত দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলো রিড। একবার সে অসতর্কভাবে গার্ভিনের পা-টা একটু স্পর্শ করতেই গার্ভিন শিউরে উঠলো।

'দুঃখিত, রে···'

একমনে শক্ত কাদার তাল তুলে তুলে গর্ত খুঁড়তে লাগলো রিড। ডানদিকে তাকিয়ে গার্ভিন দেখলো, মাত্র মিনিট খানেক আগে নৌকোটাকে সে লগির আঘাতে যেখানে ডাঙায় নিয়ে তুলেছিলো, এখন সেখানেই নৌকোটা জলে ভেসে রয়েছে।

'জোয়ার শুরু হয়ে গেছে।' গার্ভিন বললো, 'যে করেই হোক এখান থেকে আমাকে ছাড়া পেতেই হবে।'

'জোয়ার?' কাজ থামিয়ে খাঁড়ির দিকে ফিরে তাকালো রিড, একটা বিচিত্র অভিব্যক্তি ওর সারা মুখে ফুটে উঠলো। 'বসন্তের জোয়ার বলে কথা! উত্তর-পুবমুখো বাতাসটা যে ভাবে বইছে, তাতে জল তো এগারো ফুট উঁচু হয়ে···'

'লয়েড, দোহাই ঈশ্বরের! কথা বন্ধ রেখে একটু কাজ করবি?'

নিচু হয়ে ফের কাজে হাত লাগায় রিড, নিঃশব্দে মাটি তুলতে থাকে গার্ভিনের গোড়ালির চারপাশ থেকে। কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই হাত গুটিয়ে নেয় সে।

'রে···' বিচলিত ভাবে গলা সাফ করে নেয় রিড, 'রে, তোর পায়ের নিচে কি যেন একটা রয়েছে—কোন গাছের গুঁড়ি কিংবা ভাঙা খুঁটির গোড়া বা অন্য কিছু। লোহার বরগাটা তার সঙ্গে তোর পা-টাকে ঠেসে রেখেছে।'

এতোক্ষণ একটানা যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম আতঙ্কের একটা আচমকা মৃদু শিহরণ অনুভব করলো গার্ভিন। কনুইতে ভর রেখে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ উঁচু করে তুলে ধরলো সে, তারপর হাতের জোরে চাড় মেরে হাঁটু মুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। এটুকু নড়াচড়াতেই যন্ত্রণার তীব্রতাটা অনেকখানি বেড়ে উঠলো সত্যি, কিন্তু এখন ওর

ডান ধারে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে জলের রেখা থেকে ওর উচ্চতা অন্তত অনেকটা বেড়ে উঠেছে

'এখন···এখন কি করবো আমরা ?' জিগেস করলো লয়েড।

নিচে নামতে না পারলে ওপরে উঠে আসতে হবে, ভাবলো গার্ভিন। বললো, 'লোহার বরগাটাকে আমাদের যে করেই হোক, তুলতে হবে।' দুরারোহ তীবভূমির দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো সে। যে কোন একটা মতলবের সূক্ষ্মতম আভাস খুঁজে পাবার জন্যে ওর মন দ্রুত ছুটে চলছিলো। দূরে লয়েডের গাড়ির ছাদটা দেখতে পেলো সে। ওখানে শক্তি রয়েছে। এখন যে কোন উপায়েই হোক শক্তিটা যেখানে প্রয়োজন, সেখানে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাঙা ফেরিঘাটটার দিকে চোখ তুলে তাকালো গার্ভিন। লোহার বরগাটা যেখান থেকে খসে পড়েছে, ফেরিঘাটটাও সেখান থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু পাশের থামটা এখনও অটুট অবস্থাতেই আছে বলে মনে হচ্ছে এবং আড়াআড়িভাবে লাগানো খুঁটিটাও তার ওপরে রয়েছে। আগেকার মতো।

'লয়েড, ওই আড়-খুঁটিটার ওপর দিয়ে একটা দড়ি নিয়ে আয়।' গার্ভিন বললো, 'দড়ির একটা দিক তোর গাড়িটার সঙ্গে বাঁধ, আর একটা দিক আমরা এই লোহার বরগাটার তলা দিয়ে গলিয়ে, বেঁধে নেবো। আমাদের যেটুকু করা দরকার তা হচ্ছে, এটাকে সামান্য কয়েক ইঞ্চি উঁচু করে তুলে ধরা—'

'কিন্তু দড়ি কোথায় ?'

'দড়ি ?' চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় গার্ভিন। তারপর ডান ধারে হাত বাড়িয়ে নৌকোর কাছিটা ধরে বলে, 'এই তো, এখানে খানিকটা দড়ি রয়েছে। এটা খুব একটা পুরনো দড়ি নয়···'

'কিন্তু', রিড ফের ওকে বাধা দেয়, 'কিন্তু রে, ওটা বিশ ত্রিশ ফুটের চাইতে বেশি লম্বা নয়। অথচ গাড়ি অব্দি নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের কম করে হলেও, একশো ফুট দড়ির দরকার।'

হাতে ধরে রাখা দড়িটার দিকে তাকালো গার্ভিন। লয়েড ঠিকই

বলেছে, এটা মোটেই অতোটা লম্বা নয়। হাত থেকে দড়িটা ছুঁড়ে দিলো সে, 'তোর গাড়িতে ? তোর গাড়িতে কোন দড়ি নেই ?'

দু কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে মাথা নাড়লো রিড।

গার্ভিনের নিজের গাড়িতে আধ-ইঞ্চি পুরু বেশ খানিকটা নতুন দড়ি ছিলো। কিন্তু সে গাড়িতে ওরা আসেনি। ফেরিঘাট বা সামনের নতুন বাড়িটাতেও কোন দড়িদড়া নেই।…হাঁটুতে কিসের যেন স্পর্শ পেয়ে চোখ নামিয়ে তাকালো গার্ভিন। খাঁড়ির জল দ্রুত বেড়ে উঠছে। এগারো ফুট উঁচু বান—রিড বলেছে। সাড়ে ছ ঘণ্টায় এগারো ফুট। তার মানে ঘণ্টায় দেড় ফুটেরও বেশি। কোন মানুষের হাঁটু থেকে তার নাকের দূরত্ব কতোটা ? চার ফুট ? তার মানে ইস্পাতের খুঁটিটা থেকে সে যদি বেরিয়ে আসতে না পারে, তাহলে আর আড়াই ঘণ্টার মধ্যে…

'লয়েড…'

'কিরে, কিছু ভেবে পেলি ?'

'তোকে সাহায্য আনার জন্যে যেতে হবে', মুখ ঘুরিয়ে রিডের দিকে তাকালো গার্ভিন। 'কয়েকজন শক্ত সমর্থ লোক নিয়ে আসবি—যারা এ মালটাকে খানিকটা উঁচু করে তুলতে পারবে, যাতে আমি পা-টা এর নিচ থেকে বের করে আনতে পারি।'

ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়ালো রিড, 'ঠিক বলেছিস। এখান থেকে মাত্র পাঁচ-ছ মাইল দূরেই তো শহর। সেখানে হয়তো টম ফরম্যানকে পেয়ে যাবো। সে লোকটার পিঠ তো একেবারে বনমানুষের পিঠের মতো। আর জুলিয়াস…'

'লয়েড,' ওকে থামিয়ে দিলো গার্ভিন। এক হাতে কপালটা ঘষতে ঘষতে ধীরে সুস্থে বললো, 'লয়েড, গোড়ালিটাতে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। জোয়ারও এসে পড়েছে। দয়া করে তুই কি এবারে যাবি ? যা বলছি।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বলতে বলতে চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করলো রিড। কিন্তু অর্ধেকটা উঠেই ফিরে তাকালো গার্ভিনের দিকে, 'একটা

মজার কথা শুনবি ? আমি তোকে বলতে যাচ্ছিলাম, আমার জন্যে তুই এখানে অপেক্ষা করিস—কি কাণ্ড, অথচ তার তো কোন অর্থই হয় না !' নিজের জামার পকেটে চাপড় মারলো রিড, 'তোর কাছে সিগারেট আছে তো ? নাকি আমারটা তোকে দিয়ে যাবো ?'

খোলা জ্যাকেটের ভেতরে হাত ঢোকালো গার্ভিন। তার জামার পকেটেও সিগারেট ছিলো। কিন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় কাদায় সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

'যাবার আগে একটা দিয়ে গেলে ভালো হয়,' বললো সে।

ফের নেমে এসে গার্ভিনকে সিগারেটের প্যাকেট আর নিজের দেশলাইটা দিলো রিড, 'আমি ফিরে আসবো, রে। ততোক্ষণ ·· ততোক্ষণ তুই শুধু সাবধানে থাকিস।'

'আমি ঠিকই থাকবো।'

ফের চড়াই ভেঙে উঠতে শুরু করলো রিড। কিন্তু গার্ভিন তাকে পেছন থেকে ডাকলো, 'লয়েড, তুইও সাবধানে যাস। আমি যে এখানে আটকে পড়েছি, তা কিন্তু তুই ছাড়া আর কেউই জানে না···' কথাটা বলেই আচমকা অনুতাপবোধে নিশ্চুপ হয়ে গেলো সে।

'ঠিক আছে,' এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলো রিড, তারপর চড়াই ভেঙে উধাও হয়ে গেলো।

কান পেতে গার্ভিন শুনলো, সশব্দে রিডের গাড়ির দরজা বন্ধ হলো ··প্রাণ পেয়ে গর্জন করে উঠলো গাড়িটা···তারপর একটু একটু করে অতি দ্রুত মিলিয়ে গেলো সবটুকু শব্দের রেশ। কিছুক্ষণের জন্যে এক নিবিড় নৈশব্দ্য যেন গার্ভিনের ওপরে নেমে এলো। তারপর ক্রমশ তার ইন্দ্রিয়গুলো যেন শান দেওয়া ক্ষুরের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠায় বাতাসের শব্দ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো সে। দুরারোহ তীরভূমির প্রাণময় ওকগাছগুলোর ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে চলেছে নির্জন অস্থিরতায়, ফিসফিসে শব্দ জাগিয়ে তুলছে নয়ানজুলির কাঁপন লাগা দীর্ঘ ঘাসগুলোতে। নিঃসীম একাকীত্ববোধ আর অসহায়তার ক্লান্ত

অনুভূতি যেন একটা ভারি হাতের মতো গার্ভিনের হৃৎপিণ্ডে গুড়ি মেরে উঠে এলো।

লয়েড রিডের কথা চিন্তা করলো গার্ভিন। বিশ্বাস করে নিজের জীবনের ভার তুলে দেওয়া যায়—এমন লোক পছন্দ করে নিতে বললে, তার তালিকায় লয়েড অনেক নিচেই থাকতো। কিন্তু এটা কেন মনে হচ্ছে তার? তারা এক সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছে, জ্ঞান হবার পর থেকেই দুজন দুজনকে চেনে। তবু একটা অবিশ্বাসের অনুভূতি গার্ভিনকে যেন বিচিত্রভাবে সতর্ক করে তুলেছে। অথচ বন্ধুত্বের সঙ্গে বিশ্বাস, সমার্থক হওয়া উচিত। তবে কি লয়েড রিডের সঙ্গে তার সত্যিকারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, না কি সেটা দীর্ঘদিনের পরিচয় মাত্র?

নিচের দিকে তাকালো গার্ভিন। জল ইতিমধ্যে তার হাঁটু অব্দি উঠে এসেছে, আহত পা-টা সম্পূর্ণভাবে জলের তলায়। হাত তুলে, এই প্রথম, নিজের ঘড়ির দিকে তাকালো সে। এগারোটা পনেরো। মেরি এখন ওর বোন ইলিয়েনরকে নিয়ে গির্জায় রয়েছে। লয়েড গেছে মিনিট দশ-পনেরো আগে—তার মানে লয়েডের ফিরে আসতে আরও অন্তত বিশ মিনিট বাকি।

খাঁড়ির ওধার থেকে হঠাৎ একটা বনমুরগী ডেকে উঠলো, স্রোতের জলে সাঁতার কাটতে থাকা আর একটা পাখি সাড়া দিলো তৎক্ষণাৎ। এ জোয়ার শিকারের পক্ষে চমৎকার হতো। বাড়তি জল পুরো নয়ানজুলিটাকেই ঢেকে ফেলবে। কিন্তু পাখিদের পরিচিত কলস্বর শুধুমাত্র গার্ভিনের চরম একাকীত্বের অনুভূতিটাকেই বাড়িয়ে তুললো। এমন কি নাড়ির প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে ছলকে ওঠা তার গোড়ালির ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণাও গার্ভিনের মন থেকে যে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে পারছিলো না, তা হচ্ছে···

কি, সে চিন্তা?

এখন এটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই লয়েড সাহায্য নিয়ে ফিরে আসবে, গোড়ালির চিকিৎসার জন্যে তারা হাসপাতালে নিয়ে যাবে গার্ভিনকে। তবে কিছুদিনের জন্যে তাকে

ঢালাই করা পা নিয়ে থাকতে হবে, ক্রাচ নিয়ে হাঁটাচলা করতে হবে —এই যা।

ফের ঘড়িটা তুলে ধরলো গার্ভিন। মিনিটের কাঁটা সোজা নিচের দিকে নেমে এসেছে। সাড়ে এগারোটা।···এবারে হাত নামাতেই আঙুলে জলের স্পর্শ অনুভব করলো সে।

বাতাস এবং জলের শব্দকে ছাপিয়ে অন্য কোন শব্দ শোনার আশায় গলা উঁচু করে রইলো গার্ভিন।

কিন্তু কোথাও কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই।

আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে। ঈশানের ঝোড়ো মেঘে ধূসর হয়ে ওঠা আকাশের পথ বেয়ে একটা নিঃসঙ্গ সমুদ্রপাখি, হয়তো কোন সঙ্গীর সঙ্গে একত্রে মিলে ঝড় শেষের অপেক্ষায় থাকবে বলেই, হাওয়া কেটে তির্যক ভঙ্গিতে উড়ে চলেছে। হয়তো খিদের জন্যে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত ফের আকাশে গা ভাসাবে না পাখিটা।

অনাহত পা-টাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে অন্য পায়ে শরীরের ভর রাখতে যেতেই যন্ত্রণাটা যেন নতুন করে ফেটে পড়লো। আর বেশীক্ষণ এ যন্ত্রণা সইতে হবে না, এই যা রক্ষা। লয়েড গেছে তা অন্তত আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে।

জলের ঠাণ্ডা থেকে শরীরটাকে বাঁচানোর জন্যে কাদা মাখা জ্যাকেটের সামনের দিকটা টেনে ধরে, বোতামগুলো লাগিয়ে দিলো গার্ভিন। লয়েডকে নিয়ে এই এক মুশকিল—কিছুতেই কোনো কাজ সময় মতো করবে না। ওর ওপরে আদৌ আস্থা রাখা যায় না। হতভাগা কোনদিনই বিয়ে থা করেনি, একটানা ছমাসের ওপরে কোনো চাকরি-বাকরিও খুব কমই করেছে। বেপরোয়া গোছের জীবন কাটায় লোকটা, গা-ঢিলেমি করে এলোমেলো ভাবে কাজকর্ম করে, বর্তমানের মুহূর্তটা ছাড়া ওর অন্য কোন চিন্তা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে বলেও মনে হয় না।

নিকুচি করেছে! আমার অবস্থাটা কি ও বুঝতে পারছে না? গার্ভিনের মুখটা চিন্তিত হয়ে ওঠে। দেখে যেমন মনে হয়, লয়েড কি

সত্যিই তেমনি মানুষ ? না কি বছরের পর বছর ধরে গড়ে উঠেছে ওর বাইরের দিকটা ? মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গার্ভিনের। লয়েড সেদিন অফিসেই ছিলো আর মেরিও ঠিক তখনই সেখানে এসে হাজির হয়েছিলো। ওরা তখন সন্ত সন্ত এই সম্পত্তিটা কিনে নতুন বাড়ির সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। ·· গার্ভিনের মনে পড়লো, লয়েড তখন কিভাবে টেবিলের এক কোণে বসে বাড়ির রঙ এবং সাজ-সরঞ্জামের ব্যাপারে মেরির উত্তেজিত কথাবার্তা আর নৌকো ঘাটে নামানোর জন্মে রে-র একমুখো লাইন পাতার পরিকল্পনার কথা শান্তভাবে চুপচাপ শুনে গিয়েছিলো। মেরি যখন বিদায় নেয়, তখনও ওকে লক্ষ্য করেছিলো লয়েড এবং তার এক মুহূর্ত পরেই এক বিচিত্র নিঃসঙ্গ দৃষ্টি নিয়ে সে ফিরে তাকিয়েছিলো গার্ভিনের মুখের দিকে। 'তুই ভাগ্যবান, রে ! লক্ষ্মী বউ, ভালো ব্যবসা, নতুন বাড়ি, ব্যাঙ্কে টাকা—তুই যে কি সাংঘাতিক ভাগ্যবান তা তুই নিজেই ঠিকমতো জানিস কিনা, জানি না।' চোখ নামিয়ে একটা পেন্সিল দিয়ে টেবিলে মৃত্নু আঘাত করতে শুরু করেছিলো লয়েড। ফের যখন চোখ তুলে তাকিয়েছিলো, তখন তার কণ্ঠস্বরে যেন তিক্ততা ফুটে উঠেছিলো খানিকটা. 'তোকে আমার হিংসে হয়, ছোঁড়া !'···অবশ্য সে শুধু ক্ষণিকের জন্মে, এবং তক্ষুনি স্বাভাবিক চরিত্রে ফিরে গিয়েছিলো লয়েড। হৈ হৈ করে বলেছিলো 'নে নে, এবারে কাজকর্ম গোটা ! ট্রাউট শিকারের পক্ষে আজকের বিকেলের সব কিছুই একেবারে চমৎকার ! সত্যিকথা বলতে কি, এমন দিনে মাছগুলোরই লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে নৌকোয় উঠে পড়া উচিত।'

সেদিন কি মুহূর্তের ঝোঁকে কথাগুলো বলে ফেলেছিলো লয়েড ?··· কিংবা হয়তো মেরিই তার কারণ। উচু স্কুলের শেষ তু'বছরে মেরির সঙ্গে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছিলো লয়েড। অথচ আজ অব্দি সে ব্যাপারটাকে গার্ভিন আদৌ কোনো আমল দেয়নি।

ফের ঘড়ি দেখলো গার্ভিন। পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো লয়েড সাহায্যের সন্ধানে গেছে। ইতিমধ্যে খাঁড়ির জল বিস্ময়কর ভাবে বেড়ে

উঠে, এখন গার্ভিনের উরুর ওপরের অংশে পৌঁছে গেছে। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া স্পষ্টতই তার আর কিছু করার নেই। লয়েড আর ফিরে আসবে না, গার্ভিন ভাবলো—আমি যাতে মরি, সেজন্যেই লয়েড আমাকে এখানে রেখে চলে গেছে। এর পেছনে যুক্তি অবশ্যই আছে। সম্পূর্ণ অভাবিত এবং অপরিকল্পিত একটা সুযোগ লয়েডের কাছে এসে হাজির হয়েছে। ভাগ্য সামান্য একটু সদয় হলে সে গার্ভিনের জীবন, স্ত্রী, সম্পত্তি—সমস্ত কিছুই হস্তগত করে ফেলতে পারবে। মেরি ওকে পছন্দ করতো। আসলে কেউই ওকে অপছন্দ করে না। কিন্তু স্কুল জীবনে ওদের দুজনের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্কই ছিলো। কাজেই গার্ভিনের অবর্তমানে ওদের পুরনো প্রেম ধীরে ধীরে নতুন করে জ্বলে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়। মেরি একা একা জীবন কাটানোর মতো মেয়ে নয়। কাজেই কিছুদিন শোভনজনক বৈধব্য পালন করার পর লয়েডের সনির্বন্ধ অনুরোধে ··

আচমকা মুঠিবদ্ধ হাতে জলের বুকে ঘুষি ছুঁড়লো গার্ভিন, অক্ষমতার এক অসহায় অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো তার সমস্ত চেতনায়। কিন্তু এভাবে সে কিছুতেই মুখ বুজে চলে যাবে না—মেরির জন্যে যে করেই হোক তাকে একটা সাবধানী সঙ্কেত রেখে যেতে হবে···যাতে মেরি বুঝতে পারবে, এ ঘটনাটা সম্পূর্ণভাবে দুর্ঘটনা নয়।

কিন্তু ভুল কি হতে পারে না? লয়েডের যদি কিছু হয়ে থাকে?

ঘড়িতে বারোটা বেজে দশ মিনিট। জল এখন গার্ভিনের কোমর বরাবর। লয়েড সাহায্য নিয়ে আসুক বা না আসুক, আর ঘণ্টা দেড়েক বাদে গার্ভিনের তাতে আর কিছুই এসে যাবে না।

লয়েডের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের করে নিলো গার্ভিন। কিন্তু হাত কেঁপে পুরো প্যাকেটটাই জলে পড়ে গেলো।

'ধুস্ শালা···'

জোয়ারের তোড়ে প্যাকেটটার ভেসে যাওয়া লক্ষ্য করলো গার্ভিন। সিগারেটটা ধরিয়ে দেশলাইয়ের বাকি কাঠিগুলোও প্যাকেটটার দিকে ছুঁড়ে দিলো সে।

বুক ভরে একবার সিগারেটে টান দিলো গার্ভিন। তারপর বাতাসে এলোমেলো হয়ে মিলিয়ে যাওয়া ধোঁয়াগুলোকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবলো, এ যেন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া মানুষের শেষ ধূমপান।

আচ্ছা, লয়েড রিড কি করছে এখন? এই মুহূর্তে সে কি ঘড়ির দিকে নজর রেখে জোয়ারের জল কতোটা বাড়লো, তার হিসেব কষছে আর অপেক্ষা করছে? সত্যিই কি সে তা করতে পারে?

এখনও কতো কাজ বাকি!···গার্ভিনের বয়েস এখন ছত্রিশ। এতোদিন কঠিন পরিশ্রম করে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে গেছে সে। কৃপণতা করেনি আবার অমিতব্যয়ীও হয়নি। এখন অনেক কিছুর শেষ প্রান্তই তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে। এখানকার এই ভূ-সম্পত্তি, ওই নতুন বাড়ি—এও তার একটা বিরাট লক্ষ্যের শেষ প্রান্ত। এসব কিছুই সামনে পড়ে রইলো, আর সে একটা ফাঁদে আটকে রইলো একটা বুনো জন্তুর মতো।

জন্তুর মতো?···ঠোঁটের কয়েক ইঞ্চি দূরে সিগারেটটা নিয়ে যেন থমকে গেলো গার্ভিন। পাঁজরের নিচ দিয়ে ঘূর্ণী তুলে ছুটে চলা জল-স্রোতের দিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলো একবার। তারপর নিচু হয়ে পায়ের ওপরে আড়াতাড়ি ভাবে পড়ে থাকা ভারি বরগাটার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দেখলো। পরক্ষণেই ফের সোজা হয়ে, পকেট থেকে লম্বা ফলার ছুরিটা টেনে বের করলো সে। তারপর হাতলের খাপে ভাঁজ করে রাখা দীর্ঘ ফলাটার দিকে তাকালো।···কিছু কিছু জন্তু আছে, যারা নিজেদের ফাঁদে আটকে পড়া পা নিজেরাই কামড়ে শরীর থেকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু·· কিন্তু কোনো মানুষ কি সত্যি সত্যি নিজের পা···

দ্রুত হাতে ছুরিটা জ্যাকেটের পকেটে গুঁজে রাখে গার্ভিন। এখনও সময় আছে।···ঘড়ির দিকে তাকালো সে। একটা বাজতে কুড়ি। কিন্তু লয়েড যাবার পর দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় কেটে গেছে···এখনও সে ফিরছে না।

পরে আমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও লয়েডকে দেখতে পাই,

গার্ভিন ভাবলো, তাহলেই আমি সব কিছু বুঝতে পারবো। ওর চোখেই সব কিছু ফুটে উঠবে। হয়তো···হয়তো মেরিও তা দেখতে পাবে—হয়তো মেরিও বুঝে ফেলবে সব কথা।···

গার্ভিনের বুক অব্দি জল উঠে এসেছে। আর এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে জোয়ারের জল তার চিবুক ছাড়িয়ে যাবে। তখন এক ফোঁটা বাতাসের জন্যে প্রাণপণে ফাঁদে পড়া পা-টাকে টেনে তোলার অর্থহীন প্রচেষ্টা চালাতে হবে তাকে।

ফের ছুরিটাতে হাত রাখলো গার্ভিন। এটাই একমাত্র পথ। হয় এটা, নয়তো মৃত্যু।

মুখ ফিরিয়ে দুরারোহ তীরভূমির দিকে তাকালো গার্ভিন। এখান থেকে দেখা না গেলেও, খাঁড়ির ওই বাঁকটার কাছে দুটো ওক গাছের তলায় তার নতুন বাড়ি। বাড়ি থেকে এদিকে তাকালে বিস্তীর্ণ নয়ানজুলি আর দূরের নীল সমুদ্র ছবির মতো চোখের সামনে জেগে থাকে। বায়ুহীন নিস্তব্ধ রাতে খাঁড়ির জলে মাছের ঝাঁপ দেবার শব্দ শোনা যাবে ওখান থেকে, শোনা যাবে সমুদ্রের উথাল-পাথাল ঢেউয়ের ভেঙে পড়ার গর্জন। এক-পেয়ে মানুষের পক্ষেও সে সব দেখা বা শোনা সম্ভব। কিন্তু মরা মানুষ কিছুই দেখতে বা শুনতে পায় না।

আচমকা ওপরের দিকে গলা বাড়িয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলো গার্ভিন। একি কল্পনা, না সত্যিই কোনো ইঞ্জিনের আওয়াজ! হয়তো লয়েড ফিরে আসছে, কারণ শত হলেও···

আবার শোনা গেলো শব্দটা! বোঝা গেলো, ওটা দূর সমুদ্র দিয়ে ছুটে চলা কোন মোটর বোট, নদীর পথ বেয়ে বাতাসে ভেসে আসছে শব্দটা। নেহাৎ মূর্খই এমনধারা ঝোড়ো আবহাওয়ায় মাছ ধরতে বেরোয়। তবে কেউ একজন বেরিয়েছে, এটাও ঠিক।

সহজাত প্রবৃত্তি বশেই চিৎকার করে ওঠার ইচ্ছে হলো গার্ভিনের। কিন্তু সেটা যে অর্থহীন, তা-ও একেবারে স্পষ্ট। অন্তত সিকি মাইল দূরে রয়েছে নৌকোটা এবং বাতাস বইছে উলটো দিক থেকে।···

কাঁপা কাঁপা শেষ আওয়াজটুকুও অবশেষে মিলিয়ে গেলো, আরও নিথর নিশ্চুপ করে গেলো সমস্ত পরিবেশটাকে।

খানিকক্ষণ পরে, নৌকোটা যে সত্যিই চলে গেছে—এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে, জল থেকে ছুরিটা তুলে ধরলো গার্ভিন। কিন্তু আমি কি পারবো? গার্ভিন ভাবলো, হয়তো খুবই কষ্ট হবে···কিন্তু পারবো।

দু-হাতে ছুরিটা ধরে ফলাটা টেনে বের করলো গার্ভিন। বুড়ো আঙুল দিয়ে ফলাটা বুলিয়ে নিলো কয়েকবার। বেশ ধারালো।··· ভোঁতা ছুরি থাকা বা না থাকা—একই হতো।

বরগার ঠিক তলায় হাড়টা যেখানে ভেঙেছে, সেখান থেকেই যদি কাজটা নামিয়ে দিতে পারি···

হ্যাঁ, রক্ত তো বেরুবেই—যথেষ্ট রক্ত বেরুবে। গত বছর গরমের দিনে মাছ ধরার সময় এখান থেকে মাইল খানেক দূরে ধরা হাঙরটার কথা মনে পড়লো গার্ভিনের। ফুট আষ্টেক লম্বা ছিলো হাঙরটা।··· তবে এ বছরে, এখন এখানে হয়তো কোন হাঙর নেই। থাকলেও, এখানকার হাঙরগুলো হয়তো নরখাদক নয়।···

হাত নামিয়ে ফাঁদে আটকানো পা-টা স্পর্শ করলো গার্ভিন।··· গোড়ালিটা ফুলে উঠেছে, যন্ত্রণার আক্ষেপ কেমন যেন ভোঁতা। কিন্তু আঙুলের ডগাটুকু ছোঁয়াতেই ছুরি বেঁধানোর মতো তীব্র হয়ে উঠলো যন্ত্রণাটা।

আর দেরি নয়, জলদি করো! ঢিলেমি ছাড়ো এবারে। গার্ভিন নিজেকে বললো, কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসছে না··· জোয়ারের জল তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে না!

চারদিকে চোখ বুলিয়ে, মাথার ওপরে ফেরিঘাটটার দিকে নজর পড়লো গার্ভিনের। হাতে ছুরি ধরা অবস্থাতেই, আশ্চর্যজনক ভাবে এক টুকরো মৃদু হাসি তার মুখে ফুটে উঠলো। ক্রমশ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়লো হাসিটা এবং এক মুহূর্ত পরে প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করলো গার্ভিন।

ঘূর্ণী তুলে ঘোলাজলগুলো ক্রমশ খাঁড়ির বুক ভরাট করে তুলছিলো। তারপর এক সময় বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে দূর থেকে একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এলো। আঁকাবাঁকা পথে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটতে ছুটতে গাছ-গাছালির ফাঁক-ফোকড় দিয়ে একেবারে কাছাকাছি এসে পড়লো গাড়িটা। চালকের আসনে টম্ ফরম্যান, তার পাশে মাথায় সাদা পট্টি বাঁধা লয়েড রিড। পেছনের আসনে ডাক্তার স্যাণ্ডার্স আর জুলিয়াস ম্যাসন।

ফেরিঘাটের যতোটা কাছাকাছি আসা যায় এগিয়ে এসে, থমকে দাঁড়ালো গাড়িটা। চারটে দরজাই সপাটে খুলে গেলো, নেমে পড়লো মানুষগুলো। রিডই প্রথমে ফেরিঘাটে এসে উঠলো, তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো খাঁড়ির চতুর্দিক। কিন্তু শুধুমাত্র ভাঙা ঘাট আর জল ছাড়া কোথাও কিছু নেই।

'বড্ড দেরি হয়ে গেছে আমাদের! আমি জানতাম!'

'কোথায় ছিলো সে?' প্রশ্ন করলো ফরম্যান।

'নিচে,' আঙুল তুলে দেখালো রিড। 'কাঠের পাটাতনগুলো যেখানটাতে ধসে গেছে—ছাখো! ওখান থেকেই লোহার বরগাগুলো ভেঙে পড়েছে। ওহ্, সে এক বীভৎস ব্যাপার। রে ছিলো ঠিক ওর নিচটাতে…'

'ওহে!' আচমকা একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

শব্দটার দিকে ফিরে তাকালো ওরা চারজন।

ওদের নিচে, খাঁড়ির কূল ঘেষে, উঁচু পারে ঠেস দিয়ে বসেছিলো রে গার্ভিন। তার হাতে একটা লম্বা ছুরি, কাদামাখা জ্যাকেটটা পায়ের ওপরে ছড়ানো।

'তোর এতোটা দেরি হলো কেন, লয়েড?' জিগেস করলো সে।

'তুই…তুই বেঁচে আছিস…?' কর্কশ, প্রায় ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর রিডের। গার্ভিনের দিকে তাকিয়ে জ্যাকেটটার দিকে দৃষ্টি সরে গেল তার। 'কিন্তু…কিন্তু কি করে তুই…'

'আমি আগে প্রশ্ন করেছি, লয়েড। তোর কেন এতোটা দেরি হলো?'

ডাক্তার স্যাণ্ডার্স খাঁড়ির কিনারায় এগিয়ে এলেন, 'উনি বলেছিলেন, আপনি একটা লোহার বরগায় চাপা পড়ে আছেন। কেউ এসে আপনাকে বেরুতে সাহায্য করেছিলো নাকি?'

'না, কেউ না। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, লয়েডের কি হয়েছিলো?'

'আমাকে জোরে গাড়ি চালাতে হয়েছিলো, রে··গাড়িটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা পাইন গাছে ধাক্কা মারে।' দ্রুত হাত তুলে মাথায় বাঁধা পট্টিটা স্পর্শ করে রিড। 'আমি ছিটকে বাইরে পড়ে যাই। তারপর কতোক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিলুম জানিনা···'

'আমি জানি, কতোক্ষণ। প্রায় তিনঘণ্টা। আমার অবস্থায় পড়লে, তুই-ও তখন এক মনে সময়ের দিকে নজর রাখতিস। যখন তুই জোয়ার চাস না তখন জোয়ার যে কি তাড়াতাড়ি এসে পড়ে, তা দেখলে তুই অবাক হয়ে যাবি। মাথায় তখন নানান ধরনের চিন্তা আসে—মনে হয়, জল যখন নাকের ওপরে উঠতে শুরু করবে তখন কেমন লাগবে।'

ডাক্তার ভদ্রলোক ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এসে গার্ভিনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। 'দেখি, পা-টা একটু দেখতে দিন,' জ্যাকেটটা তুলতে শুরু করলেন উনি।

'এক মিনিট দাঁড়ান,' বললো গার্ভিন।

'কিন্তু পা-টা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে···'

'এক মিনিটের মধ্যেই সব রকমের চিন্তা তখন মাথায় এসে যায়,' গার্ভিনের দৃষ্টি লয়েড রিডের দিকেই স্থির হয়ে থাকে। 'এবং সব কথা চিন্তা করতে করতেই, এটার কথা ভাবলাম আমি।' লম্বা ছুরিটা উঁচু করে তুলে ধরে সে, ঝিকিয়ে ওঠে ইস্পাতের নগ্ন ফলাটা। 'মনে পড়লো, গল্প শুনেছিলাম—কি ভাবে কিছু কিছু ফাঁদে পড়া জন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে পা-টা কেটে নিজেদের মুক্ত করে নেয়।'

রিডের মুখটা হাঁ হয়ে যায়, চোখদুটো পিটপিট করতে থাকে। একবার ঢোক গিলে গার্ভিনের ঢেকে রাখা পা দুটোর দিকে হাত তুলে দেখায় সে। 'তার মানে…তুই…তুই তোর পা-টা কেটে বাদ দিয়েছিস…'

অন্য মানুষগুলো তাকিয়ে থাকে অপলক দৃষ্টিতে। আস্তে আস্তে ছুরিটা বন্ধ করে রাখে গার্ভিন, 'অনেকক্ষণ ধরেই কথাটা আমি চিন্তা করেছিলাম। অপেক্ষা করেছিলাম কেউ আসবে বলে, প্রার্থনাও করেছিলাম। আর পুরো সময়টাতেই জল বাড়ছিলো একটু একটু করে। আমার হাঁটু, কোমর, বুক পেরিয়ে জল আরও ওপরের দিকে উঠে আসছিলো—জলের বাইরে রাখার জন্যে হাত দুটোকে উঁচু করে তুলে রাখতে হয়েছিলো আমার।'

জ্যাকেটটার দিকে হাত বাড়ালেন ডাক্তার, 'আমাকে বরং এটা দেখতে দিন…'

ভদ্রলোকের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলো গার্ভিন, 'আমার মনে হয়েছিলো, হাড়টা বেশ ভালো মতোই ভেঙেছে, কাজেই কাজটা সেরে ফেলতে কোনো ঝামেলাই হবে না। যন্ত্রণার কথাটাও চিন্তা করেছিলাম—ভাবছিলাম, কাজটা করার সময় আমি সজ্ঞানে থাকতে পারবো কি না।'

'ওহ্, ঈশ্বর…' অস্ফুটে বললো রিড।

মৃদু হেসে ছুরিটা পাতলুনের পকেটে গুঁজে রাখলো গার্ভিন, 'কিন্তু তারপরেই আর একটা কথা মনে হলো আমার। এবং সে জিনিসটা এতোই সহজ যে আমার হাসি পেয়ে গেলো।'

'সে আবার কোন্ পদার্থ?' জিগেস করলো ম্যাসন।

'নৌকোটা, সেটা আমার পাশেই বাঁধা ছিলো।'

'এখন আর নেই।'

'খানিকক্ষণ আগে সেটা বাঁকের কাছে ভেসে গিয়েছিলো।'

'কিন্তু বাঁধা নৌকোটা কিভাবে…'

'ওটা ঘাটেই বাঁধা ছিলো, সত্যি। কিন্তু আমি হাত

বাড়িয়ে দড়িটা যথাসম্ভব লম্বা রেখে, ছুরি দিয়ে বাঁধনটা কেটে দিয়েছিলাম।'

ডাক্তার স্যাণ্ডার্সের চোখত্নটো চিকচিক করে উঠলো, 'নৌকোর দড়িটা আপনি বরগাটার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন, আর জোয়ারের জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটাও ওপরের দিকে ভেসে উঠেছিলো।'

'তা হলে···নৌকোটাই কি বরগাটাকে টেনে তুলে আপনাকে ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে এনেছে?' প্রশ্ন করলো ফরম্যান।

হাত বাড়িয়ে গার্ভিনের পায়ের ওপর থেকে জ্যাকেটটা তুলে নিলেন স্যাণ্ডার্স। ত্নটো পা-ই যথাস্থানে রয়েছে, শুধু ডান পা-টা একটা জায়গায় বিশ্রীভাবে বেঁকে গেছে।

'টম, তুমি গাড়ি থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে এসো। আর তোমাদের মধ্যে একজন কেউ গাড়ি নিয়ে গিয়ে, অ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করে এসো।' গার্ভিনের দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'এখান থেকে আপনাকে বোধ হয় স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়াটাই ভালো হবে।'

'বেশ।'

গার্ভিন নির্নিমেষে তাকিয়েই রইলো লয়েড রিডের দিকে। লয়েডের চোখে অপরাধের ছায়া। কোনো ভুল নেই।···

কালো রঙের ডাক্তারি ব্যাগটা নামিয়ে আনা হয়েছিলো। ব্যাগ থেকে একটা সিরিঞ্জ তুলে নিলেন ডাক্তার। তারপর গার্ভিনের একটা হাতের ওপরের অংশটা একটু ঘষে নিয়ে স্মুঁচটা ভেতরের দিকে ঠেলে দিলেন।

'এতে আপনার যন্ত্রণাটা অনেক সয়ে আসবে।'

অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নাড়লো গার্ভিন।

'লয়েড?'

'রে···আমি···' রিডের দৃষ্টি কেঁপে ওঠে, ওর মুখটা ফ্যাকাসে।

অভিযোগ করে কি লাভ?···রিডের মাথার আঘাতটা অবিশ্যি বাস্তব। কিন্তু তা ছাড়া ওর কোনো উপায় ছিলো না। কারণ ওটা না থাকলে অন্যদের মনে সন্দেহ জাগতো।···

কিন্তু আসল সত্যটা শুধু ওরা দুজনেই জানে।

'লয়েড···সিগারেটগুলো ভিজে গেছে। তোর কাছে আর আছে?'

থাক—ওই অপরাধবোধ মনে নিয়েই বেঁচে থাক ও···যদি তা পারে···

হাই টাইড : রিচার্ড হার্ডউইক

পদোন্নতি

পদমর্যাদায় নেহাতই সহযোগী ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও, আমার ভগ্নীপতি আরনল্ড স্ট্রং ছিলো স্থানীয় ব্যাঙ্কের সব চাইতে উচ্চ পদস্থ কর্তাব্যক্তি। আসলে দেশ জুড়ে ছড়ানো একটা বিরাট ব্যাঙ্কমালার মধ্যে দ্য ফস্টার ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ মিডওয়ে সিটি ছিলো সামান্য একটা শাখামাত্র এবং কোনো শাখার ম্যানেজারই, এমন কি বড়ো বড়ো শহুরে শাখার ম্যানেজাররাও, ভাইস-প্রেসিডেন্টের চাইতে উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী ছিলো না।

দিদি যদ্দিন বেঁচে ছিলো, তদ্দিন আরনল্ড স্ট্রঙের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দিব্যি জুতসই-ই ছিলো। কারণ আমি ছিলাম মেরির অত্যন্ত স্নেহের পাত্র এবং আরনল্ডও মেরিকে কক্ষনো আঘাত দিতে চাইতো না। আরনল্ডই আমাকে ব্যাঙ্কের চাকরিটা জুটিয়ে দিয়েছিলো, আমার প্রয়োজনমতো সে আমাকে মাঝে মাঝে কয়েক পাত্তি ধারটারও দিতো—এমন কি প্রথম বার হিসেবের খাতায় যখন আমার কয়েক শো ডলার ঘাটতি ধরা পড়লো, তখন আরনল্ডই সেটা মিটিয়ে দিয়েছিলো। অবিশ্যি সেজন্যে একটি অগ্নিগর্ভ বক্তিমে আমাকে শুনতে হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু গালিগালাজ শুনতে হয়নি। টাকাটা সে নিজের পকেট থেকেই মিটিয়ে দিয়েছিলো এবং ভবিষ্যতে আমি আর কোন দিনও ব্যাঙ্কের টাকা স্পর্শ করবো না, আমার তরফ থেকে এমন একটা

প্রতিশ্রুতিও মেনে নিয়েছিলো। তারপর দ্বিতীয় বার আমার হিসেবে কম না পড়া পর্যন্ত আরনল্ড আর সে প্রসঙ্গ তোলেনি।

ইতিমধ্যে আরনল্ড তখন বিপত্নীক হওয়ার দরুন, মেরির কথা ভেবে তার আর চিন্তিত হবার প্রয়োজন ছিলো না। এবারে আমার কম পড়েছিলো মোটে পঁচাত্তর ডলার, কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হলো যেন লাখ দশেকের ঘটনা। অকুস্থলেই আরনল্ড আমাকে প্রচণ্ড গালিগালাজ করলো, পঁচাত্তর ডলার মিটিয়ে দেবার জন্যে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলো এবং এ কথাও জানিয়ে দিলো যে টাকাটা মিটিয়ে না দিলে আমাকে সে কয়েদখানায় পাঠাবে। অতএব টাকাটা আমাকে একজন সুদখোর মহাজনের কাছ থেকেই ধার করতে হলো।

সত্যি কথা বলতে কি, অমন ভাবে গালিগালাজ করে আরনল্ড আমার একটা উপকারই করেছিলো। কারণ তারপরেই আমি ওর চাইতে একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেলাম। বুকি হ্যারি কুনৎজ. যার কাছে ধার হবার জন্যেই দু-দুবার আমার হিসেবে কম পড়েছিলো, আমাকে বিগ জো উরৎজের কাছে নিয়ে গেলো। বিগ জোর কাজ ছিলো, ছিনতাই করা ট্রাক থেকে গরম গরম মালপত্তর অন্যত্র সরিয়ে ফেলে, সেগুলোর বিলি বন্দেজ করা। হপ্তায় দুশো ডলার হিসেবে দু বছর আমি বিগ জোর সঙ্গেই কাজ করলাম। তারপর একদিন গরম গরম মাল শুদ্ধ, বিগ জোর একটা ট্রাক সোজা পুলিসের খপ্পরে গিয়ে পড়লো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তারা আমার নাগাল না পাওয়ায় আমার একমাত্র ক্ষতি হলো চাকরিটা খোয়ানো।

আচমকা একদিন আরনল্ডের সঙ্গে ফের যখন দেখা হলো, তখন আমার পয়সা-কড়ি ফুরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ব্যাঙ্কে আমাকে অশ্রাব্য তিরস্কার করার পর আরনল্ডের সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। সেটা হচ্ছে শহর থেকে মাইল দশেক দূরে টম-টম নামে একটা জায়গা। জায়গাটা এমন ধরনের, যেখানে ব্যাঙ্কের একজন পদস্থ আমলার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায় না। কোনো খদ্দের যদি খাদ্য তালিকা দেখতে চায় সেজন্যে যে সমস্ত জায়গায় পরিচারি-

কারা নিজেদের সঙ্গে পেন্সিল-টর্চ বয়ে নিয়ে বেড়ায়, টম-টম ঠিক তেমনি একটা জায়গা। তেমন ঘটনা অবিশ্যি খুব একটা ঘটে না, কারণ মানুষ খাওয়া-দাওয়া করার জন্যে ওখানে খুব কমই যায়। ওখানকার খদ্দের হতে হলে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে এবং ওখানে যারা চাকরি করে, সেই সমস্ত দু-নম্বরি মেয়েদের সঙ্গে ছোটো ছোটো খুপারগুলোতে জাপটাজাপটি করার জন্যেই তারা ওখানে যায়। অতিরিক্ত কিছু মূল্যের বিনিময়ে কোনো কর্মচারীকে অন্যত্র নিয়ে যেতে চাইলেও ওখানকার কর্তৃপক্ষ তাতে কোনো আপত্তি করেন না।

টম-টমের ভেতরটা এতো অন্ধকার যে, দু ফুটের চাইতে বেশি দূরে থাকলে কাউকে চিনতে পারা যায় না—যদিও বাইরের দিকটাতে দিব্যি ঝলমলে আলো। রাত দশটা নাগাদ আমি যখন ওখানে গিয়ে হাজির হলাম, ঠিক তখনই সামনের দরজাটা খুলে বছর তিরিশের একটি আকর্ষণীয়া, কিন্তু পলকা চেহারার মেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। মেয়েটির মাথায় বাদামী রঙের চুল, গায়ের রঙ ঘন, মুখে প্রসাধনের গাঢ় প্রলেপ, চোখে পুরু ম্যাসকারা এবং পরনে সবুজ রঙের আঁটসাঁট পোশাকের ওপরে একটা নকল ফারের চাদর। দেখেই চিনলাম, মেয়েটি টমটমের একটি পুরনো দু-নম্বরি মাল। মেয়েটির ঠিক পেছনেই বছর পঁয়তাল্লিশের একটি বলিষ্ঠ এবং সম্ভ্রান্ত চেহারার পুরুষ। পুরুষ মানুষটিকেও চিনতে পেরে আমি অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালাম।

'হ্যালো, আরনল্ড', বললাম আমি।

ওরা দুজনেই থমকে দাঁড়ালো। চকিতে আরনল্ডের মুখে যেন সামান্য রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে বলে মনে হলো আমার। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে এতোটুকুও জড়তা নেই।

'কেমন আছো, মেল?' জিগেস করলো সে।

'ভালোই,' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম আমি।

'এ হচ্ছে মিস টিনা ক্রাফোর্ড,' আরনল্ড বললো, 'আর টাইনি, ইনি আমার শ্যালক, মেলভিন হল।'

মেয়েটির চোখ দেখে বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পেরেছে।

আমরা কোনদিন একসঙ্গে কোন খুপরিতে ঢুকিনি বটে, কিন্তু ও বহুবারই আমাকে তেমন প্রস্তাব জানিয়েছে এবং সে কথা মনে করতে আমার এতোটুকুও কষ্ট হলো না। আমার উচ্চতা ছ ফুট এক ইঞ্চি এবং চল্লিশের দিকে এগিয়ে চলা মানুষের পক্ষে চেহারাটাও দিব্যি চমৎকার রয়েছে।

'আমার বিশ্বাস, এর আগেও আমাদের দেখা হয়েছে,' চেহারার মতো মেয়েটির কণ্ঠস্বরও একেবারে ধাতব-কর্কশ।

'হুঁ,' বললাম, 'তুমি কেমন আছো, টিনা?'

টিনা জানালো, ও ভালোই আছে এবং তারপর ওরা দুজনে এগুতে শুরু করলো। বাড়িটার কোণের দিকে গাড়ি রাখার জায়গায় ওরা মোড় ঘুরে চলে যাওয়া অব্দি আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে। দীর্ঘ আড়াই বছর বিপত্নীক হিসেবে ব্রহ্মচর্য পালন করার পর আমার রাশভারি ভগ্নীপতিটি যে আবার যৌবন সুলভ ফুর্তি লুটতে শুরু করেছে—এই চিন্তাটাই আমাকে যেন রোমাঞ্চিত করে তুলছিলো।

হঠাৎ মনে হলো, ফস্টার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অছি পরিষদ নিঃসন্দেহে তাদের একজন ম্যানেজারের এভাবে একটা বাজে মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা অনুমোদন করবেন না। এবং সে বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিলেই হয়তো আমার ভগ্নীপতিটি আমাকে সামান্য কিছু ব্যক্তিগত ধারটার দিতে রাজী হয়ে যাবে।

বাড়িটার দু ধারেই গাড়ি রাখার জায়গা। আরনল্ড ও টিনা যে দিকটাতে চলে গিয়েছিলো, আমার গাড়িটা দাঁড় করানো ছিলো তার ঠিক বিপরীত দিকে। টমটমে গিয়ে ঢোকার ব্যাপারে মত পালটে, আমি দ্রুত নিজের গাড়িটার কাছে ফিরে গেলাম। একটু পরেই বাড়িটার উলটো দিক থেকে একটা নীল রঙের সিডান গাড়ি বেরিয়ে এলো। চকিতের জন্যে দেখতে পেলাম, গাড়ির সামনের আসনে বসে রয়েছে টিনা আর আরনল্ড। বড়ো রাস্তায় উঠে শহরের বাইরের দিকে যাবার জন্যে ডান দিকে মোড় ঘুরলো গাড়িটা। ওদের পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যেতে দিয়ে, আমিও অনুসরণ করলাম গাড়িটাকে।

শহর থেকে আরও পনেরো মাইল পথ গাড়ি চালিয়ে এসে, ওরা মোড় ঘুরে একটা পাথুরে রাস্তায় উঠে পড়লো। সেই মুহূর্ত থেকে আমি মনে মনে আরও বেশি করে চক্রান্ত আঁটতে শুরু করলাম, কারণ ওই রাস্তাটা আমার চেনা। কয়েকটা খামারবাড়ি পেরিয়ে রাস্তাটা একটা নির্জন জঙ্গলের মাঝখানে শেষ হয়ে গেছে। রাস্তার একেবারে শেষপ্রান্তে গাছগাছালির আড়ালে বিশাল একটা দোতলা বাড়ি, যেটা থার্টি-থি ক্লাব বলে পরিচিত। তার এক তলায় একটা বৈধ নৈশ-ক্লাব আর দোতলাটা একটা বে-আইনী জুয়ার আড্ডা।

আমি যখন গাড়ি নিয়ে সামনের প্রাঙ্গণে গিয়ে উঠলাম, আরনল্ড ততোক্ষণে গাড়ি দাঁড় করিয়ে টিনাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। ওর গাড়িটা খুঁজে বের করলাম আমি। তারপর ওর গাড়ির পেছনে দ্বিতীয় সারিতে এমন একটা জায়গা পেয়ে গেলাম যেখানে আমার গাড়িটা রাখলে, মাঝখানকার এক সার গাড়ি আমাকে আড়াল করে রাখবে, অথচ সেখান থেকে আমি ওদের গাড়িটার দিকে নজর রাখতে পারবো। পাঁচ মিনিট সেখানেই গাড়িতে বসে অপেক্ষা করলাম আমি, তারপর ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

যথেষ্ট ভিড় থাকার দরুন বল নাচের জায়গাটাতে আমি যখন একটা চক্কর ঘুরে নিলাম, তখন কেউই আমাকে এতোটুকু খেয়াল করে দেখলো না। আরনল্ড এবং টিনা ওখানে নেই, পানশালাতেও নেই। এক তলায় রান্নাঘর ছাড়া আর কোন ঘর নেই বলে স্পষ্টই বোঝা গেলো, ওরা নিশ্চয়ই সোজা দোতলার জুয়ায় আড্ডায় গিয়ে ঢুকেছে। চিন্তা করে দেখলাম, বাজে মেয়েমানুষ নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো আরনল্ডের প্রায়ই জুয়ার আড্ডায় যাতায়াতের ব্যাপারটা তার অছি-পরিষদ অনুমোদন করবেন না। মনে মনে আমি ধারের অঙ্কটা বাড়িয়ে নিলাম। তারপর বাইরে নিজের গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আরনল্ড ও টিনা যখন বেরিয়ে এলো, তখন রাত সাড়ে বারোটা। ওদের সিডানটাকে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যেতে দিয়ে, আমি ওদের

অনুসরণ করলাম। সোজা শহরে ফিরে এসে নিজের বাড়ির গাড়ি-বারান্দা দিয়ে ঢুকে পড়লো আরনল্ড। রাস্তার উলটো দিকে গাড়ি রেখে আমি লক্ষ্য করলাম, ও গ্যারাজের দরজা বন্ধ করলো, তারপর পাশের দিকের আর একটা দরজার তালা খুলে টিনাকে নিয়ে ভেতরে উধাও হয়ে গেলো।

আরনল্ড ও মেরির কোনো বাচ্চাকাচ্চা হয়নি, বাড়িতে আরনল্ড এখন একাই থাকে। অতএব তার পক্ষে বাড়িতে মেয়েছেলে নিয়ে আসতে না পারার কোন কারণই নেই। তবে কিনা, যাজকদের মতো ব্যাঙ্কের আমলাদেরও নিন্দা-কলঙ্ক-অখ্যাতির উর্ধ্বে থাকার কথা। আমার মনে হলো, নিজের পদমর্যাদা এবং সুনামের কথা চিন্তা না করে আরনল্ড বড্ড বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এবং স্থির করলাম, আমার অনুমান যদি নির্ভুল হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার ব্যাঙ্কার ভগ্নীপতিটির কাছ থেকে বিনা বন্ধকীতেই হাজার ডলার ঋণ আদায় করে নিতে পারবো।

পরের দিন, মঙ্গল বার, বেলা দুটো নাগাদ আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলাম। আরনল্ডের ঘরে গিয়ে মাথা গলাতে সে ঠিক উৎসাহ নিয়ে আমাকে গ্রহণ করলো না বটে, তবে তাকে খুব একটা অখুশি বলেও মনে হলো না।

'এসো মেল, ভেতরে এসো,' ভ্রূ কুঁচকে দেখতে থাকা একটা চিঠি এক পাশে সরিয়ে রাখলো আরনল্ড।

পেছন দিকে দরজাটা বন্ধ করে আমি ওর টেবিলের সামনে একটা কুর্সি নিয়ে বসলাম। তারপর একটা সিগারেট এগিয়ে দিলাম ওর দিকে। আরনল্ড মাথা নাড়তে, আমি নিজেই একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা ওর টেবিলে রাখা নিষ্কলঙ্ক ছাইদানে ফেলে দিলাম।

'তারপর, কি মনে করে ?' জিগেস করলো আরনল্ড।

'ভাবছিলাম, আমাদের মধ্যে পুরনো রেষারেষির ব্যাপারটা এবারে মিটিয়ে ফেলা উচিত।' আরনল্ডের দিকে একরাশ ধোঁয়া ছুঁড়ে দিলাম আমি, 'শত হলেও আমাদের মধ্যে শালা-ভগ্নীপতির সম্পর্ক।'

'তোমার ওপরে আমি কোনো রাগ পুষে রাখিনি, মেল। তবে আমি আর কোনোদিনই তোমাকে চাকরিতে নেবো না, বা তোমাকে টাকা-কড়ি ধার দেবার ব্যাপারেও কোনো ইচ্ছে আমার নেই—মানে, তুমি যদি সেই উদ্দেশ্যে এসে থাকো। কিন্তু ভদ্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আগ্রহী। এমন কি কোনো চাকরির জন্যে তুমি সুপারিশি চিঠি চাইলে, আমি তা-ও তোমাকে দেবো—তবে সে চাকরিতে কাঁচা-পয়সার ব্যাপার থাকলে চলবে না!'

ওর দিকে আহত দৃষ্টিতে তাকালাম আমি।

'অন্য কোনো ব্যাঙ্কে আমি তোমার জন্যে সুপারিশ করবো, এটা তুমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারো না,' ফের বললো আরনল্ড। 'তবে যে কোনো সুপারিশ চাইতে হলে, সেটা তোমাকে তাড়াতাড়ি চাইতে হবে। কারণ আসছে কাল এখানে আমার শেষ দিন।'

'তুমি কি অবসর নিচ্ছো, নাকি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে অবসর? মোটেই না!' টেবিলে সরিয়ে রাখা চিঠিটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো আরনল্ড।

চিঠিটা লেখা হয়েছে ফস্টার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লেভেরেট শাখা থেকে। তাতে লেখা রয়েছে:

প্রিয় মিঃ স্ট্রং,

আপনার শেষ চিঠি অনুযায়ী আগামী সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, মিডওয়ে সিটি থেকে আসা বেলা দুটো-দশের ট্রেনে আমরা আপনাকে আশা করবো।

দুর্ভাগ্যক্রমে একটা পূর্ব-প্রতিশ্রুতি থাকার দরুন আমি স্টেশনে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। তাই আমাদের প্রধান হিসাব-রক্ষক মিস স্টেলা মার্শালকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পাঠাচ্ছি। লেভেরেট হোটেলে আমি আপনার জন্যে একখানা ঘর ভাড়া করে রেখেছি। আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী মিস মার্শাল আপনাকে গাড়িতে করে হোটেল অথবা ব্যাঙ্কে নিয়ে আসবে। আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে থাকবো—যদি

সোমবার বিকেলের দিকে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান, তাই কথাটা পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে রাখলাম। তা না হলে মঙ্গল বার আপনার সঙ্গে মিলিত হবার প্রতীক্ষায় থাকবো।

আমাদের পারস্পরিক পরিচিতি এবং আপনার সহকারী হিসেবে এক দীর্ঘ ও মনোরম সম্পর্কের জন্যে আমি আন্তরিক আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।

চিঠিতে সই করেছেন রেমণ্ড বার্ক, প্রধান কোষাধ্যক্ষ।

'ব্যাপারখানা কি?' চিঠিটা আরনল্ডকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

'আমাকে বদলি করা হয়েছে,' আরনল্ডের গলায় অবজ্ঞার সুর। 'লেভেরেট ব্র্যাঞ্চের ম্যানেজার মাত্র কিছুদিন আগে হৃদরোগের আক্রমণে মারা গেছেন। ওখানকার ভার নেবার জন্যে আমাকে পাঠানো হচ্ছে।'

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে না, তুমি এতে খুব একটা খুশি হয়েছো।'

'এটা অবশ্যই আমার পদোন্নতি, এবারে আমি পুরোপুরি ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হলাম। কিন্তু আমি এখানেই সুখী ছিলাম। সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদের ছেড়ে চলে যেতে আমার একেবারে বিশ্রী লাগছে।'

ভাবলাম, এর মধ্যে টিনা ক্র্যাফোর্ডও আছে। প্রকাশ্যে বললাম, 'ওখানকার ব্র্যাঞ্চেও নিশ্চয়ই তোমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আছেন?'

আরনল্ড মাথা নাড়লো, 'ওখানকার আগেকার ম্যানেজার বুড়ো স্যাম মরিসনকে আমি চিনতাম, কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন। তাছাড়া ওটা একটা নতুন ব্র্যাঞ্চ, সবেমাত্র মাসখানেক আগে ওখানকার কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ওখানকার কোনো কর্মচারীকেই আমি আগে দেখিনি, শহরের কারুর সঙ্গেও আমার বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই।'

আলটপকা একটা অদ্ভুত মতলব আমার মাথায় খেলে গেলো। জিগেস করলাম, 'একেবারে কাউকেই চেনো না?'

'লেভেরেটে আমি কস্মিন্‌কালেও যাইনি। এ রাষ্ট্র থেকে

লেভেরেটের দূরত্ব তিনশো মাইল। ওখান দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাবার মতো কোনো উপলক্ষ্যও এ যাবৎ আসে নি।'

মতলবটা আমার মনে শিকড় গেড়ে বসতেই, আমি ধার আদায়ের জন্যে ঝঞ্ঝাট পাকাবার মতলবটা সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। জিগেস করলাম, 'কিন্তু গাড়িতে না গিয়ে ট্রেনে যাওয়া ঠিক করলে কেন?'

'গাড়িটা এখানেই বিক্রি করে যাচ্ছি, ওখানে গিয়ে আবার নতুন গাড়ি কিনবো। বাড়ি আর আসবাবপত্রগুলোও ইতিমধ্যে বিক্রি করে দিয়েছি। ভাগ্য ভালো, তাই এমন একজন খদ্দেরকে পেয়ে গেলাম যে আসবাবে সাজানো একটা বাড়িই খুঁজছিলো। নতুন মালিকের কাছে আলাদা চাবি রয়েছে, কাজেই সোমবার সকালে আমার শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেই হলো।'

'সোমবার কটার সময় তোমার ট্রেন ছাড়ছে?'

'ভোর সাড়ে পাঁচটায়। কেন?'

'অতীতে তুমি আমার কয়েকটা উপকার করেছিলে। আমি তোমাকে বাড়ি থেকে গাড়িতে করে স্টেশনে পৌঁছে দেবো।'

'ধন্যবাদ, কিন্তু আমি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে রেখেছি।'

আমার মনে যা ছিলো তার জন্যে সত্যি বলতে কি, ওকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। তাই সে প্রসঙ্গটা আমি চেপেই গেলাম। সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাত এগিয়ে দিলাম ওর দিকে।

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি, আরনল্ড। যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হলো বলে খুব ভালো লাগছে।'

আরনল্ডও কুর্সি ছেড়ে উঠে আমার হাতে আন্তরিক ঝাঁকুনি দিলো, 'ধন্যবাদ, মেল। আমিও তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। তোমাকে সুপারিশ করার প্রস্তাবটা কিন্তু এখনও বহাল রয়েছে।'

'তার আর দরকার হবে না। আমার দিনকাল ভালোই কাটছে। স্রেফ মন কষাকষির ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম।'

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আমি রিভারভিউ পয়েন্টে গিয়ে হাজির হলাম। তারপর গাড়িটা এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে, নদীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আরনল্ডের অফিসে বসে যে কথাটা আচমকা আমার মাথায় খেলে গিয়েছিলো, এখন পরিকল্পনাটা দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ক্রমশ অনেক কম উদ্ভট এবং অনেক বেশি কার্যকর বলে মনে হতে লাগলো।···যেহেতু আরনল্ড লেভেরেটের কাউকে চেনে না, অতএব সেখানকার কোনো লোকও আরনল্ডকে চেনে না। তিন বছর ব্যাঙ্কে কাজ করার দরুন ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার এমন জ্ঞান যথেষ্টই হয়েছে, যাতে আমি অন্তত কয়েকটা দিন অন্যের পরিচয় নিয়ে কাজ হাসিল করে ফেলতে পারি। এবং সেজন্যে কয়েকটা দিনের চাইতে বেশি সময়ও আমার লাগবে না।

খুব স্বাভাবিক কারণেই একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ব্যাঙ্কের কোষাগারে গিয়ে ঢুকতে পারে, কোষাগারের দরজা খোলার সংখ্যা-রাশিও তার জানা থাকে, এমন কি ব্যাঙ্কের চাবিও তার কাছে থাকে। কাজেই ঠিক মতো চলতে পারলে আমি সহজেই ওখান থেকে আমার ভাগ্য পালটে বেরিয়ে আসতে পারবো এবং চুরির ব্যাপারটা আবিষ্কৃত হবার আগেই নির্বিবাদে দেশ থেকে সটকে পড়তে পারবো। কিন্তু একমাত্র মুশকিলের ব্যাপার হচ্ছে, খুন করা ছাড়া পরিকল্পনাটা কাজে লাগাবার মতো সম্ভাব্য কোনো পথই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।··· চিন্তায় চিন্তায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে শুরু করলো, তবু সমস্যাটার ফয়শালা করে উঠতে পারলাম না। শেষ অব্দি এই ভেবে মনস্থির করে ফেললাম যে, মোটা বাজীর জন্যে বড়-সড়ো ঝুঁকি নেওয়া যায়। তাছাড়া বিশেষ করে আরনল্ডকে আমি মোটেই পছন্দ করি না।

আমার প্রথম সমস্যা হলো, আমার ভগ্নীপতিটিকে এমন ভাবে সরিয়ে ফেলতে হবে, যাতে তার উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা কেউ জানতে না পারে। অতএব এ দিকটাতেই আমি মনোযোগ ঢেলে দিলাম। বুঝতে পারলাম, আমার এ কাজটার সময়সূচী নির্ভর করছে

আরনল্ডের সপ্তাহান্তিক পরিকল্পনার ওপরে। কারণ, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—আরনল্ডকে বিদায় অভিনন্দন জানানোর জন্যে ব্যাঙ্কের তরফ থেকে শনিবার রাত্রে যদি কোনো ভোজসভার আয়োজন করা হয় এবং সব চাইতে সম্মানিত অতিথিটিই যদি সেখানে হাজির না হয়, তাহলেই তো ঝামেলার একশেষ!···তবে আরনল্ডের পরিকল্পনাটা কি—তা জানতে পারার সহজতম উপায় হচ্ছে, আরনল্ডকে জিগেস করা। তাই সাড়ে আটটার সময় আমি বাড়িতেই ওকে ফোন করলাম। ও সাড়া দিতেই বললাম, 'আরনল্ড, আমি মেল বলছি। দ্যাখো, আমি ভাবছিলাম যে অতীতে তুমি আমার জন্যে যতো উপকার করেছো, তার জন্যে আমি তোমার কাছে অনেকখানি ঋণী। তাই তুমি এখান থেকে চলে যাবার আগে আমি তোমাকে নিয়ে রাতের খানাপিনার জন্যে একটু বেরুতে চাই। নাকি শনি রবি দুদিনই তুমি নেমন্তন্নে বাঁধা পড়ে আছো?'

'না, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা গত শনিবারই আমাকে খাইয়ে দিয়েছে। তবে কিনা, শনি-রোববারে আমি শহরেই থাকছি না।'

'সে কি? আমি তো ভেবেছিলাম, তুমি সোমবারের আগে এখান থেকে যাচ্ছো না।'

'তা যাচ্ছি না বটে, তবে বেমুস হ্রদে মাছ ধরতে যাচ্ছি। গাড়িটা আমি কয়েক ঘণ্টা আগে বিক্রি করে দিয়েছি, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা আপাতত আমার হেফাজতেই রাখতে রাজী হয়েছেন—সোমবার দিন কোনো এক সময়ে উনি সেটা নিয়ে যাবেন। গাড়িটা নিয়ে কাল সন্ধের সময় আমি বেমুস অব্দি যাচ্ছি, রোববার সন্ধ্যার আগে ফিরছি না। কিন্তু তারপর আর বোধহয় ফুর্তি করার মতো মেজাজ থাকবে না, কারণ সোমবার আমাকে ভোর সাড়ে পাঁচটার ট্রেন ধরতে হচ্ছে।'

'তাহলে তো সেটা আর হচ্ছে না,' কণ্ঠস্বরে বিষাদের সুর ফোটালাম আমি। 'মাছ ধরার জন্যে তোমার সঙ্গে আর কে যাচ্ছে?'

'কেউ না, আমি একাই যাচ্ছি।'

মতলবটা তাহলে সুন্দরভাবেই খেটে যাচ্ছে। বললাম, 'হৃদে তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।'

'ধন্যবাদ,' বললো আরনল্ড। 'আর নেমন্তন্ন করার জন্যেও ধন্যবাদ, যদিও আমি সেটা নিতে পারছি না।'

গ্রাহযন্ত্র রেখে দিয়ে আমি পরিকল্পনার প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস ভালো মতো ভেবে নিলাম। তারপর বিছানায় শুয়ে সারারাত দিব্যি মৌজসে ঘুমোলাম।

শুক্রবার দিন সকালে একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান থেকে আমি কিছু কেনাকাটা সেরে নিলাম। কিনলাম কাচের শার্সি আটকে রাখার চারটে ওজন আর ফুট বারো শক্ত দড়ি, যার ওপরে জানলার কাচের ফ্রেমগুলো ঝুলিয়ে রাখা হয়। জিনিসগুলো আমার গাড়িতে মালপত্তর রাখার জায়গায় একত্রে রেখে দিলাম। পাছে শেষ দিন আরনল্ড তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ে, আমি তাকে মুঠোয় পাবার আগেই পাছে সে বেমুসে রওনা হয়ে গিয়ে আমার পরিকল্পনাটা পুরোপুরি ভেস্তে দেয়—তাই তাকে চোখে চোখে রাখবো বলেই ঠিক করলাম।

বেলা ছুটোর সময় ব্যাঙ্কের উলটো দিকে একটা গাড়ি রাখার জায়গায় আমি আমার গাড়িটা দাঁড় করালাম। ব্যাঙ্কের গাড়িগুলো যেখানে রাখা হয়, আরনল্ডের সিডানখানা সেখানেই ছিলো। সাড়ে চারটের সময় কেরানীর দল পিলপিল করে ব্যাঙ্ক থেকে বেরুতে শুরু করলো এবং পাঁচটার মধ্যে অধিকাংশ কর্মচারীই চলে গেলো। আরো দশমিনিট পরে নরম্যান ব্র্যাডির সঙ্গে একত্রে বেরিয়ে এলো আরনল্ড।

গাড়ি রাখার জায়গা অব্দি হেঁটে এলো ওরা, নরম্যান ব্র্যাডির গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বললো খানিকক্ষণ। তারপর আরনল্ডের হাত ঝাঁকিয়ে ব্র্যাডি তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, আরনল্ড এগিয়ে গেলো নিজের গাড়ির দিকে। ওদের গাড়ি ছুটো চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইলাম আমি।

আরনল্ডের বাড়িতে গ্যারাজের দরজাটা খোলাই ছিলো।

সিডানটা গ্যারাজের ভেতরে। দরজার ঘন্টি বাজাবার বেশ কয়েক মিনিট পরে দরজাটা খুলে, আমাকে দেখে অবাক হয়ে গেলো আরনল্ড।

'আমি ওপরতলায় জিনিসপত্র গোছগাছ করা শেষ করছিলাম।' আরনল্ড বললো, 'দুঃখিত, তোমাকে এতোক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। এসো, ভেতরে এসো।'

আমি ভেতরে ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ করে দেয় আরনল্ড। লক্ষ্য করি, ওর পরনে এখনও সেই স্যুট, গলায় টাই বাঁধা। নিজের ঘরে ঢুকে আমি প্রথমেই স্বস্তি পেতে চাই, কিন্তু আরনল্ড চিরদিনই খানিকটা রীতিসর্বস্ব। বললাম, 'তুমি যা করছিলে, করো গে। আমি শুধু তোমাকে বিদায় জানাতেই এসেছি।'

'তুমি যখন ঘন্টিটা বাজালে, আমি তখন শেষ স্যুটকেসটা বন্ধ করছি। এখন সব কাজ শেষ। তবে আমি তোমাকে কোনো পানীয় দেবার প্রস্তাব করতে পারছি না, কারণ আসবাবগুলো ছাড়া আর সব কিছুই গোছানো হয়ে গেছে।'

'আরে, ঠিক আছে—' ধীর পায়ে সামনের ঘরটাতে গিয়ে ঢুকলাম আমি।

খানিকটা অনিশ্চিত ভাবে আমাকে অনুসরণ করলো আরনল্ড।

'বাড়িতে কেউ আছে নাকি?' জিগেস করলাম, 'মানে, অন্য কেউ?'

'না,' হতভম্বের মতো আমার দিকে তাকালো আরনল্ড। 'আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি বেরিয়ে পড়বো বলে ঠিক করছিলাম।'

স্মিতমুখে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপরেই যথা সম্ভব শক্তি সঞ্চয় করে ওর ঘাড়ের পাশে ক্যারাটের যে চপখানা ঝাড়লাম, তার জন্য ও সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলো। একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লো আরনল্ড, মুখটা অভিব্যক্তিহীন হয়ে উঠলো, তারপর মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

সজোরে ছুটে আসা ক্যারাটের একখানা চপ যে কোনো মানুষকেই

ঘাড় মটকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আরনল্ডের গর্দানটা নিশ্চয়ই খুব শক্তপোক্ত ছিলো। কারণ আমি যখন ওর পিঠের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখনও ওর শ্বাসপ্রশ্বাস বইছিলো। ওর নাকে আর একটা চপ ঝাড়তেই অনুভব করলাম, আমার শক্ত করে রাখা হাতের তালুর নিচে ওর নাকের হাড়টা গুঁড়ো হয়ে ভেঙে গেলো। প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া ওর হাঁটুছুটোকে বুকের কাছে গুটিয়ে আনলো, তারপরেই শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো আরনল্ডের।

মেঝে থেকে উঠে ভালো করে দেখে নিলাম, সামনের পেছনের আর পাশের দরজাগুলো ঠিক মতো চাবি বন্ধ করা আছে কিনা। তারপর ফিরে এলাম লাশটার কাছে। ওকে পাশ ফিরে শুইয়ে দিয়ে ওর পকেট থেকে ওয়ালেটটা বের করে দেখি, তার মধ্যে অনেক কাগজপত্র রয়েছে। নিজেকে আরনল্ড স্ট্রং হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এগুলো আমার কাজে আসবে। গাড়ির চালকের অনুমোদনপত্রে আরনল্ডের যে বর্ণনা দেওয়া আছে সেটা অবিশ্যি আমার সঙ্গে মেলে না, কিন্তু একমাত্র পুলিস ছাড়া আর কেউই ওসব পড়ে দেখে না। এসব ছাড়াও ওয়ালেটের মধ্যে শ ছুয়েকের ওপরে ডলার-নোট রয়েছে। ...আমার নিজের ওয়ালেটটা ভেতরের বুক-পকেটে রেখে, আরনল্ডেরটা পাতলুনের পেছনের পকেটে রেখে দিলাম। ওর কোটের পকেটে গাড়ির চাবি ছাড়া আরও একগোছা চাবি পাওয়া গেলো। সেগুলো পাশ-দরজাতে লাগছে দেখে, ছুটো গোছাই আমি পকেটস্থ করলাম।

ওপরের তলায় শোবার ঘরে ছুটো সুটকেস আর একটা ঝোলানো ব্যাগ রয়েছে দেখলাম। আরনল্ডকে আমি যে ব্রিফকেসটা বইতে দেখেছি, সেটা রয়েছে বিছানার ওপরে। মনে হলো, ওটার মধ্যে হয়তো এমন কিছু কাগজপত্র থাকতে পারে যেগুলোর সম্পর্কে ফস্টার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লেভেরেট শাখার নতুন ম্যানেজারের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত। কিন্তু ব্রিফকেসটা ফাঁকাই ছিলো।

ছুবার ওঠা-নামা করে মালপত্তর আর ব্রিফকেসটা নিচের তলায় নামিয়ে আনলাম। তারপর, যেহেতু অন্ধকার ঘন না হওয়া অব্দি

আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা লাশের কাছে বসে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার নেই—তাই পাশ দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলাম।

রাত এগারোটা বাজার ঠিক আগেই নিজের গাড়িটা নিয়ে ফের আমি পাশ-দরজাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তারপর শার্সির ওজন আর দড়িগুলো নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে. খানিকক্ষণ সাবধানে কান পেতে রইলাম। সমস্ত বাড়িটাতে নিকষ কালো অন্ধকার। দেশলাইয়ের সাহায্যে একটা লম্ফ খুঁজে নিয়ে, সেটা ধরিয়ে নিলাম আমি। দেখলাম আরনল্ডকে যেমন ভাবে রেখে গিয়েছিলাম, ও ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে রয়েছে।

দ্রুত হাতে লাশটা থেকে পোশাক-আশাকগুলো খুলে নিলাম। সুটকেস দুটো নাড়াচাড়া করে মনে হলো, অপেক্ষাকৃত হালকা সুটকেসটার মধ্যেই হয়তো বেশি জায়গা হবে। তাই সেটা খুলে, তার মধ্যে আরনল্ডের জামা পাতলুন আর অন্তর্বাসগুলো ঢুকিয়ে ফেললাম। কিন্তু ওর কোট এবং জুতোজোড়া ঢোকানোর জায়গা আর হলো না—এমনিতেই সুটকেসটার ওপরে চেপে বসে, তবে ওটাকে বন্ধ করতে হলো। কোটটা দ্বিতীয় সুটকেসটার মধ্যে দলামোচা করে কোনমতে গুঁজে রাখা গেলো। কিন্তু তাতেও জুতোজোড়া রাখার জায়গা জুটলো না। তারপরেই ব্রিফকেসটার কথা মনে পড়লো আমার এবং তাতেই সমস্যাটা মিটে গেলো।

উলঙ্গ লাশটার দু হাত এবং দুপায়ের সঙ্গে আমি শার্সির ওজন-গুলো বেঁধে নিলাম। তারপর পাশ-দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে, আমার গাড়ির মাল রাখার জায়গাটা খুলে, চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। পাশের বাড়িতে আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু সেটা অন্ততপক্ষে ফুট পঞ্চাশেক দূরে। জানলা দিয়ে সে আলোর দ্যুতি এতোদূর অব্দি এসে পৌঁছচ্ছে না। এ বাড়িতেও একমাত্র সামনের ঘরে আমি একটা লম্ফ জ্বেলেছিলাম। কাজেই খোলা পাশ-দরজা দিয়ে এক ফোঁটা আলোও বাইরে চুইয়ে আসছে না।

আমি যথেষ্ট শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু লাশটা গাড়ির মাল রাখার জায়গায় নিরাপদে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে আমিও রীতিমতো ঘেমে উঠলাম। আরনল্ডের মালপত্র আর ব্রিফকেসটাও গাড়ির পেছনের আসনে নিয়ে রাখলাম। তারপর ভেতরের আলোটা নিভিয়ে পাশ-দরজায় চাবি লাগাতেই মনে হলো, আরনল্ড হয়তো মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো সিডানের পেছনে তুলে রেখেছিলো। গাড়ির নতুন মালিকের কাছে সেটা হয়তো বিসদৃশ বলে মনে হবে এবং এ ধরনের কোনো ফস্কা গেড়ো রেখে যাবারও কোনো মানে হয় না। অতএব সেটাও খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেলো না। সম্ভবত আরনল্ড ওগুলোকে গ্যারাজের মধ্যেই কোথাও জড়ো করে রেখেছে। কিন্তু গ্যারাজের আলো জ্বালার ঝুঁকি নিতে ভরসা হচ্ছিলো না বলে, আমি আর সে চেষ্টাটা করে দেখলাম না। তার বদলে গাড়ির চাবিটা গাড়ির মধ্যেই যথাস্থানে রেখে গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে দিলাম।

মাঝরাতে রিভারভিউ পয়েন্ট সেতুতে যানবাহনের আনাগোনা প্রায় থাকে না বললেই চলে। সেতুর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আমি যখন গাড়িটা দাঁড় করলাম, তখন আমার পেছন দিকে কোনো হেডলাইটের চিহ্ন নেই—শুধু সামনের দিক থেকে একজোড়া আলো এগিয়ে আসছিলো তীব্রগতিতে। গাড়িটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া অব্দি আমি অপেক্ষা করে রইলাম—তারপর গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে এসে, পেছন দিকে মাল রাখার জায়গাটার ডালা খুলে ফেললাম।...লাশটা সবেমাত্র বেষ্টনীর ওধারে ছুঁড়ে ফেলেছি, ঠিক তখনি পেছন দিকে সিকি মাইল দূর থেকে একজোড়া হেডলাইটের আলো সেতুটার ওপরে ছড়িয়ে পড়লো। সেতুর নিচে জলের ছিটকে ওঠার শব্দ আর গাড়ির পেছনের ডালা বন্ধ করার আওয়াজ প্রায় একই সঙ্গে মিশে গেলো। পেছনের গাড়িটা যখন সাঁ করে বেরিয়ে গেলো, আমি তখন নিজের গাড়ির হুডটা টেনে তুলছি—যেন ইঞ্জিনে কিছু গড়বড় হয়েছে।... আরনল্ডের মালপত্র আর ব্রিফকেসটা জলে ফেলার সময় অবিশ্যি অন্য কোনো গাড়ি এসে হাজির হয় নি।

রাত একটার মধ্যে আমি বাড়িতে ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। শনিবার সকালে একটা পুরনো গাড়ির দোকানে গিয়ে গাড়িটাও বিক্কিরি করে দিলাম। তারপর আরনল্ডের গাড়ি চালাবার অনুমতি-পত্রে ওর যে সই ছিলো, সেটা দেখে দেখে শনিবারের বাকি সময়টা আর সমস্ত রোববারটা আরনল্ডের সই অভ্যেস করে করে কাটিয়ে দিলাম। নিজেরই মনে হচ্ছিলো, হয়তো এটা একটা অপ্রয়োজনীয় সাবধানতা। তবে আরনল্ড আমাকে দেখিয়েছিলো, লেভেরেট শাখার প্রধান কোষাধ্যক্ষের সঙ্গে তার চিঠি চালাচালি হয়েছে। কাজেই আমাকে কোথাও সই করতে হলে, সে লোকটা হয়তো দুটো সইয়ের প্রভেদ ধরে ফেলতে পারে।

নিজের পোশাক-আশাক ছাড়া আমার গোছগাছ করার মতো তেমন কিছুই ছিলো না। রোববার রাত্তিরে বাড়িওয়ালীকে জানিয়ে দিলাম, আমি বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি এবং সোমবার সকাল পৌনে পাঁচটার সময় একটা ট্যাক্সি আমাকে আর আমার স্যুটকেস দুটোকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেলো।

ট্রেনের মধ্যে, আট ঘণ্টার ওপরে, দুশ্চিন্তা করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিলো না এবং ফলে আমার পরিকল্পনাটার মধ্যে হাজারটা লুকনো বিপদের কথা আমি ভাবতে শুরু করলাম। ধরা যাক, লেভেরেট শাখার কোন কর্মচারী যদি মিডওয়ে সিটির পূর্বতন বাসিন্দা হয়ে থাকে এবং আমি বা আরনল্ড যদি তার মুখ-চেনা হয়ে থাকি? কিংবা অছি পরিষদের কোনো সদস্য যদি একবার লেভেরেট শাখায় যাবেন বলে মনস্থ করে থাকেন? এমন কি পরিচালকমণ্ডলীর কোনো সদস্য বা মিডওয়ে সিটি শাখা থেকে অন্য যে কেউ যদি শুধুমাত্র কথা বলার জন্যেও আরনল্ড স্ট্রংকে টেলিফোন করে, তাহলেই তো আমার ছদ্ম পরিচয়টা ধরা পড়ে যাবে—কারণ আমার কণ্ঠস্বর আদৌ আরনল্ডের কণ্ঠস্বরের মতো শোনায় না। ইতিমধ্যে খুন-খারাবিটা করে না ফেললে, হয়তো পুরো মতলবটাই আমি বাতিল করে দিতাম। আসলে এদেশ থেকে আমার সটকে পড়ার সঙ্কল্পটা ছিলো অতিমাত্রায়

দৃঢ়, কিন্তু কপর্দকহীন অবস্থায় কেটে পড়ার ইচ্ছে আমার একটুও ছিলো না।

শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কে যতোটা সম্ভব কম সময় কাটাবো, এই ভেবে আমি কোনোক্রমে নিজেকে শান্ত করলাম। মঙ্গলবার সকাল অব্দি আমি প্রথমবার ব্যাঙ্কে যাওয়াটা স্থগিত রাখবো এবং কোষাগার খোলার সংখ্যারাশি ও প্রয়োজনীয় চাবিগুলো একবার হাতে পেলে, নিজের সুবিধে মতো অসুস্থ হয়ে পড়ে, আসল কাজটা শুরু করার জন্যে তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হোটেলের ঘরেই বন্দী হয়ে থাকবো।

প্রধান হিসেব-রক্ষক স্টেলা মার্শাল একটি সুগম্ভীর, মাঝবয়সী, কুমারী মহিলা। আমাকে দেখে উনি কোনোরকম বিস্ময় প্রকাশ করলেন না—তার মানে একটা বাধা অতিক্রম করা গেলো। আরনল্ডের চাইতে বয়সে আমি ছ বছরের ছোট। নতুন ম্যানেজারের বয়সটা অন্তত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জানা উচিত ছিলো, কারণ আরনল্ড স্ট্রংকে নিয়ে তাদের মধ্যে কিছু কিছু আলাপ-আলোচনা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হয় সে সমস্ত কথা স্টেলা মার্শালের মনে ছিলো না, নয়তো আমাকে উনি একটি পঁয়তাল্লিশ বছরের যুবক বলেই ধরে নিয়েছিলেন।

ওঁকে আমি জানালাম, ঠাণ্ডা লাগার দরুন আমার শরীরটা খুবই খারাপ হয়েছে এবং আজ আর ব্যাঙ্কে যাবার মতো অবস্থা আমার নেই। অতএব উনি আমাকে গাড়িতে করে লেভেরেট হোটেলেই নিয়ে চললেন।

পথে যেতে যেতে স্টেলা মার্শাল বললেন, 'এখানে পাকাপাকি ভাবে বাস করার ব্যাপারে আপনার কি ধরনের পরিকল্পনা আছে, মিঃ বার্ক তা কিছুই জানেন না। তাই বাড়ি বা ফ্ল্যাট পাবার জন্যেও উনি কোনো চেষ্টা করেন নি।'

'হোটেল থেকে ব্যাঙ্কটা কতোদূরে?' জিগেস করলাম।

'মাত্র দেড়খানা বাড়ি পরেই।'

'তাহলে আপাতত আমি হোটেলেই থাকবো। জানেনই তো, আমার পরিবার-পরিজন বলতে কিছু নেই।'

'হ্যাঁ,' উনি বললেন, 'মিঃ বার্ক আমাকে বলেছেন, আপনি বিপত্নীক।'

তারপর স্টেলা মার্শাল আমাকে হোটেলে নামিয়ে দিলেন, পরদিন সকালে গাড়িতে করে ব্যাঙ্কে নিয়ে যাবার প্রস্তাবও দিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কটা খুবই কাছে বলে আমি ওঁকে বললাম যে, আমি বরঞ্চ হেঁটেই যাবো।

পরদিন সকাল ঠিক নটার সময় ব্যাঙ্কে গিয়ে পৌঁছলাম। লেভেরেট শাখার প্রধান কোষাধ্যক্ষ মিঃ রেমণ্ড বার্ক রোগা-পাতলা মানুষ, মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে, বয়েস প্রায় পঁয়ত্রিশ, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। স্টেলা মার্শালের মতো উনিও আমাকে নির্দ্বিধায় আরনল্ড স্ট্রং হিসেবে মেনে নিলেন।

দু মিনিট অন্তর অন্তর নাক ঝাড়ার ভান করে আমি বলতে শুরু করলাম, মনে হচ্ছে আমার দিকে ফ্লুর আক্রমণ এগিয়ে আসছে। বার্ক তাতে যথার্থই সহানুভূতিশীল হলেন বলে মনে হলো। আমার ব্যক্তিগত অফিস ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে, উনি আমাকে নিয়ে সারা ব্যাঙ্কে ঘুরে ঘুরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলে সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধহীন ভাবে এবং মার্জিত অন্তরঙ্গতায় আমাকে অভিবাদন করার পর, আমি সহজভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে শুরু করলাম। সব শেষে গিয়ে হাজির হলাম কোষাগারের কাছে। এটা অবিকল মিডওয়ে সিটির কোষাগারের মতো, কাজেই এ ব্যাপারে আমার কিছুই বুঝে নেবার প্রয়োজন হলো না।

'মিঃ মরিসন সাক্ষী হিসাবে আমাকে বা মিস মার্শালকে সঙ্গে নিয়ে সর্বদা এটা পাঁচটার সময় বন্ধ করতেন,' বার্ক বললেন। 'উনি মারা যাবার পর থেকে মিস মার্শালকে সাক্ষী রেখে আমিই এ কাজটা করে আসছি। এবারে আপনি কি এ দায়িত্বটা নিতে চান?'

'হ্যাঁ,' বললাম, 'এর খাতাটা কোথায়?'

বার্ক আমাকে খাতাটা দেখালেন। তাতে প্রতিদিন বিকেলে যিনি কোষাগার বন্ধ করেছেন, তিনি ঘড়িতে নির্দিষ্ট করে রাখা ঘণ্টার সংখ্যাটা লিখে পাশে ছোট করে নিজের নাম সই করে রেখেছেন। সেই সঙ্গে সাক্ষীর সইও রয়েছে জায়গা মতো।

আমার ব্যক্তিগত অফিস ঘরে ফিরে এসে টেবিলের ওপরে রাখা একটা মোটাসোটা খামের দিকে দেখালেন বার্ক, 'আপনার সুবিধের জন্যে ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজকর্মের একটা সংক্ষিপ্ত খতিয়ান করে, আমি ওটার মধ্যে রেখে দিয়েছি। ব্যাঙ্কের যাবতীয় সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং ঋণের সম্পূর্ণ তালিকা আপনি ওর মধ্যে পেয়ে যাবেন। তারপরেও যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে দয়া করে আমাকে একটু ডেকে নেবেন।'

'ধন্যবাদ।' বললাম, 'সমস্ত কিছু দেখে নিতে সম্ভবত দিনের অধিকাংশ সময়টাই আমার লেগে যাবে। কাজেই আমি চাই না. ততোক্ষণ আমাকে কেউ বিরক্ত করুক। আমি এসে পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত এতোদিন যেমন ভাবে কাজকর্ম চলছিলো, আশা করি অন্তত আজকের দিনটাও আপনারা তেমনি ভাবে চালিয়ে নিতে পারবেন।'

'অবশ্যই। আমি সবাইকে জানিয়ে দেবো, আজকের দিনটাতে কেউ যেন আপনাকে বিরক্ত না করে।'

বার্ক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই আমি খামটা খুলে ফেললাম। ভেতরের অধিকাংশ জিনিসেই আমার কোনো আগ্রহ ছিলো না, শুধু একটিমাত্র জিনিস বাদে। দেখলাম, আগের দিন কোষাগার বন্ধ হবার সময় নগদ টাকা হাতে ছিলো দু লক্ষ একান্ন হাজার তিনশো বাহাত্তর ডলার সাতাশি সেণ্ট। তার মানে, দশ লাখ ডলারের সিকি ভাগ। অবিশ্যি এর মধ্যে একটা অংশ নিশ্চয়ই খুচরো এবং এক ডলারের নোট। কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলার বয়ে নেবার পক্ষে বেশি ওজনদার হলেও, আরও দু লাখ বাকি থেকে যায়। ভাবতে লাগলাম, কোষাগার বন্ধ হবার সময় গড়পড়তায় প্রতিদিনই এই ধরনের অঙ্কই ভেতরে জমা থাকে কিনা।

রেমণ্ড বার্ক যদি ব্যাঙ্কের ব্যাপার নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান, তাই শুধুমাত্র দুপুরের খাবার সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাটা দিনই আমি একা একা বসে সংখ্যাতত্ত্বে কণ্টকিত কাগজগুলোতে চোখ বোলালাম। তারপর পাঁচটার ঠিক আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে প্রধান কোষাধ্যক্ষকে জিগেস করলাম, এবারে কোষাগার বন্ধ করা যাবে কিনা।

'হ্যাঁ,' উনি বললেন, 'আমি ইতিমধ্যেই নিজে থেকে সংখ্যাটা ঠিক করে নিয়েছি।'

নির্ধারিত সংখ্যাগুলো লেখা এক টুকরো কাগজ হাতে তুলে দিলেন বার্ক। প্রতিদিনই কোষাগারটা ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে বন্ধ করার জন্যে একটা নতুন সংখ্যারাশি ঠিক করে নেওয়া হয় এবং সেই সংখ্যাগুলো দু টুকরো কাগজে আলাদা আলাদা ভাবে লিখে রাখা হয়। যিনি সময়-সীমা স্থির করে চাবি লাগান তাঁর কাছে থাকে একটা টুকরো, অন্যটা থাকে সাক্ষীর কাছে।

'ভালো কথা, এই নিন ব্যাঙ্কের চাবি,' দুটো পেতলের চাবি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন বার্ক। তারপর আঙুল দিয়ে আলাদা করে চিনিয়ে দিলেন চাবিদুটো, 'এটা হচ্ছে সদর দরজার চাবি, আর এটা পেছনের দরজার।'

একসঙ্গে কোষাগারের কাছে এগিয়ে গেলাম আমরা। সময় স্থির করা তালাটা বন্ধ করার জন্যে আমার হাতে চাবি তুলে দিলেন বার্ক। ভালো করে দেখে নিলাম ছিটকিনিটা তোলা আছে কিনা। কারণ তা না হলে পুরো যন্ত্রটাই শক্ত হয়ে এঁটে থাকবে। তারপর কাচের পাল্লা খুলে, প্রথম ঘড়িটার ডায়ালের ঠিক নিচের ফুটোতে চাবিটা ঢুকিয়ে দিলাম।

'আমরা নটা পনেরোতে খোলার সময় ঠিক করে রাখি,' বার্ক বললেন। 'তার মানে সওয়া ষোল ঘণ্টা।'

সওয়া ষোল বার না হওয়া পর্যন্ত চাবিটা ঘুরিয়ে গেলাম আমি। তারপর চাবিটা টেনে বের করে, কাচের পাল্লা বন্ধ করলাম। সব শেষে

কোষাগার বন্ধ করে হাতলে মোচড় দিতেই ছিটকিনিটা যথাস্থানে ফিরে এলো।

কোষাগারের খাতায় সময়টা লিখে ছোট করে নাম সই করলাম এ. এস। আমার পরে নিজের সই দিলেন রেমণ্ড বার্ক।

ইতিমধ্যেই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম যে শুক্রবার রাতেই কোষাগারে হাত দেয়াটা সব চাইতে যুক্তি সঙ্গত হবে। কারণ তাহলে চুরির ব্যাপারটা আবিষ্কার হবার আগে পর্যন্ত—মানে সোমবার সকাল অব্দি—আমার হাতে সময় থাকবে। তার মধ্যে ব্যাঙ্কে আমি যতোটা কম সময় কাটাতে পারবো, আমার ভুয়া পরিচয় ধরা পড়ার ঝুঁকিও ততোটা কম থাকবে। সেই পরিকল্পনা মতো বুধবার বেলা নটা পনেরোর সময় ব্যাঙ্কে ফোন করলাম এবং গলার স্বরটা ফ্যাসফেঁসে করে বার্ককে চাইলাম। বার্কের সাড়া পেয়ে সেই একই রকমের ফ্যাসফেঁসে গলায় বললাম, 'বার্ক, আমি আরনল্ড স্ট্রং কথা বলছি। ফ্লুর প্রকোপে আমাকে বিছানা নিতে হয়েছে। দ্বিতীয় দিনেই কাজ না করে থাকতে আমার ভীষণ বিশ্রী লাগছে, কিন্তু উপায় নেই।'

'আপনার জন্যে আমি কিছু করতে পারি কি?' জিগেস করলেন বার্ক।

'নাঃ, ডাক্তার আমাকে একেবারে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছেন। আরও বলেছেন, আমার সঙ্গে কারুর দেখা করতে না আসাই বাঞ্ছনীয়। সেটা অবিশ্যি দর্শনার্থীদেরই মঙ্গলের জন্যে, আমার জন্যে নয়। রোগটা সম্ভবত খুবই সংক্রামক। ঘর থেকেই আমি খাবার আনার হুকুম করতে পারি, কাজেই আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আসছে কাল হয় আমি ব্যাঙ্কে যাবো, আর নয়তো আপনাকে ফোন করবো।'

'ঠিক আছে, মিঃ স্ট্রং,' বার্ক বললেন। 'আপনি ব্যাঙ্কের কথা ভেবে চিন্তা করবেন না। আমরা কাজকর্ম চালিয়ে নেবোখন।'

বার্ক ফোনটা রেখে দিতেই আমি বিমানঘাঁটিতে ফোন করে, দেশের বাইরে যাবার প্লেনের সম্পর্কে খবরাখবরটা নিয়ে নিলাম।

মাঝ রাতের পরে, ভোর ছটার আগে আর কোনো প্লেন নেই। অতএব শনিবার ভোর ছটার প্লেনেই আমি নিজের নামে একটা আসন সংরক্ষণ করে রাখলাম। অর্থাৎ শূন্য কোষাগার আবিষ্কৃত হবার বহু আগেই প্লেনটা আমাকে এদের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে।…তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা বন্ধকী দোকান খুঁজে বের করে, সেখান থেকে একটা চামড়ার ঝুলি নিয়ে এলাম।

বেস্পতিবার সকালে ফের বার্ককে ফোন করে জানালাম, আমি আগের মতোই অসুস্থ।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না, কাজকর্ম আমরা ঠিক মতোই চালিয়ে যাচ্ছি।' বার্ক বললেন, 'গতকাল মিঃ রেডিং ফোন করেছিলেন, তবে সে শুধুমাত্র আপনার কুশল জানার জন্যে। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি, আপনি অসুস্থ। তাই শুনে উনি বললেন, আপনি কাজে যোগ দিয়েই ওঁকে যেন একবার ফোন করেন।'

ব্যারন রেডিং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অছি-পরিষদের সভাপতি। পাকে-চক্রে আমাকেই যদি ওঁর ফোনটা ধরতে হতো, তাহলেই আমি ফ্যাসাদে পড়ে যেতাম!

'আমি এখান থেকেই ওঁকে ফোন করবো,' বার্ককে বললাম, 'একটা ফোন করার পক্ষে আমি যথেষ্ট সুস্থ আছি।'

শুক্রবার সকালে আবার ব্যাঙ্কে ফোন করলাম, তবে এবারে আর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় নয়। বললাম, 'বার্ক, আমি প্রায় সেরে উঠেছি। এখনও মাথাটা একটু আধটু ঝিমঝিম করছে বটে, তবে আজ বিকেলের মধ্যে ওটুকুও সারিয়ে ফেলার চেষ্টা করছি। ভাবছি, আজ ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আগে একবার যাবো।'

'বেশ তো,' বার্ক বললেন। 'তবে সত্যি বলতে কি, শরীর তেমন ভালো না লাগলে আপনার কিন্তু আসার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'বিকেলের মধ্যে আমি নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভালো হয়ে উঠবো,' বার্ককে আমি আশ্বস্ত করলাম।

তিনটের ঠিক আগেই ব্যাঙ্কে গিয়ে হাজির হলাম। বার্ক আমাকে

অনুসরণ করে আমার অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন। বললাম, 'আচ্ছা, এখানে আশেপাশে কোথাও জল আছে? আসলে আমার ওষুধটা খাবার সময় হয়েছে কিনা—'

'আমি নিয়ে আসছি,' বার্ক বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই কাগজের পেয়ালায় করে এক পেয়ালা জল নিয়ে এলেন।

'ধন্যবাদ,' বড়িটা গিলে, খানিকটা জল খেয়ে নিলাম আমি।

'আজ সকালে মিঃ রেডিং আবার ফোন করেছিলেন,' বার্ক বললেন। 'আর ঘণ্টাখানেক আগে মিডওয়ে সিটি থেকে মিঃ ব্র্যাডি নামে এক ভদ্রলোকও আপনাকে ফোন করেছিলেন। আমি দুজনকেই জানিয়ে দিয়েছি, আপনি তিনটের আগেই ব্যাঙ্কে এসে যাবেন এবং এসেই ওঁদের ফোন করবেন।'

বার্ক যখন আমার টেবিলে রাখা টেলিফোন দুটোর দিকে আঙুল তুললেন, তখন আমি ভেবেই পেলাম না, কিভাবে ফোন দুটো না করে রেহাই মিলবে।

'বাঁ দিকের ফোনটা স্যুইচ বোর্ডের সঙ্গে জোড়া,' বার্ক বললেন। 'আর অন্যটা দিয়ে সরাসরি বাইরে কথা বলা যায়।'

'ঠিক আছে,' বললাম, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন মিঃ বার্ক···আমি তাহলে ফোন দুটো সেরে নেবো।'

বার্ক ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি অবিশ্যি একটা ফোনও করলাম না। কিন্তু বার্কের পক্ষে সেটা বোঝার কোনো পথ রইলো না। সারাক্ষণ বসে বসে আমি শুধু ঘামলাম আর আশা করতে লাগলাম, ওঁদের দুজনের মধ্যে কেউই আজ আর ফোন করবেন না।

হাতঘড়িতে যখন পাঁচটা বাজতে পাঁচ, তখনও কোনো ফোন এলো না দেখে আমি অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বার্ক ঠিক তখনই কোষাগারের দিক থেকে এগিয়ে আসছিলেন। বললেন, 'আমি সংখ্যাটি ঠিক করে ফেলেছি।' আমার হাতে সংখ্যা লেখা চিরকুট আর সময়-তালার চাবিটা তুলে দিলেন উনি।

চিরকুটটা পকেটে ফেলে বার্কের পাশাপাশি কোষাগারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোষাগারের সীমানায় ঢোকার কাঠের দরজাটার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ওষুধের শিশিটা বের করে, সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে একটা বড়ি হাতের তালুতে ঢেলে নিলাম।

'আবার একটা বড়ি গেলার সময় হয়েছে।' বললাম, 'মিঃ বার্ক, ফের একটু জলের বন্দোবস্ত করতে বললে আপনি কিছু মনে করবেন কি?'

'অবশ্যই না,' বলতে বলতে জল আনতে চলে গেলেন উনি।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে, ছিটকিনিটা একবার দেখে নিয়ে আমি কাচের পাল্লাটা খুলে ফেললাম। তারপর ঘড়িতে সাত ঘণ্টা সময় ঠিক করে, চাবিটা খুলে, ফের কাচের পাল্লাটা বন্ধ করে দিলাম। সব শেষে কোষাগারের দরজাটা বন্ধ করতেই ছিটকিনিটা যখন যথাস্থানে ফিরে এলো, বার্ক ঠিক তখনই এক পেয়ালা জল নিয়ে এসে হাজির হলেন। কোষাগারের দরজায় ইতিমধ্যেই তালা এঁটে দিয়েছি দেখে উনি যেন ঈষৎ বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। ওঁর হাত থেকে জলটা নিয়ে আমি বড়িটা গিলে নিলাম, কাগজের শূন্য পেয়ালাটা ছুঁড়ে দিলাম সামনের বাজে-কাগজের ঝুড়িতে।

কোষাগারের খাতায় লিখলাম, সময়-তালাটা চৌষট্টি ঘণ্টা পনেরো মিনিটের জন্যে লাগানো হয়েছে। তারপর নাম সই করলাম—আমি এবং আমার পরে বার্ক।

'শুভ রাত্রি,' খোশমেজাজি স্বরে বললাম, 'তাহলে মিঃ বার্ক, সোমবার সকালে আবার দেখা হবে।'

মাঝরাতে ফের যখন ব্যাঙ্কে এসে পৌঁছলাম, তখন রাস্তায় কোনো জনপ্রাণী ছিল না। চামড়ার থলেটা নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলাম। পনেরো মিনিট বাদে আবার যখন বেরিয়ে এলাম, তখন আমার থলেটা পাঁচ ডলার এবং তার চাইতে বড়ো আকারের নোটে বোঝাই। ওগুলো গোনাগুনতি করার জন্যে

আমি আর অপেক্ষা করিনি। তবে আমার অনুমান, ওতে দু লাখ ডলারের বেশিই আছে।

হোটেলে ফিরে এসে জানালাম, সাড়ে চারটের সময় টেলিফোনে আমাকে যেন জাগিয়ে দেওয়া হয় এবং সোয়া পাঁচটার সময় আমাকে বিমানঘাঁটিতে নিয়ে যাবার জন্যে একটা ট্যাক্সি যেন তৈরি থাকে।

নোটগুলো গুনতে ভোর অব্দি সময় লেগে গেলো। মোট দু লাখ এবং তিন হাজারের সামান্য কিছু বেশিই হলো। থলেটা সবেমাত্র বন্ধ করেছি, ঠিক তখনি দরজায় টোকা দেবার শব্দটা শোনা গেলো।

থলেটা দ্রুত আলমারিতে রেখে দরজা খুলে দিলাম। বাইরে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। লম্বা ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি মিঃ আরনল্ড স্ট্রং?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম।

পরিচয় জ্ঞাপক চিহ্নটা দেখিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন ভদ্রলোক, সঙ্গীটিও ওঁকে অনুসরণ করলো।

জিগেস করলাম, 'কি ব্যাপার, বলুন তো?'

'মিঃ স্ট্রং, কি করে ভাবলেন যে আপনি এ যাত্রায় পার পেয়ে যাবেন?' লম্বা ভদ্রলোক বললেন, 'প্রথম এক লাখ ডলারের ঘাটতিটা আবিষ্কার করতে হয়তো বেশ কিছুটা সময় লেগে যেতো, কারণ সেটা আপনি যথেষ্ট চালাকি করেই সরিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের প্রধান হিসাবরক্ষকই বলেছেন, দ্বিতীয় বারের ঘাটতিটা ধরা না পড়লে প্রথম বারেরটা হয়তো বেশ কয়েক মাসই অজানা থেকে যেতো। ওই জাল প্রমিসারি নোটটা ফাইলে রেখে দেওয়া সত্ত্বেও আপনি নিশ্চয়ই জানতেন যে দ্বিতীয় বারের এক লক্ষ ডলার ঘাটতির ব্যাপারটা কয়েকদিনের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে—তাই না? কিন্তু আপনি দক্ষিণ দিকে পাড়ি দিলেন না কেন?'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝতে পারলাম, অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে ফস্টার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সঙ্গে একমাত্র আমিই জড়িত ছিলাম না। আরনল্ড যে বদলীর ব্যাপারে

উৎসাহী ছিলো না, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ব্যাঙ্কের এক লক্ষ ডলার ঘাটতি মেটাবার চেষ্টাতেই সে যদি থার্টি-থি্র ক্লাবে গিয়ে থাকে, তাহলে যে রাতে আমি ওকে সেখানে দেখেছিলাম সেটা সেখানে ওর প্রথম বার যাওয়া নয়। তারপরেই মনে হলো, পুলিস ভদ্রলোক বোঝাতে চাইছেন যে আরনল্ড দ্বিতীয় বারের এক লক্ষ ডলার নগদ সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলো। ব্যাঙ্কে আরনল্ডকে যে ব্রিফকেসটা বইতে দেখেছি, পরে শূন্য অবস্থায় যেটা ওর বিছানায় পড়েছিলো— সেটার কথা মনে পড়লো আমার। ··আরনল্ড তাহলে মাছ ধরতে যাচ্ছিলো না···ওর মতলব ছিলো বিমানঘাঁটিতে সেদিন গিয়ে গাড়িটা ফেলে রেখে দেশ থেকে চম্পট দেওয়া।···কিন্তু কেন আমি ওর মালপত্র-গুলো খুঁজে দেখিনি? ক্লান্ত হয়ে ভাবলাম, পুরো এক লাখ ডলার আমি সেদিন নদীর মধ্যে ফেলে দিয়েছি!

ম্লান কণ্ঠে বললাম, 'আমি আসল আরনল্ড স্ট্রং নই। আমি তার শ্যালক, মেলভিন হল।'

'তাই নাকি?' লম্বা ভদ্রলোক হাতকড়াটা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'তাহলে স্ট্রং কোথায়?'

তা বলতে গেলে অনেক কিছুই বুঝিয়ে বলতে হবে, হাতকড়াটা এঁটে যাবার শব্দ শুনতে শুনতে ভাবলাম আমি।

দ্য প্রোমোশন : রিচার্ড ডেমিঙ্

আতঙ্ক

দিনটা ভালোই কেটেছে পল স্যানটিনের। ছোট খাটো শহর-গুলোতে ডাক্তার এবং ওষুধের ব্যবসা দিন দিন বেড়ে উঠছে এবং সেই কারণে ওষুধ বিক্রেতা পল স্যানটিনের ব্যবসাও দিব্যি রমরমা হয়ে উঠেছে। তবে আজ সারাটা দিন বড্ড খাটুনি গেছে, রাত এগারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। মাঝরাতের আগে বাড়িতে পৌঁছনোর জন্যে

এখন উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে চলেছে সে। পল স্ট্যানটিন এখন ক্লান্ত, আরও আধ ঘণ্টা জেগে থাকার জন্যে রীতিমতো কসরৎ করতে হচ্ছে তাকে। তাই বলে সে ঘুমে ঢুলছে, তা নয়। গাড়িটা সম্পূর্ণ ভাবে তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে।···রাস্তায় সামান্য কয়েকটা গাড়ির সঙ্গেই তার মোলাকাত হয়েছে এবং এই মুহূর্তে রাস্তাটা একেবারে নির্জন বলেই মনে হচ্ছে। শুধুমাত্র এই কারণের জন্যেই এ রাস্তাটা বেছে নিয়েছে সে। হালকা যানবাহন। এবং অন্য গাড়িটাকে যখন সে দেখতে পেলো, তখন রাস্তাটা তেমনি নির্জনই ছিলো।···

প্রথমে সিকি মাইল আগে একটা বাঁকের মুখে গাড়িটার হেড লাইট দুটো দেখতে পেয়েছিলো পল। প্রচণ্ড উজ্জ্বল আলো, গাড়ির চালক সেটাকে কমজোরি করছে না। লোকটাকে শাপান্ত করলো স্ট্যানটিন, তা সে যে-ই হোক না কেন। তারপর নিজের গাড়ির আলো দুটোকে কমজোরি করে তুললো, কিন্তু অপর পক্ষ থেকে ভদ্র-সম্মত কোনো প্রত্যুত্তর পেলো না। লোকটাকে ফের অভিশম্পাত দিয়ে স্রেফ প্রতিহিংসার বশেই স্যুইচ টিপে নিজের গাড়ির আলো দুটোকে আবার ঝলমলে করে দিলো স্ট্যানটিন—কিন্তু এর মধ্যে সত্যিকাবের কোনো বিপদ আছে বলে অনুভব করতে পারলো না। গাড়িটা যে তীব্রগতিতে তার দিকেই ধেয়ে আসছে, এ বিষয়ে সে অস্পষ্ট ভাবে সচেতন ছিলো। এ ধরনের রাস্তার পক্ষে গতিটা বড্ড বেশি তীব্র। স্বয়ংক্রিয়-ভাবেই অ্যাক্সিলেটার থেকে চাপ কমিয়ে দিলো স্ট্যানটিন—রাস্তায় নিজের ধার ঘেঁষে থাকতে এবং সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসা আলো দুটোর দিকে সরাসরি না তাকাতে মনোযোগী হয়ে উঠলো সে।

পল স্ট্যানটিন যখন বুঝতে পারলো যে অন্য গাড়িটা রাস্তার মাঝখান থেকে ধনুকের মতো বেঁকে আসছে, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন তাকে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ঠিক করতে হবে—অন্য গাড়ির চালক পাশের দিকে সরে যাবে এই আশায় সে ভেঁপু টিপে গাড়ির মধ্যেই বসে থাকবে, নাকি ঝুঁকি নিয়ে নুড়ি-পাথর

আর নোংরার মধ্যে কাঁধ ফেলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বে। দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিলো সে, কিন্তু সেটাও খুব একটা তাড়াতাড়ি হয়নি। স্ট্যানটিন দেখলো, অন্য গাড়িটা এক ইঞ্চিও পথ ছাড়বে না—তাই নিজের গাড়িটাকে সে ডানদিকে ঘুরিয়ে নিলো। ধাক্কাটা লাগলো গাড়ির বাঁ ধারে, পেছনের দিকে। ফলে পিছল খেয়ে সামনের খাদের দিকে হুড়মুড় করে নেমে এলো গাড়িটা। তারপরেই সেটা মাধ্যাকর্ষণের টানকে তুচ্ছ করে পাশ ফিরে লাফিয়ে উঠলো শূন্যে এবং শীর্ষবিন্দুতে থাকার সময়েই স্ট্যানটিনকে ছিটকে ফেলে দিলো বাইরে।

গাড়িটার চুরমার হয়ে ভেঙে যাবার দৃশ্য বা শব্দ কিছুই দেখতে বা শুনতে পায়নি স্ট্যানটিন। শুধু বুঝতে পেরেছিলো, একটা নিরেট দেয়ালের মতো পাহাড়ের গায়ে তার দেহটা আছড়ে পড়েছে। তারপর ছোটখাটো একটা হিমানী-সম্প্রপাতের মতো একরাশ নুড়ি-পাথর আর নোংরা ময়লা শুদ্ধু সে গড়িয়ে এলো নিচের দিকে এবং সেখানেই পড়ে রইলো স্থির হয়ে।

প্রথমটাতে কোনো ব্যথা বা যন্ত্রণা অনুভব করেনি স্ট্যানটিন। আকস্মিক আঘাতটা তাকে একেবারে অসাড় করে ফেলেছিলো। কিন্তু বুঝতে পারছিলো, এখনও সে জীবিত আছে এবং যে ভাবেই হোক, সজ্ঞানেই আছে। আবছা আবছা এও বুঝতে পারছিলো যে তার শরীরটা ভেঙে-চুরে গেছে, রক্তপাত হতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

চোখ ধাঁধানো আলো দুটো ইতিমধ্যে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। একরাশ বুনো লতাপাতার ওপরে পিঠ রেখে শুয়েছিলো স্ট্যানটিন। আরও অনেক ওপরে অজস্র তারার অস্থির দেয়ালী আর ঝলমলে পূর্ণিমার নিস্তরঙ্গ চাঁদ। চাঁদ আর তারাগুলোকে যেন অনেক কাছাকাছি বলে মনে হচ্ছিলো স্ট্যানটিনের, মনে হচ্ছিলো ওরা যেন আর কোনদিনও তার এতো কাছাকাছি আসেনি। হয়তো এই চোখের ভুলের জন্যেই স্ট্যানটিনের প্রথম মনে হলো, সে মরতে চলেছে। অথচ সেই মুহূর্তে এজন্যে তার এতোটুকুও রাগ ছিলো না। দুর্ঘটনার আগে তার

মধ্যে যে ক্রোধ জেগে উঠেছিলো, সে কথা স্ট্যানটিন মনে করতে পারছিলো না—সেটা যেন অস্পষ্ট এক অবাস্তব স্মৃতি। আসলে জাগতিক কোনো সৃষ্টির সম্পর্কে মৃত্যু-পথযাত্রীর কোনো অনুভূতি থাকে না, তারা তখন সম্পূর্ণভাবে নিজেদের মধ্যেই ডুবে থাকে।

ঠিক তখনই কণ্ঠস্বর দুটো শুনতে পেলো স্ট্যানটিন। এ যেন পৃথিবীর সঙ্গে তার সংযোগের নবীকরণ।···অন্য গাড়িটাতে লোক ছিলো। শান্তভাবে, বিনা ক্রোধে এবং বিনা সহানুভূতিতে তাদের সম্পর্কে ভাবতে লাগলো স্ট্যানটিন। কিন্তু সেই সঙ্গে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে রাখলো তাদের কথাবার্তা শোনার জন্যে।

'এখানে নেই লোকটা,' একটা পুরুষ কণ্ঠ। বয়েস তেমন বেশি নয়।

অন্য গাড়িটাও তাহলে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে। কিংবা চালক ইচ্ছে করেই থামিয়েছে গাড়িটা। যাই হোক, গাড়ির লোকগুলো—তা সে যারাই হোক না কেন—গাড়ি থেকে নেমে এসে তাকে খোঁজাখুঁজি করছে।

কেন? তাকে সাহায্য করার জন্যে কি? স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশেই প্রথমে ওদের ডাকতে চাইলো স্ট্যানটিন···বুঝিয়ে দিতে চাইলো, কোথায় সে পড়ে রয়েছে। স্বার্থপরের মতো ওরা বেপরোয়া ভাবে রাস্তা ধরে যাচ্ছিলো, কিন্তু এখন ওরা তাকে সাহায্য করতে চাইছে। অথচ একটা তীব্র সংশয় পরক্ষণেই স্ট্যানটিনের প্রাথমিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ওরা কি সত্যি সত্যি বন্ধুর মতোই ব্যবহার করবে? আচমকা ওদের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত আতঙ্ক অনুভব করলো স্ট্যানটিন। কিন্তু এর কারণ কি, তা সে জানে না। দুর্ঘটনায় পতিত মানুষকে সকলেই সাহায্য করতে চায়। ওরা কি তা চায় না?

'লোকটা নিশ্চয়ই ছিটকে বাইরে পড়ে গেছে,' নারী কণ্ঠের জবাব। আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে। এখন কি করি, বলো তো?' সেই একই পুরুষ কণ্ঠ। অর্থাৎ ও গাড়িতে নিশ্চয়ই শুধু দুজন ছিলো।

'খুঁজে ছাখো', মেয়েটি বললো।

সামান্য দ্বিধা, 'কেন ?'

ফের দ্বিধা, 'লোকটার কি হলো, তুমি কি তা জানতে চাও না ?'

'জানি না', পুরুষ কণ্ঠস্বরটা কেঁপে ওঠে, 'জানতে চাই না…'

'আমার মনে হয়, লোকটাকে আমাদের খুঁজে বের করা উচিত।'

'বেশ। কিন্তু বড্ড অন্ধকার যে…'

'তোমার কাছে তো একটা টর্চ আছে, তাই না ?'

'আছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসছি।'

রাস্তায় পায়ের শব্দ। ছেলেটা গাড়ি থেকে টর্চ আনতে যাচ্ছে। তারপর আবার নৈঃশব্দ।

স্যানটিন অপেক্ষা করে রইলো। এক নতুন আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিলো সে, ঘাম বইছিলো সর্বাঙ্গ জুড়ে। কণ্ঠস্বরগুলো তার ভালো লাগেনি। তাকে গ্রাহ্য করার মতো মানুষ ওরা নয় এবং ওদের কাছ থেকে তেমন কোনো সাহায্যও পাওয়া যাবে না।…স্যানটিন কি সত্যি সত্যি মরতে চলেছে ? সে নিজেই এ বিষয়ে নিশ্চিত নয়। এতোক্ষণে সারা শরীরে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। মুখে, বুকে, পা দুটোতে। এবং শরীরের ভেতরে কোথাও, যেটা ডাক্তার ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ওই যন্ত্রণাটাই তাকে মৃত্যুর সম্পর্কে নিশ্চিত করে তুললো।…তার মানে ওরা তাকে টর্চ দিয়ে খুঁজে বের করুক বা না করুক, তাতে কিছুই এসে যায় না—তাই নয় কি ?

'পেয়েছি', ছেলেটির কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু কোন জায়গাটাতে খুঁজবো ?'

'খাদের মধ্যে ছাখো।'

এলোমেলো পায়ের শব্দ, নুড়ি-পাথর খসে পড়ার আওয়াজ। তারপর সামনে পেছনে দুলে দুলে এগিয়ে আসা এক ঝলক আলো। আলো এবং পায়ের শব্দ—দুইই ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। স্যানটিনকে ওরা নির্ঘাত খুঁজে পাবে। সে গলা ছেড়ে ডাকলে কাজটা আরও দ্রুত হয়ে যায়। কিন্তু স্যানটিন তা করলো না। শুধু অপেক্ষা করে রইলো।

'এই তো!'

স্ট্যানটিনের মুখে টর্চের আলো। সমস্ত শরীর যেন অসাড়, আলোর আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার ক্ষমতাটুকুও নেই। পায়ের শব্দগুলো দ্রুত এগিয়ে আসছে। তারপরেই সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। আকাশের পটভূমিকায় দুটো শরীর।···স্ট্যানটিনের দু চোখে রাশ রাশ আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখদুটো পিটপিট করতে থাকে সে। কিন্তু টর্চের আলোতে তার যে অসুবিধে হচ্ছে, তা যেন ওরা বুঝতেই পারলো না।

'বেঁচে আছে,' মেয়েটি বললো, 'চোখ দুটো খোলা।'

'হ্যাঁ···'

'কিন্তু চোট লেগেছে।' মেয়েটি হাঁটু মুড়ে বসে। অসীম করুণায় টর্চের আলো থেকে আড়াল করে রাখে স্ট্যানটিনকে। চাঁদের আলোয় মেয়েটির মুখখানা দেখতে পায় স্ট্যানটিন।

ছেলেমানুষ, নেহাতই ছেলেমানুষ মেয়েটি। হয়তো বছর ষোল' বয়েস। রীতিমতো সুন্দরীও। কালো চুল। প্রসাধন-চর্চিত মুখের তুলনায় গায়ের চামড়া হয়তো খানিকটা অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে। কিন্তু মুখখানিতে আবেগের সুস্পষ্ট প্রকাশ। সম্ভবত স্ট্যানটিনের অবস্থা দেখে ও আঘাত পেয়েছে। কিন্তু তার আহত স্থানগুলোতে চোখ বুলিয়ে ওর চোখ দুটিতে সহানুভূতির কোনো আলো ফুটে ওঠে না।

'ভীষণ চোট লেগেছে, তাই না?' সরাসরি স্ট্যানটিনের দিকে ছুটে আসে প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ···।' স্ট্যানটিন আবিষ্কার করে, কথা বলতে তার খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না।

'কোথায় লেগেছে? বুঝতে পারছেন?'

'সব জায়গাতেই বোধহয়। বিশেষ করে ভেতরে।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে নেয় মেয়েটি। ওর পরের প্রশ্নটা যেন হিম-শীতল···হিসেব করা। 'আপনি কি মনে করেন, আমরা সাহায্য নিয়ে এলে আপনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন?'

জবাব দেবার জন্যে স্যানটিনও সময় নেয় খানিকটা। কিন্তু তবু সে ভুল করে বসে। 'আমি বোধহয় মরতে চলেছি,' বললো সে। এবং বলেই বুঝতে পারে, সে ভুল করেছে।

মেয়েটির অভিব্যক্তি পালটে যায়। পরিবর্তনটা কতোখানি, তা বুঝতে পারে না স্যানটিন। কিন্তু বুঝতে পারে পরিবর্তন হয়েছে। তার পাশ থেকে উঠে, ছেলেটার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মেয়েটি।

'লোকটা মরতে চলেছে,' বললো ও। যেন স্যানটিনের মতো ও-ও এ বিষয়ে নিশ্চিত।'

'তাহলে ডাক্তার খোঁজার আর কোনো দরকার নেই, বলছো?' ছেলেটা যেন স্বস্তি পায়। যেন পুরো ব্যাপারটাতে তার দায়িত্ব এখন শেষ হয়ে গেছে।

'আমার মনে হচ্ছে—নেই।'

'তাহলে আমরা কি করবো?'

'কিচ্ছু না। শুধু এখানে অপেক্ষা করবো। এক সময় না এক সময় কোন গাড়ি এখানে আসবেই।'

'আমরা তখন সে গাড়িতে চেপে শহরে চলে যাবো?' ছেলেটা যেন মেয়েটির নেতৃত্বে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে ওঠে।

'অবশ্যই। আমরা গিয়ে একজন ডাক্তার বা অন্য কাউকে এখানে পাঠিয়ে দিতে পারি। তবে সম্ভবত এ লোকটা ততোক্ষণে মরে যাবে।...ঘটনাটা আমাদের পুলিসে জানাতে হবে।'

'পুলিস?'

'হ্যাঁ, জানাতেই হবে। তুমি একটা মানুষকে খুন করে ফেলেছো।'

তারপর নৈঃশব্দ। ওদের পায়ের কাছে পড়ে থাকে স্যানটিন, তাকিয়ে থাকে ছায়া ছায়া মূর্তি দুটোর দিকে। ওরা এমন ভাবে কথাবার্তা বলছে, যেন ইতিমধ্যেই সে মরে গেছে। কিন্তু তবুও এতে রাগ হয় না স্যানটিনের। কারণ হয়তো সে নিজেও নিজেকে মৃত বলে ধরে নিয়েছে।

'আর্লিন...ওরা...ওরা আমাকে কি করবে?'

'কারা ? পুলিস ?'

'হ্যাঁ···তুমি বললে, আমি একটা লোককে খুন করে ফেলেছি—'

'তাতো করেছোই·। করোনি ?'

ছেলেটা ইতস্তত করে, 'কিন্তু···কিন্তু ওটা একটা দুর্ঘটনা। তুমি তো তা জানো, আর্লিন—তাই না ? মানে, ঘটনাটা স্রেফ ঘটে গেলো···'

'তা তো বটেই।'

মৃদু স্বরে কথাবার্তা বলতে থাকে ওরা, কিন্তু স্যানটিন ওদের প্রতিটি কথাই শুনতে পায়। বাধ্য হয়ে বলে, 'প্রতিটা দুর্ঘটনাই কারুর না কারুর দোষে হয়।'

ওরা চমকে ওঠে। স্যানটিন লক্ষ্য করে, পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে তার দিকে তাকায় ওরা। 'কি বলতে চাইছেন আপনি ?' এক মুহূর্ত পরে জিগেস করে ছেলেটি।

'এই দুর্ঘটনার দোষ, আপনার। আমি তাই বলতে চেয়েছি।'

তবুও রাগ হয় না স্যানটিনের। অথচ অনুভব করে, দোষটা প্রমাণ করা দরকার।

'আমার দোষ···কি করে ?'

'প্রথমত, আপনি গাড়ির আলো কমজোরি করেননি···'

'আপনিও করেননি।'

'প্রথমে করেছিলাম।'

'কিন্তু তারপর স্যুইচ টিপে ফের চড়া আলো দুটো জ্বেলেছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আলো কমাননি বলেই জ্বেলেছিলাম।'

ফের এক মুহূর্তের জন্যে নিশ্চুপ হয়ে থাকে ছেলেটি। তারপর বলে, 'কিন্তু ধাক্কাটা যখন লাগে, তখন আপনার গাড়িতে জোরালো আলো ছিলো।'

কথাটা মেনে নিতে হয় স্যানটিনকে, 'আমার তখন মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সেটাই সব চাইতে বড়ো কথা নয়। রাস্তায় আপনি আমার ধার দিয়ে আসছিলেন।'

ছেলেটির মুখটা মেয়েটির দিকে ঘুরে যায়, 'আর্লিন, আমি কি রাস্তায় ওঁর ধার দিয়ে আসছিলাম ?'

মেয়েটি যেন খিলখিলিয়ে ওঠে। কিংবা ওই জাতীয় কিছু। 'আমি তা কি করে জানবো ? আমরা তো তখন···'

মেয়েটি ওর কথা শেষ না করলেও, স্ট্যানটিন বাকিটুকু অনুমান করে নেয়। ওরা পরস্পরকে আদর সোহাগ করছিলো। তাই ছেলেটা গাড়ির আলো কমায়নি, গাড়িটাকে ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। এবং এখন ওদের সেই সুসময়ের মূল্য দিতে হচ্ছে স্ট্যানটিনকে।···অবশেষে এ জন্যেই রাগ হয় স্ট্যানটিনের। কিন্তু রাগটা খানিকটা বিচিত্র ধরনের। এ রাগের সঙ্গে তার নিজের যেন কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ শেষ অব্দি এখন তার আর এতে কিছুই এসে যায় না। কারণ সে মরতে বসেছে।

একই সঙ্গে খানিকটা তৃপ্তিও অনুভব করে স্ট্যানটিন। এখন সে নিশ্চিন্ত মনে ছেলেটাকে দিব্যি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারে।

'তাহলে বুঝতেই পারছেন,' বললো সে, 'আপনি রাস্তার ভুল পাশ দিয়ে আসছিলেন। অতএব দোষ আপনার।'

স্ট্যানটিনের কথা শুনেও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো ছেলেটা। জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা আমাকে কি করবে, বলো তো ? মানে, আমি পুলিসের কথা বলছি।'

'আমি তা কি করে জানবো ?' এতোক্ষণ দিব্যি শান্তই ছিলো মেয়েটি। এখন হয়তো ওর প্রাথমিক বিহ্বলতাটুকু কেটে যাচ্ছে। হয়তো আতঙ্কিত আর বিচলিত হয়ে উঠছে একটু একটু করে।

'আমি যদি রাস্তার ভুল ধার দিয়েও এসে থাকি, তাহলেও এটা একটা দুর্ঘটনা।' ছেলেটি বললো, 'আমি ইচ্ছে করে ভদ্রলোকের গাড়িতে ধাক্কা মারার চেষ্টা করিনি বা ওঁকে খুন করতেও চাইনি।'

'তা ঠিক···'

'এসব ব্যাপার তো তুমি খবরের কাগজে পড়ে থাকো, আর্লিন। এসব ক্ষেত্রে গাড়ির চালকদের তেমন কিছু সাজা হয় না। হয়তো

জরিমানাটানা হয়। কিন্তু আমার বাবা তা মিটিয়ে দিতে পারবেন। আর যদি কয়েদখানাতেই যেতে হয়, তা হলেও খুব একটা বেশি দিনের জন্যে সেখানে যেতে হবে না। হবে কি, আর্লিন ? কদ্দিনের সাজা হবে বলে তোমার ধারণা ? তিরিশ দিন ?'

'ষাট দিনও হতে পারে। সেটাও খুব একটা খারাপ হবে না।'

চুপ করে ওদের কথা শুনতে থাকে স্ট্যানটন। একটু একটু করে রাগ বেড়ে ওঠে তার। ষাট দিন না হয়ে নব্বুই দিনও হতে পারে, বলতে ইচ্ছে করে তার। ··জরিমানার টাকা মেটাবে বিমা কোম্পানি, খুনীর সাজা বলতে গেলে প্রায় কিছুই হবে। একটা খুনের জন্যে মোটে নব্বুই দিন!

'আর একটা জিনিস,' আচমকা বলে উঠলো ছেলেটি।

'কি ?'

'এ লোকটা যদি কাউকে ফাঁস করে না দেয়···'

'কি ?'

'জোরালো আলোগুলো কে কমায় নি, কে রাস্তার ভুল ধার দিয়ে যাচ্ছিলো—সে সব কথা। অবশ্য লোকটা মরে গেলে কিছুই ফাঁস করতে পারবে না।'

'তা ঠিক,' আচমকা মেয়েটির কণ্ঠস্বর বিচিত্র শোনায়। কেমন যেন একটা সচকিত ভাব।

'কাজেই লোকটাকে মরতে হবে।···আমি কি বলতে চাইছি তুমি বুঝতে পারছো, আর্লিন ?'

'উনি তো বলেছেন যে উনি মরতে বসেছেন।'

'হ্যাঁ। কিন্তু ও নিশ্চিতভাবে তা জানে না, আমরাও জানি না।··· মরতে ওকে হবেই এবং ও যে মরেছে, সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে।' আচমকা মূর্ছা রোগগ্রস্ত মানুষের মতো কণ্ঠস্বর চড়ে ওঠে ছেলেটির।

স্ট্যানটন লক্ষ্য করে, মেয়েটি ছেলেটার হাত জড়িয়ে ধরে, চোখ তুলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর অঙ্গভঙ্গিতে আতঙ্কের প্রকাশ।

'তাছাড়া আরও একটা জিনিস আছে,' ছেলেটা অতি দ্রুত. প্রায় গলগল করে বলতে থাকে, 'বাবা আমাকে বিমার ব্যাপারটা বলেছেন। যারা মারা যায় তাদের চাইতে যারা পঙ্গু হয়ে থাকে, তাদের জন্যে বিমা কোম্পানিকে অনেক বেশি টাকা দিতে হয়। আমি জানি না, আমাদের অতো টাকার বিমা আছে কি না। লোকটা যদি না মরে সাংঘাতিক চোট পেয়ে বেঁচে থাকে, তাহলে হয়তো বিমার টাকার চাইতেও অনেক বেশি টাকা আমাদের খেসারৎ দিতে হবে। আর তা হলে বাবা যে আমাকে কি করবেন, জানি না।'

মেয়েটি এবারে স্পষ্টই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। ফিসফিসিয়ে বলে, 'কিন্তু উনি তো মরেই যাচ্ছেন!'

'আমরা তা কি করে জানবো, আর্লিন? কি করে জানবো?'

আর কোনো যন্ত্রণা অনুভব করছিলো না স্যানটিন। শুধু ক্রোধ। ওরা তাকে সাহায্য করতে চায়নি। চেয়েছে, সে মারা যাক। ওরা স্বার্থপর, অবিশ্বাস্য রকমের স্বার্থপর। এবং এতো নিষ্ঠুর যে, তার সামনেই সব কিছু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করছে।...

হঠাৎ হাঁটু মুড়ে পাশে বসে, স্যানটিনের মুখে টর্চের আলো ফেললো ছেলেটি। আলোর ছটায় চোখ ঝলসে গেলেও এই প্রথম ছেলেটিকে দেখতে পেলো স্যানটিন। ছেলেমানুষ। মেয়েটির মতোই ছেলেমানুষ। কিন্তু মেয়েটি প্রথম দিকে যেমন শান্ত সংযত ছিলো, তেমনটি নয়। ওর দু চোখে তীব্র আতঙ্ক। তাছাড়া আহতও বটে। ওর মাথার বাঁ পাশে একটা বিশ্রী আঘাতের চিহ্ন, চুলের মধ্যে জমাট-বাঁধা রক্ত।

'কেমন বোধ করছেন?' জিজ্ঞেস করলো ছেলেটি।

জবাব দিতে ঘৃণা হলো স্যানটিনের। জবাব দিয়ে আর সে ওদের আগের মতো স্বস্তি দেবে না। ওদের বলবে না যে, ক্রমশ বেড়ে ওঠা স্রোতের মতো যন্ত্রণার উষ্ণ প্রবাহ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। বলবে না যে, ইতিমধ্যেই সে তার কানে মৃত্যুর অস্ফুট আহ্বান শুনতে পেয়েছে। কিন্তু ছেলেটির মুখে হতাশার ছায়া দেখতে পেলো সে।

স্যানটিনের সারা শরীরে টর্চের আলো ফেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখলো ছেলেটি। তারপর উঠে দাঁড়ালো মেয়েটির পাশে। বললো 'দেখে কিন্তু মনে হয় না, মরে যাবার মতো চোট লেগেছে।'

'না, দেখে তেমন মনে হয় না বটে'—ভাবলো স্যানটিন। 'ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে শরীরের ভিতরে। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট মারাত্মক। তবে ওদের সে কথা বোলো না। ওরা ভাবুক আর ঘামুক। হয়তো অন্য কেউ এসে পৌঁছনো অব্দি তুমি বেঁচেই থাকবে।'

আচমকা যন্ত্রণার একটা আকস্মিক প্রবাহ স্যানটিনের সমস্ত চিন্তা মুছে দিয়ে যায়। প্রায় নিশ্চেতন হয়ে ওঠে সে।…যে করেই হোক, ছেলেটিই তাকে আঘাতটা করেছিলো।

'কি করছো তুমি?' আর্তনাদ করে ওঠে মেয়েটি।

'ওকে মরতে হবে,' ছেলেটার জবাবও প্রায় আর্তনাদের মতো শোনায়। 'ওকে আমার মারতেই হবে!'

মেয়েটার মধ্যে কোথাও বুঝি শোভনতার একটু ছাপ ছিলো। অথবা স্রেফ নারীসুলভ করুণা। 'কিন্তু তাই বলে ওঁকে তুমি খুন করতে পারো না,' হিংস্র স্বরে বললো ও।

'তাতে কি এমন এসে যায়?' ফের মূর্ছা রোগগ্রস্ত মানুষের মতো যুক্তি দেখায় ছেলেটা, 'আমি তো আগেই ওকে মেরে ফেলেছি, তাই নয় কি? শুধু একটু তাড়াতাড়ি ওকে মরতে হবে—এই যা। তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো না, আর্লিন?'

মেয়েটি স্পষ্টতই কিছু বুঝতে পারেনি। ছেলেটাকে পেছন দিকে টেনে রাখলো ও।

'কেউ কোনদিনও এর প্রভেদটা জানতে পারবে না,' বললো ছেলেটা। স্বীকার করতেই হয়, ওর কথায় যুক্তি আছে। 'লোকটার আগেই চোট লেগেছিলো। সবাই ভাববে, ও দুর্ঘটনাতেই মরেছে।'

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলো ওরা। মাথাটা যথাসাধ্য ঘুরিয়ে ওদের দেখতে পাচ্ছিলো স্যানটিন। অপেক্ষাকৃত হালকা রঙেরআকাশের পটভূমিকায় কালো কালো দুটো ছায়ামূর্তি। এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে ঠিক যেন মিশে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু ওই আলিঙ্গনের

মধ্যেও ওদের হতাশা স্পষ্ট অনুভব করলো স্যানটিন। মেয়েটির মধ্যে সহজাত নারী প্রবৃত্তি-সুলভ মায়া-দয়ার অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু ছেলেটা পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মরক্ষার বাসনায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে পশুটা। তবু যে কোনো কারণেই হোক মেয়েটি ওকে ভালো-বাসে এবং ভালোবাসে বলেই এ ব্যাপারে ও ছেলেটার সঙ্গে রয়েছে।

'বেশ—তবে তাই হোক, ভিন্স।' শেষ অব্দি মেয়েটিকে বলতে শুনলো স্যানটিন।

অথচ তখনও স্যানটিনের পক্ষে ওখানে পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়। সম্ভবত তাকে পিটিয়েই মেরে ফেলা হবে। একটা দুর্বল চরিত্রের হিংস্র নাবালকের আত্মরক্ষার খাতিরে যুক্তিসঙ্গত কারণেই সুচিন্তিত ভাবে খুন হবে সে। যে কোনো কারণেই হোক, এ তোক্ষণ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ব্যাপারে স্যানটিন ততোটা ভয় পায়নি। কিন্তু এভাবে মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সে।

'না!' শরীরের সবটুকু শক্তি উজাড় করে চিৎকার করে উঠলো স্যানটিন, 'না!'

স্যানটিনের চিৎকারে ওদের আলিঙ্গন ভেঙে যায়। ছেলেটার টর্চের আলো ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখের ওপরে। এতোক্ষণ অহঙ্কারী ছিলো সে, কিন্তু এখন আর তা নেই। আলো থেকে সে তার মুখটা সরালো না, মুখে ফুটে ওঠা আতঙ্কের ছায়া দেখতে দিলো ওদের দুজনকে।

'কাজটা কি তুমি করতে পারবে বলে মনে করছো, ভিন্স?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি। ওর কণ্ঠস্বর স্থির, অচঞ্চল। এতোক্ষণে ওর সংশয় দূর হয়েছে, দুজনের মধ্যে এখন ও-ই বেশি শক্ত হয়ে উঠবে।

'জানি না,' ছেলেটি বললো, 'তবে পারতেই হবে।'

স্যানটিন দেখলো, ওরা এগিয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করলো সে।

'এক মিনিট, একটু দাঁড়াও', যেন একটা সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্ত থেকে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো স্যানটিন।

'কি ব্যাপার?'

'তোমার গায়ে তো রক্ত লাগবে—তাই নয় কি?'

'জানি না।'

'ছাখো, দেখে বলো।'

'হ্যাঁ, লাগবে। কিন্তু তাতে কি এসে যায়?'

'ভিন্স, ভিন্স, তুমি কি পাগল হয়েছো? তোমার গায়ে রক্ত দেখে হয়তো কারুর সন্দেহ হবে।…রক্তটা ওরা পরীক্ষা করে বলতে পারবে, সেটা কার।'

এক টুকরো আশার স্ফুলিঙ্গ।…ফের চোখ খুলতে ভরসা পায় স্যানটিন। আরও একটা আঘাত হানার জন্যে তার ওপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো ছেলেটা, কিন্তু এখন সে ইতস্তত করছে।

'কি করবো বুঝতে পারছি না,' অবশেষে বললো সে।

আচমকা স্যানটিনের দৃষ্টির সীমানা থেকে হারিয়ে গেলো ছেলেটা। কিন্তু আশেপাশে ঝোপ-ঝাড় মাড়িয়ে এগিয়ে চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলো সে। এবং সবশেষে ছেলেটার চিৎকার।

আর্লিন—এদিকে এসো, আমাকে এটা তুলতে সাহায্য করো।'

ঝোপগুলোতে আরও শব্দ। মেয়েটা ছেলেটার সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে। তারপরেই ছেলেটার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর, 'লোকটা গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলো, তাই না? বেশ তো, পড়ে গিয়ে এটা ওর মাথায় লেগেছিলো—ব্যস! তবে লাশটাকে আমাদের একটু ঠিকঠাক করে সাজিয়ে রাখতে হবে। এসো তো, দুজনে মিলে এটাকে তুলি—'

আস্তে আস্তে ফিরে আসছে পায়ের শব্দগুলো। পাগলের মতো ওদের খুঁজতে থাকে স্যানটিন। দেখতে পায়, ওরা দুজনে মিলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। ওদের পিঠদুটো বাঁকানো, ভারি মতো কি একটা বিরাট জিনিস বয়ে আনছে ওরা।

এবারে আর চিৎকার করলো না স্যানটিন। করতে পারলো না। কারণ তার স্বরযন্ত্রটাও এতোক্ষণে অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু ওদের লক্ষ্য করতে পারছিলো সে।…আস্তে আস্তে, অনেক কষ্টে, একটু একটু করে এগিয়ে আসছে ওরা। অবশেষে স্যানটিনের শরীরের দুপাশে

এসে দাঁড়ালো দুজনে এবং বিশাল চ্যাপটা মতো সেই ভারি জিনিসটা তার মুখের ওপর থেকে আকাশটাকে মুছে নিলো নিঃশেষে··

তারপর, জীবনের একেবারে শেষতম মুহূর্তে, একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠলো স্ট্যানটিন! শান্তির এক অপরূপ স্নিগ্ধ প্রবাহ বয়ে গেলো তার সমস্ত চেতনা জুড়ে। আমি মরতে চলেছি, ভাবলো সে। তবে এভাবে মৃত্যুটা আরও তাড়াতাড়ি আসবে এবং হয়তো সেটা করুণারই নামান্তর। কিন্তু তাহলেও এটা খুন।···

মনে মনে প্রার্থনা জানালো স্ট্যানটিন। এক বিচিত্র প্রার্থনা। একজন চালাক-চতুর পুলিসের জন্যে প্রার্থনা জানালো সে।

সড়ক টহলদার বাহিনীর সার্জেন্ট ভ্যানেক একজন চটপটে এবং বুদ্ধিমান পুলিস। ভোরের ধূসর আলোয় রাস্তার গাড়ির চাকার দাগগুলো নজর করে দেখছিলেন উনি। কালো অ্যাসফল্টের রাস্তায় দাগগুলো ঠিকমতো দেখতে পাওয়াই শক্ত এবং সার্জেন্ট ভ্যানেকও ব্যাপারটাতে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। তবে তাঁর গাড়ির কাছে দাঁড়ানো যুগলটি যেভাবে তাঁর কাজকর্ম লক্ষ্য করছে, তাতে করে তিনি সামান্য নিশ্চিত হয়ে উঠেছিলেন বৈকি। ছেলেটির নাম ভিন্স এবং মেয়েটির নাম আর্লিন। ওরা মারাত্মক দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া অধিকাংশ কচি-কাঁচাদের মতো একই রকমের, আবার আলাদাও বটে। তাই ভোরের আলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন সার্জেন্ট ভ্যানেক।

সার্জেন্ট যেমনটি আশা করেছিলেন, তার চাইতে খানিকটা বেশিই তিনি পেয়ে গেলেন। লাশটাকে সরানো হয়েছিলো এবং জায়গাটাতে হাঁটাচলার চিহ্নও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু মোক্ষম প্রমাণটাও তিনি পেয়ে গেলেন। একেবারে সুস্পষ্ট, প্রশ্নাতীত প্রমাণ।

খাদ থেকে উঠে এসে ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন সার্জেন্ট। তাঁর মুখে নিশ্চয়ই কোনো ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তি ছিলো। কারণ তাঁকে দেখেই ছেলেটি বিচলিত ভাবে প্রশ্ন করলো, 'কি ব্যাপার, সার্জেন্ট?'

'একটা পাথরের ছুটো দিক থাকে,' সার্জেন্ট ভ্যানেক বললেন। 'ওপরের দিকটা বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় বলে পরিষ্কার থাকে। আর নিচের দিকটা থাকে নোংরা, কারণ সেটা মাটির সঙ্গে লাগানো থাকে। এবারে বলো তো চাঁদ, মিঃ স্ট্যানটন কি ভাবে তাঁর গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লেন, যাতে তার মাথাটা গিয়ে ওই পাথরটার নিচের দিকে ধাক্কা খেলো?'

টেরিফাইড : সি বি. গিলফোর্ড

শূন্যঘর

পাল্লা ছুটো ঠেলে বন্ধ করতেই দরজাটা মেয়েলী গলায় নাকী কান্নার মতো শব্দ করে উঠলো। শব্দটা শুনে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো কার্ল। রাত্রির কোলে বিষণ্ণ মূর্তির মতো অন্ধকার গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। লরা জেগে আছে কি না, কে জানে। কার্ল ভাবলো, হয়তো দরজার শব্দে ওর ঘুম ভেঙে গেছে। অবিশ্যি কার্লের তাতে কিছুই এসে যায় না। ব্যাপারটা এখন এতো দূর গড়িয়ে গেছে যে কোনো কিছুকেই সে এখন পরোয়া করে না। কিন্তু ক্রমাগত সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, অভিযোগ (যা এখন অস্বীকার করার ব্যাপারেও তার কোনো মাথা ব্যথা নেই), লম্বা-চওড়া বক্তৃতা, গালাগালি—এসবগুলো তার স্নায়ুতে ভীষণ চাপের সৃষ্টি করে।

বারান্দার সিঁড়িতে উঠে চাবি বের করে দরজা খুললো কার্ল। তারপর ভেতরে ঢুকে ফের বন্ধ করে দিলো দরজাটা। কিন্তু চাবিটা পকেটে রেখে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে যেতেই অন্ধকারের ভেতর থেকে লরার শান্ত সংযত গলায় তার নামটা উচ্চারিত হলো।

'কার্ল—'

বেষ্টনীর শেষ প্রান্তে হাত রেখে সিঁড়ির গোড়ায় থমকে দাঁড়ালো

কার্ল। সে জানতো, লরা কোথায়। কোণের দিকে প্রাচীন আমলের বিরাট ঘড়িটার পাশে, দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ও। কার্লের জন্যে অপেক্ষা করার সময় ও সর্বদা ওখানেই থাকে।

'এতোদিনে এতে আমার অভ্যস্ত হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু এখনও তুমি আমাকে রীতিমতো চমকে দাও।' কার্ল বললো, 'তুমি ওখানে রয়েছো, তা আমাকে বুঝতে দাওনি কেন? অন্তত একটা আলো তো জ্বেলে রাখতে পারো!'

'কেন জ্বালবো?' অন্ধকারের ভেতর থেকে মসৃণ গলায় বললো লরা। বাস্তবে ওকে সত্যি সত্যি দেখতে না পেলেও ওর তীক্ষ্ণ, সজোরে ঠোঁট চেপে রাখা মুখ এবং ধিকিধিকি করে জ্বলতে শুরু করা খুদে খুদে চোখদুটো যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো কার্ল। 'তুমি কি আলোর মধ্যে কোনোদিনও কোনো কাজ করো?'

'তুমি তো জানো, আমি কোথায় ছিলাম।' শান্ত সহিষ্ণু কণ্ঠস্বর কার্লের। ঘড়ির ছন্দময় দোলকটার ঠিক পাশেই এখন লরাকে দেখতে পাচ্ছিলো সে।

'না, জানি না। আমি চাই, তুমি নিজে আমাকে তা বলবে। যতোদিন তোমায় বিবেকবোধ জেগে না ওঠে, ততোদিন আমি চাই তুমি যখনই যেখানে যাবে, আমাকে জানাবে।'

'প্লিজ, লরা—আর ওসব বোলো না।'

'হ্যাঁ, আবার বলবো। এবং বার বার বলবো, হাজার বার বলবো —যতোদিন তুমি এসব না থামাচ্ছো, ততোদিন বলবো।'

'কিংবা যতোদিন আমি তোমাকে ছেড়ে না যাচ্ছি।'

'তুমি কোনোদিনই তা করবে না।'

এবারে ও বলবে : কারণ, তাহলে তুমি কি করবে? কোথায় যাবে? তোমার না আছে টাকা-পয়সা, না আছে চাকরি। একদিন আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম। তাই আজও আমি নিজের টাকা খরচ করে তোমাকে পুষছি—যে টাকার জন্যে তুমি আমাকে বিয়ে করেছিলে।…

'থামো, বলছি!' লরা কথাগুলো বলার আগেই চিৎকার করে ওঠে কার্ল।

'হ্যাঁ, কার্ল। আমি ঠিকই বলেছি।'

'আচ্ছা, কোন জিনিস যেমন যেমন ভাবে রয়েছে, তুমি কি সে-গুলোকে ঠিক তেমনি ভাবে মেনে নিতে পারো না?'

'আমি তোমাকে মেনে নিয়েছি কার্ল, কিন্তু তুমি যা করছো—সেগুলোকে নয়। কোনোদিনই কোনো মেয়ে সেগুলোকে মানিয়ে নিতে পারে না।'

'তুমি কি জানো, কতো পুরুষ মানুষ অন্য মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে?'

'তুমি কি নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা করছো?'

'নিজেকে সমর্থন করার কোনো প্রয়োজনই আমার নেই—তোমার কাছেও না বা অন্য কারুর কাছেও না,' বললো কার্ল। এক ভয়ঙ্কর প্রশান্তি অনুভব করতে শুরু করলো সে, যা এক প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। নিজেকে কি মনে করে লরা? ওর কি ধারণা, ওর ওই হতচ্ছাড়া অর্থ-সম্পদ দিয়ে কার্লের দেহ মন—সমস্ত কিছুই ও কিনে নিয়েছে?···

রক্তের মধ্যে ফেনায়িত হয়ে ওঠা এক বিচিত্র উত্তাপবিহীন ক্রোধ আর সমস্ত চেতনা অধিকার করে রাখা সেই ভয়ঙ্কর প্রশান্তিতে মাতালের মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে লরার দিকে এগিয়ে চললো কার্ল। যেভাবে সে অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছিলো, তাতে সচকিত হয়ে উঠলো লরা।

'কার্ল!' লরার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত রকমের শান্ত, কিন্তু তীক্ষ্ণ এবং আতঙ্কে প্রাণময়। 'না···'

অন্ধকারের মধ্যে লড়াই করতে করতে পুরনো আমলের ঘড়িটার ওপরে ছিটকে পড়ে ওরা, অথচ ঘড়ির দোলকটা পরম সহিষ্ণুভাবে দুলতে থাকে সেই একই ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায়। ঘড়ির কাছ থেকে একটা পাক খেয়ে সরে যায় ওরা। পরক্ষণেই কার্ল ফের ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপরে।

হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে লরা, কার্লের হাত শক্ত হয়ে চেপে বসে ওর কণ্ঠ-নালীতে। বিস্ফারিত চোখে লরা তাকিয়ে থাকে কার্লের দিকে, শব্দ-হীন মুখটা হাঁ হয়ে থাকে অসহায়ের মতো। ওদের দুজনের চোখের দূরত্ব মাত্র কয়েক ইঞ্চি—কার্লের চোখদুটো হিমশীতল, একাগ্র···লরার দুচোখ মৃত্যুর আলোয় দীপ্ত।

তারপর ওকে ছেড়ে দেয় কার্ল। একটা জড় বস্তুপিণ্ডের মতো এক-পাশ হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে লরা। ঘড়ির দোলকটার অন্তহীন আর আবেগবিহীন দুলুনির নিচে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে ও। শুধু জিভ দিয়ে সহানুভূতিসূচক চুক্‌চুক্ শব্দ তোলার মতো ঘড়িটার অন্তস্তল থেকে মৃদু টিকটিক শব্দ উঠতে থাকে একটানা।

চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নেয় কার্ল। আশ্চর্য, কোনো কিছুই এতোটুকু এলোমেলো হয়নি! পরিবেশটাও আগের মতো তেমনি নিস্তব্ধ নিঝুম। এইমাত্র এখানে একটা খুন হয়ে গেছে, অথচ কোনো কিছুই এতোটুকু পালটায়নি। এমন কি সে নিজেও না। তার শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত দ্রুতলয়ে বইছে না। তার হাত দুটো, যা পরম বিশ্বস্তভাবে কাজটা সেরে ফেলেছে, তাতেও অন্য রকম কোনো অনুভূতি নেই। সে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন কিছুই হয়নি।

হয়তো সত্যিই কিছু হয়নি। খুন ধরা পড়লে, তবে তার শাস্তির কথা। কার্ল নিশ্চয়ই জনে জনে বলে বেড়াতে যাচ্ছে না যে সে তার স্ত্রীকে খুন করেছে। লরাও তা কাউকে বলতে যাবে না। আর ওই ওই বুড়ো ঘড়িটা তো মানুষকে সময় জানানো ছাড়া কোনোদিনই অন্য কিছু জানাবে না!

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে জানলার পর্দাগুলো টেনে দেয় কার্ল। আলোটা জ্বালে। তারপর গায়ের জ্যাকেট খুলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়। বৈঠকখানা ঘরের আরাম কুর্সি থেকে লরার দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকা শরীরের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছিলো সে। ওখানে বসেই গভীর ভাবে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে সে—সিগারেটটা ঝুলতে থাকে ঠোঁটের ডগায়, ধোঁয়াগুলো তির্যকভাবে ওপরের দিকে

উঠে, পেরিয়ে যেতে থাকে তার মুখের সীমানা। এবারে লরার দেহটা নিয়ে কি করবে সে ?…

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে পড়া একটা ঘটনার কথা মনে পড়লো কার্লের।…একটা পুরনো বাড়ি ভাঙার সময় বাড়িটার এক তলার মেঝে খুঁড়ে একটা কঙ্কাল বের করা হয়েছে। কঙ্কালটা কোনো মহিলার এবং অনুমান করা হয়েছে, অন্তত পঞ্চাশ বছর ধরে সেটা ওখানেই ছিলো।…তার মানে, কার্ল নিজেকে বললো, আর একজনও তাহলে এমনিধারা একটা কাজ করে দিব্যি বহাল তবিয়তে জীবন কাটিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষ হিসেবেই কবরস্থ হয়েছে।

অতএব মাটির নিচের ঘরে নেমে গিয়ে, একটা গাঁইতি দিয়ে মেঝে খুঁড়তে শুরু করলো কার্ল। প্রথমে উঠলো কংক্রিটের বড়ো বড়ো চাঙ্, তারপর নরম কালো মাটি। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো কার্ল। সাবধানে একটা জায়গায় গর্ত করলো সে। তারপর—তখন উষার নিস্তব্ধ প্রহর—ওপর তলায় গিয়ে স্ত্রীকে বয়ে নিয়ে এসে, কবরে শুইয়ে দিলো।

সেলারে পুরনো এক বস্তা সিমেন্ট ছিলো। সিমেন্টগুলো আবার সেই ধরনের, যেগুলোতে কাজের সুবিধের জন্যে আগে থেকেই বালি মেশানো থাকে। ওগুলোতে জল মিশিয়ে মেঝের ক্ষতস্থানটা দ্রুত সারিয়ে তুললো কার্ল। ততোক্ষণে সেলারের ছোটো ছোটো জানলাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো খুশিয়াল ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। কাজ শেষ করে একটা নড়বড়ে পুরনো কুর্সিতে বসে সিগারেট খেতে খেতে জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করলো কার্ল। তারপর হলঘরের গালচে দিয়ে ঢেকে দিলো সমস্ত জায়গাটা।

তাহলে লরা বিদায় নিলো। এবারে ওর উধাও হয়ে যাওয়া সম্পর্কে মনে মনে একটা গল্প স্থির করতে থাকে কার্ল। অবিশ্যি সেটা খুব একটা শক্ত হবে না, কারণ প্রতিবেশীদের সঙ্গে লরা কোনোদিনই খুব একটা মেলামেশা করেনি। তা ছাড়া এটা এমন একটা অঞ্চলও নয়,

যেখানে প্রত্যেকটা পরিবার তার প্রতিবেশীর বংশ কুলুজি এবং রুজি-রোজগারের সম্পর্কে খবর রাখে। মেয়েছেলে নিয়ে কার্লের ছেনালি করে বেড়ানোর ব্যাপারটাতে লরা একেবারে মরমে মরে থাকতো (ওর ধারণা ছিলো, সবাই ও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু সেদিক দিয়ে কার্ল চিরদিনই খুব চালু।) এবং ওই কারণেই নিজেকে ও প্রত্যেকের কাছ থেকে এতোটা বিচ্ছিন্ন করে রাখতো যে ওর এই আকস্মিক অনুপস্থিতিটা কেউ লক্ষ্যই করবে না।

ক্যালিফোর্নিয়ায় লরার দূর-আত্মীয়দের কাছে কার্ল চিঠি লিখে দিলো, লরা অসুস্থ। তবে চিঠি লেখার সময় এমন হুঁশিয়ার হয়ে লিখলো, যাতে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে না ওঠেন। কারণ সে চায় না, লরাকে দেখার জন্যে আচমকা তাঁরা এখানে ছুটে আসুন। (আসলে লরা রীতিমতো বড়োলোক আত্মীয় যে!) বস্তুতপক্ষে লরার অসুখ, ওর অবস্থার উন্নতি, ফের রোগের আক্রমণ এবং অবশেষে মৃত্যু—এ সবের বিশদ বর্ণনা দিয়ে সে একই সঙ্গে চারখানা আলাদা চিঠি লিখে ফেললো, যেগুলো সে এক সপ্তাহ অন্তর অন্তর ডাকে ফেলবে।

কটা দিন কেটে গেলো। তৃতীয় দিন কার্লের খেয়াল হলো, খুনের রাত্তির থেকে এ যাবৎ সে বাড়ি থেকে বেরোয়নি। নিজেকে খিস্তি দিলো কার্ল। ভয়ের কিছুই নেই—সে বাডি থেকে বেরোলে কেউ যে বাড়িতে ঢুকে মেঝে খুঁড়ে লাশটা তুলে ফেলবে, তা-ও নয়। তবু সে ধরনের অনুভূতিই যেন তাকে পেয়ে বসেছিলো।

ঠিক তখনই দূরভাষ বেজে উঠলো. গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরলো কার্ল। ফোনটা লরার। মাংসের দোকানী বললো, মিসেস বোগান মাংস নিতে আসেননি…ওঁর কিছু হয়েছে কি না।

'না, কিছু হয়নি।' কার্ল জানালো, 'মিসেস বোগানের শরীরটা ভালো নেই।'

মাংসের দোকানির মুখ থেকে সহানুভূতিসূচক দু চারটে কথা—যা কার্লের প্রয়োজন। তারপরেই কথা শেষ করে গ্রাহযন্ত্র রেখে দেয়

কার্ল। কিন্তু ফোনের ব্যাপারটা ফের তাকে ভাবাতে শুরু করে। লোকটাকে সে প্রথমে বলেছে, লরার কিছু হয়নি। কিন্তু তারপরেই বলেছে, ও অসুস্থ। এ ধরনের জিনিস মানুষের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারে। শত হলেও কার্লের যেমন ধারণা, প্রতিবেশীরা হয়তো ঠিক ততোটা অন্ধ বা উদাসীন নয়। শেষ অব্দি কারুর না কারুর খেয়াল হবে, মিসেস বোগানকে দেখা যাচ্ছে না এবং তখনই সে কার্লকে প্রশ্ন করতে শুরু করবে।

হয়তো লরার কোনো বন্ধুবান্ধবও থাকতে পারে। কথাটা মনে হতেই কার্ল অনুভব করলো স্ত্রীর স্বভাব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সে খুব ওয়াকিবহাল নয়। সমস্ত দিন, এমন কি কখনো কখনো কয়েকদিন পর্যন্ত, সে বাড়ির বাইরেই থাকতো। কাজেই লরা কি করতো, কাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো—তা সে জানবে কি করে?

সেদিন বিকেলের দিকে এক চিলতে ঘুমিয়ে নিলো কার্ল। ঘুমের মধ্যে একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্ন দেখলো সে। তার অবচেতন মন মরিয়া হয়ে লড়াই করতে লাগলো তাকে ঘুমের বাঁধন থেকে জাগিয়ে তোলার—কিন্তু পারলো না। ঘুমন্ত অবস্থায় ছটফট করতে লাগলো সে, ঘামতে লাগলো কুলকুল করে। দেখলো, লরা কবর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। মেঝের নিচ থেকে আঁচড় কাটার শব্দ শুনতে পেলো কার্ল। তাছাড়া ক্রোধ আর আতঙ্কে মেশানো একটা চাপা আর্তনাদ। আঁচড় কাটার শব্দটা ক্রমশ বেড়ে উঠে আঘাতের শব্দ হয়ে যায়। সেলারের শান বাঁধানো মেঝেটা দুলে দুলে ওঠে। তারপর এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—বিস্ফোরণে ভিত শুদ্ধ সমস্ত বাড়িটা থরথর করে কেঁপে ওঠে, ঠকঠক করে ওঠে জানলার পাল্লাগুলো।…

লাফিয়ে উঠে, আতঙ্কিত চোখে চারদিকে তাকায় কার্ল। সমস্ত পরিবেশটা নিস্তব্ধ নিঝুম। বড্ড বেশি নিস্তব্ধ। শুধু মাত্র মোজা পরা পায়েই ভূগর্ভের ঘরটাতে ছুটে যায় সে। তারপর নিচু হয়ে দুহাত দিয়ে সরিয়ে ফেলে মেঝের গালচেটা। জায়গাটা ঠিক আগের মতোই রয়েছে। গালচেটা আবার ঠিকমতো বিছিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে।

তারপর দুহাতের পাতায় চেপে ধরে নিজের চোখদুটো। কি হলো তার? পরক্ষণেই জবাবটা পেয়ে যায় কার্ল। এভাবে দিনরাত শুধু বাড়ির মধ্যে থেকে, সে নিজেই এ ধরনের দুঃস্বপ্নকে আবাহন করে এনেছে।

এতএব বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কার্ল এবং তৎক্ষণাৎ ফের সতেজ আর স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বাড়ির ঠিক সামনেই রোদ ঝলমলে পাশপথে দাঁড়িয়েছিলো সে। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'এই যে, মিঃ বোগান—'

সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডটা কুঁকড়ে ওঠে কার্লের, বিবেকবোধের অজগরটা পেঁচিয়ে ধরে তার হৃৎপিণ্ডটাকে। প্রাণপণ প্রচেষ্টায় নিজেকে শান্ত করে রাখলো সে এবং শান্তভাব বজায় রাখার জন্যে এহেন প্রচেষ্টা চালাতে হলো বলে, অভিশম্পাত জানালো নিজেকে।

পাশের বাড়ির মোটাসোটা মহিলাটির পরনে একটা নীল জিনস আর স্বামীর পরিত্যক্ত একটা শার্ট। হাতে ঝোপঝাড় কাটার একটা কাঁচি নিয়ে উনি জিগেস করলেন, 'কেমন আছেন, মিঃ বোগান?'

ভালোই আছে কার্ল।

'আর মিসেস বোগান? ওঁকে তো আমি প্রায় হপ্তাখানেক ধরে দেখছি না।'

ব্যস! মোটে তিনটে দিন কেটেছে, আর এর মধ্যেই সেটা 'প্রায় হপ্তাখানেক' হয়ে উঠেছে। এরপরেই ওরা কানাকানি শুরু করবে। তারপর হত্যার দায়ে অভিযুক্ত করবে কার্লকে।

'ওর শরীরটা ঠিক ভালো নেই।'

দু চারটে আধো আধো সহানুভূতির বুলি। যেন এজন্যে মহিলাটির সত্যি কতো চিন্তা! এরপরেই উনি জানতে চাইলেন—

'এ ব্যাপারে আমি কিছু করতে পারি কি?'

'না না, ধন্যবাদ।'

'উনি কি খুবই অসুস্থ?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না।'

'ডাক্তার এনেছিলেন?'

মহিলার চোখে ইতিমধ্যেই অভিযোগের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। এখনও ঠিক খুনের অভিযোগ নয় (আরও খানিকটা সময় যেতে দাও না!)— কিন্তু এমন একটা ভাব, যেন কার্ল লরাকে আচ্ছা করে পিটিয়েছে এবং সারা গায়ে কালশিরা নিয়ে শুয়ে আছে লরা।

'হ্যাঁ। উনি বলেছেন, ওর বিশ্রাম দরকার। একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্রাম।'

'আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি কি? ধরুন, ওঁর জন্যে কিছুটা ঝোলটোল রান্না করে দিয়ে এলাম।'

'না না, ধন্যবাদ,' দ্রুত জবাব দিলো কার্ল। বড্ড বেশি দ্রুত। ধ্যাৎ, কি যে হয়েছে তার! তারপর বললো, 'আমি নিজেই ওর যত্ন-আত্তি করছি।'

'কিন্তু আপনি যখন কাজে বেরোন…' এখনও ওঁদের ধারণা, কার্ল চাকরি-বাকরি করে। কিন্তু মহিলাটি বড্ড নাছোড়বান্দা। হয়তো সন্দেহ না জাগা অব্দি উনি বারবার অনুরোধ চালিয়ে যাবেন।

'একটা নার্স রেখে দেবো,' বললো কার্ল। এটাও বড্ড দ্রুত বলা হয়ে গেলো। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

মহিলাটি হাসলেন। এখন ওঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, জিদটাও ছেড়েছেন। সঠিক জায়গায় একটা ছোটখাটো মিথ্যে কথা যে কতোটা কাজে দেয়, তা সত্যিই লক্ষ্য করার মতো!…কার্লও হাসলো। সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো ওরা দুজনে।

বাড়িতে ঢুকে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলো কার্ল। তারপর এক-জায়গায় বসে ঘটনাটার পর্যালোচনা করতে শুরু করলো। মহিলাটিকে কি বলেছে সে? যা বলেছে, তা মহিলাটির মতলবটা ফেরানোর জন্যেই বলেছে। তবে কি না, সৎ অন্তঃকরণের তাগিদে ও ধরনের মহিলা যে কোনো সময়েই এক বাটি ঝোল নিয়ে এসে বাড়িতে হানা দিতে পারে —এই যা মুশকিল।…অবিশ্যি বুদ্ধিটা তেমন-কিছু খারাপ নয়। নার্স

ভাড়া করতে না পারলেও কার্ল এমন একটা লোকের বন্দোবস্ত করতে পারে, যে মিসেস বোগানের অসুস্থ থাকার সময়টাতে ঘরদোর সাফ সুফো করবে, রান্নাবান্না করবে, সংসারের দেখাশুনো করবে। মিসেস বোগানের সঙ্গে তার কক্ষনো দেখা করার প্রয়োজন হবে না—মিসেস বোগান থাকবেন একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায়। কোনো অবস্থাতেই তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না, তাঁর শান্তি নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না। এ বিষয়ে একেবারে কড়া নির্দেশ দেওয়া থাকবে। তাতেই সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে যাবে। এবং তাতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার জন্যে খানিকটা নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পাবে কার্ল।...

অতএব পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। বলা হলো, গৃহকর্ত্রী অসুস্থ থাকায় ঘর-সংসারের দেখাশুনো, রান্নাবান্না এবং সাফসুফো করার জন্যে একটি লোকের প্রয়োজন।

সামান্য কয়েকদিন পরে বেট্টা কুল এসে দরজার ঘন্টি বাজালো, দরজা খুলে দিলো কার্ল। বেট্টা কুলেব হাতে একখানা ভাঁজ করা খবরের কাগজ। বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাতে কাগজটা ভাঁজ করা। মহিলার লম্বা চেহারা, মুখখানা খানিকটা ফ্যাকাসে—সুন্দরী নয়, তবে একেবারে সাদামাঠাও নয়। প্রায় সুন্দরী, ফ্যাকাসে রঙ, সুন্দর পাতলা ঠোঁট আর স্বচ্ছ চিন্তাশীল দুটি চোখ। কার্লের অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়লো, মহিলার বয়েস এখনও চল্লিশ হয়নি। এবং এ ধরনের মহিলার ওপরে আস্থা রাখা চলে। সহজাত প্রবৃত্তি বশেই কার্ল অনুভব করলো, মহিলাটির পেটে অনেক রহস্য ঠাসা রয়েছে, কিন্তু এ ধরনের মেয়েরা কক্ষনো পেটের কথা নিয়ে মুখে রা কাটে না।

মিসেস কুল জানালো, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর থেকে ও শহরের অন্য প্রান্তে একা একাই বাস করে। এ ধরনের কাজ ও আগেও করেছে।...দু এক কথায় কার্লের সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলো ও, উচ্চারণের ভঙ্গিমা হয়তো ইংরেজ কিংবা আইরিশদের মতো।

'রান্নাবান্না জানা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঘর-সংসার দেখাশুনো করা?'

'হ্যাঁ।' মহিলা নিজে থেকেই বললো, 'সেবা শুশ্রূষাও করতে পারি —মানে, যদি আমাকে তা করতে বলা হয়।'

'না না,' কার্ল বললো, 'এটা শুধুমাত্র ঘর-সংসারের কাজ। মিসেস বোগানের একেবারে নিরিবিলিতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।' কথাটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে গম্ভীর ফিসফিসে গলায় বললো কার্ল। 'ডাক্তার ওঁকে সপ্তাহে একবার করে দেখে যান।'

অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে কার্লের দিকে তাকিয়ে থাকে মিসেস কুল। ও কিছু জানতে চায়, কিন্তু সরাসরি কোনো প্রশ্নও করবে না। অতএব কণ্ঠস্বরে যথাযোগ্য আবেগ ঢেলে কার্ল ধীরে ধীরে বললো, 'ওর বাচ্চা হবার কথা ছিলো।'

মিসেস কুল সহানুভূতি জানালো।

'ও এখন ভীষণ দুর্বল, প্রচণ্ড দুর্বল,' সমস্ত আশা না ছেড়ে, জিনিসটাকে অমঙ্গলজনক করে তোলার প্রচেষ্টায় হতাশায় চোখ নামালো কার্ল।

অতএব কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলো। মিসেস কুল সকাল বেলায় এসে ঘর-দোর সাফ করবে—শুধু নিচতলাটা—আর মিসেস বোগানের খাবারটা রান্না করে দেবে। কার্ল সেই খাবারটা ওপরতলায় নিয়ে গিয়ে লরার ঘরে বসে খাবে এবং মিসেস বোগানের মন্তব্যসহ শূন্য থালাগুলো ফের নিচে নিয়ে আসবে।

'মিসেস কুল, মিসেস বোগান বলেছেন আপনি খুব চমৎকার রাঁধেন।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

ওকে লক্ষ্য করে কার্ল। দেখতে শুনতে তেমন মন্দ নয়। মাঝে মধ্যে আবার কার্লের দিকে চোরা-চোখে তাকিয়ে ছাখে। কার্ল বুঝতে পারে, তার জন্যে ভীষণ দুঃখ অনুভব করতে শুরু করেছে ও। এর ফলটা যে কি হতে পারে, তা-ও কার্লের জানা।...তার জন্যে

আলাদা করে বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরি করে মিসেস কুল এবং জোর করে আবার সেগুলোকে গিলতে হয় কার্লের।

অতএব এটাই দৈনন্দিন নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো। একটা সপ্তাহ এমনি-ই চললো, তারপর দু সপ্তাহ। প্রতিদিন সকালে আর বিকেলে কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর মতো কাপড়-চাপা দেওয়া খাবারের ট্রে ওপর-তলায় নিয়ে যায় কার্ল, ঘরের দরজা বন্ধ করে সেগুলো খায় এবং মাঝে মধ্যে কথোপকথনের ভঙ্গিমায় নিচু গলায় দু-চারটে কথাবার্তাও বলে—আশা করে, নিচের তলা থেকে মিসেস কুল তা শুনতে পাবে।

প্রতিদিন বিকেল চারটের সময় বিদায় নেয় মিসেস কুল। একদিন কার্ল ওকে বাস স্টপ অব্দি এগিয়ে দিলো।

'ওঁর কি রকম উন্নতি হচ্ছে?' জিগেস করলো মিসেস কুল।

'একই রকম আছে,' মাথা নাড়লো কার্ল, 'এবং সেটা ভালো নয়। গতকাল আপনি চলে যাবার ঠিক পরেই ডাক্তার এসেছিলেন। উনি বললেন, ওঁর কোনো উন্নতিই হচ্ছে না…অবস্থা ভালো নয়।… শুধু দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সেই একই ভাবে শুয়ে থাকে, কথাবার্তাও প্রায় বলে না বললেই চলে।'

'নিশ্চয়ই উনি বাচ্চাটার কথা ভাবেন।'

'খুব সম্ভব তা-ই।'

বাস স্টপ এসে গিয়েছিলো। কার্লের দিকে তাকালো ও, 'খোলাখুলি ভাবে একটা কথা জিগেস করছি, মিঃ বোগান। আপনার কি মনে হয়, ওঁর সেরে ওঠার কোনো আশা আছে?'

'কথাটা শুধু আপনার আর আমার মধ্যে থাকবে, মিসেস কুল। আশা বড়ো একটা নেই—ডাক্তারের চোখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারি।'

'ইস, আপনার কি সাংঘাতিক করুণ অবস্থা! এ ধরনের নিঃসঙ্গতা যে কি জিনিস, তা আমি জানি—আমার নিজের জীবন দিয়েই আমি তা বুঝি।'

'বোঝেন?'

'হ্যাঁ।'

পরের কথাটা আর চেপে রাখতে পারে না কার্ল, 'হয়তো আমরা একজন অন্যজনকে খানিকটা আনন্দ দিতে পারি।'

কার্ল কোনো জবাব প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু মিসেস কুল তাকে অবাক করে দিয়ে বললো, 'একদিন সন্ধ্যার সময় কোনো একজন প্রতিবেশী ওঁর কাছে একটু বসলে, আমরা দুজনে মিলে না হয় একটা সিনেমা-টিনেমা দেখতে পারি। তাতেও হয়তো খানিকটা মন ভালো হয়।'

'হ্যাঁ,' খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে কার্ল, 'তাতে মন ভালো হলে আমিও অবাক হবো না।'

অতএব একজন 'প্রতিবেশী' প্রতি সন্ধ্যায় আসতে শুরু করলো। কার্ল ফের ছেনালিপনা শুরু করলো মেয়েমানুষটিকে নিয়ে। চুরমার হয়ে ভেঙে গেলো মিসেস কুলের নিঃসঙ্গতা আর নির্বিকার মনোভাব। আনন্দে ডগোমগো হয়ে উঠলো ওদের সন্ধ্যাগুলি। কার্লকে দেখে মনেই হয় না যে তার স্ত্রী মৃত্যুপথযাত্রী। ওরা একসঙ্গে নাচে, সিনেমা দেখতে যায়, পান করে—তারপর মেয়েমানুষটাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয় কার্ল।

বেট্টা বলে, 'জানো কার্ল, তোমার জন্যে নিজেকে আমার কি মনে হয়? মনে হয়, আমি যেন আবার একটা স্কুলের মেয়ে হয়ে গেছি।'

'আমার ধারণা, আমাদের দুজনেরই একটা পরিবর্তনের দরকার ছিলো,' জবাব দেয় কার্ল।

'তুমি নিশ্চয়ই মনে করো না যে আমরা কোনো অন্যায় করছি? তাই নয় কি?'

'মোটেই না। ওসব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফ্যালো, বেট্টা। আমরা স্রেফ দুটি মানুষ···জীবন আমাদের যে দুর্ভাগ্য দিয়েছে, আমরা তার ভেতর থেকে যতোটুকু সম্ভব আনন্দ কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছি।'

'আচ্ছা, মিসেস বোগান আর কতোদিন ওঁর দুর্ভাগা জীবন বয়ে বেড়াবেন বলে তোমার ধারণা?'

'জানি না। ও একটুও পালটায় না, শুধু সেই একই ভাবে শুয়ে থাকে।'

'মনে হয়, ওঁর জীবনটা বুঝি অনন্ত।'

ঠিক এই জিনিসটাই চাইছিলো কার্ল। এবারে কি করা উচিত, তা ভাবতে শুরু করলো সে। হ্যাঁ, লরা মারা গেছে—এমন একটা কথা সে অবশ্যই রটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তাতে ফের নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেবে।...সমাধিস্থ করার ব্যাপারটা গোপন রাখা প্রায় অসম্ভবই বলা চলে। তার জন্যে লোকজনকে জানানো দরকার। মৃত্যু সম্পর্কিত একটা প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা দরকার। তা ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঠিকাদারের ব্যাপারটাও রয়েছে।...নানা ধরনের অসংখ্য জটিলতা।... বেট্রাকে সমস্ত কথা খুলে বলার কথাও চিন্তা করলো কার্ল। বেট্রা ওকে ভালোবাসে এবং ভালোবাসা মেয়েদের ক্রীতদাস করে তোলে। কিন্তু তবু কেমন যেন ভয় হয় তার। অথচ একটা কিছু করতেই হবে এবং তা তাড়াতাড়ি।

সম্ভবত একটা কাজই কার্লের পক্ষে করা সম্ভব—সেটা হচ্ছে স্রেফ উধাও হয়ে যাওয়া।...হয়তো সেই কঙ্কালটার মতো পঞ্চাশ বছরের আগে লরারও কোনো হদিশ পাওয়া যাবে না।...নিরুদ্দেশে যাবার আগে কার্ল রটিয়ে দেবে, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে লরাকে নিয়ে সে বিদেশে যাচ্ছে। সেখানেই সমস্ত ব্যাপারটার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তখন কে আর ভূগর্ভের ঘরটার মেঝে খুঁড়ে দেখার কথা ভাববে?

ওপরের ঘরে বসে এসব কথা চিন্তা করতে করতে লরার জন্যে তৈরি করা খাবারগুলো খাচ্ছিলো কার্ল।...বাড়িটা সে বিক্রি করে দিতে পারে। তাতে কিছু টাকা-পয়সা অন্তত পাওয়া যাবে। অবশ্য লরার বাকি সমস্ত অর্থ-সম্পদ খোয়ানোটা খুবই দুঃখের ব্যাপার, কিন্তু সেটুকু শাস্তি তো তাকে পেতেই হবে!

ঠিক তখনই কার্লের মাথায় নতুন একটা মতলব খেলে গেলো।... কেন সে লরার সমস্ত সম্পত্তি হারাবে? লরার জায়গায় বেট্রাকে রাখতে পারলেই তো সমস্ত ঝামেলা মিটে যায়। সমাধীস্থ করার সময়

বাইরের কোনো লোকজনকে না বলে, শুধুমাত্র ঠিকাদারদের দিয়েই কাজটা চুকিয়ে ফেলা যায়—ঠিকাদার তো আর লরাকে চেনে না। সমস্ত ব্যাপারটা কি সুন্দর খাপে খাপে মিলে যাবে তাহলে। কিন্তু খুব সাবধানে সারতে হবে কাজটা।

খালি থালাগুলো নিয়ে রান্নাঘরে নেমে এলো কার্ল।

'উনি ভালো মতো খেয়েছেন তো ?' জিগেস করলো বেট্রা।

'হ্যাঁ,' কার্ল বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে।

'কার্ল, তুমি আমাকে ভালোবাসো ?'

'তুমি তো তা জানো, বেট্রা। সত্যি কথা বলতে কি, ওপর-তলায় বসে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'উনি যখন থাকবেন না, তখনও তুমি আমাকে ভালোবাসবে ?'

'আরও বেশি করে বাসবো।'

'তাহলে শিগ্রিই সেদিন আসছে, কার্ল।'

'তার মানে ?'

শূন্য থালাগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে, কার্লের দিকে তাকালো বেট্রা, 'ব্যাপারটা ওঁর পক্ষে যাতে সহজ হয়, সেজন্যে ওঁর খাবারে আমি যথেষ্ট পরিমাণে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম।'

ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো কার্ল। তারপরেই অনুভব করলো, গুরুভার জিনিসটা মেঘের মতো তার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছে একটু একটু করে। বেট্রার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে মেঝের ওপরে হিংস্র ভাবে মোচড়াতে মোচড়াতে মরে যাবার আগে, কোনক্রমে ওকে শুধু 'মূর্খ' বলতে পারলো সে।

দ্য এম্পটি রুম : ডোনাল্ড হনিগ

বানর রাজা

জেড পাথর আমি বরাবরই ভালোবাসি। মুখের মধ্যে মিছরির মুচমুচে ঠাণ্ডা আস্বাদের মতো সবুজ জেড আমাকে নতুন করে চাঙা করে তোলে। হালকা লালচে রঙের জেড আমাকে মনে করিয়ে দেয়, পলকা ছুরি দিয়ে আকাশ খুদে ফুটিয়ে তোলা সূর্যাস্তের মেঘের কথা। আর সাদা জেড দেখলে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন অগুন্তি খুশিয়াল হিম-কণা তুষার প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো বাঘের মতো কুচকাওয়াজ করতে করতে নেমে যায়।

বাস্তবিক, জেডের কথা উঠলে আমার পক্ষে স্বাভাবিক থাকাই শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেজন্যে খরচাপাতি করার মতো সামর্থ্য আমার কোনদিনই নেই। আমি যদি লাখপতি হতুম, তাহলে জেড পাথরের একটা ব্যক্তিগত সংগ্রহ গড়ে তুলতুম। যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে, ওই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতুম···কোনো নামজাদা জাদুঘরে ওদের নিয়েই কাজকর্মে ডুবে থাকতুম। কিন্তু আমার না আছে অর্থ, না আছে শিক্ষা—নেহাত ছেলেবেলা থেকে আমাকে বাধ্য হয়েই শুধুমাত্র জীবন ধারণের প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে লড়াই চালাতে হয়েছে।···আমি একটা চোর।

অবিশ্যি তাই বলে আমি একটা যেমন তেমন সাধারণ চোর নই—আমি একজন জেড-বিশেষজ্ঞ। এবং জেড বলতে আমি কেবলমাত্র জেডাইট, নেফ্রাইট বা ক্লোরোমেলানাইট—অর্থাৎ সত্যিকারের খনিজ জেডই বোঝাচ্ছি না। বোঝাচ্ছি স্যাজুরাইট থেকে শুরু করে কোয়ার্জ অব্দি ওদের একগোষ্ঠীর সব কিছুকেই।

এই কারণেই ব্যাংককে আমার আগমন।

ব্যাংকক হচ্ছে সবুজ বানরের দেশ। রয়াল প্লাজার ঠিক পাশেই অপরূপ এক মন্দিরে প্রাচীন যুগের বানর-রাজা হনুমানের এক অসাধারণ প্রতিমূর্তি রয়েছে। পাঁচশো বছর আগে একটিমাত্র নিষ্কলঙ্ক

সবুজ জ্যাসপার খোদাই করে মূর্তিটা তৈরি করা হয়েছিলো। মূর্তিটা মাথায় পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার উঁচু, পরনে মহার্ঘ পোশাক, বারো ফুট উঁচু পিরামিড আকৃতির একটা সোনালি সিংহাসনে বসানো। সমস্ত এশিয়ার মধ্যে এটি একটি অন্যতম সেরা জেড। এটিকে অপহরণ করাই ছিলো আমার উদ্দেশ্য।

তামাম দুনিয়ায় চক্কর মেরে বেড়ানো যে জাহাজটাতে আমি স্যান ফ্রানসিসকো থেকে একজন সব চাইতে কম ভাড়ার যাত্রী হিসেবে উঠেছিলাম, সেটা ভোরবেলায় শ্যাম উপসাগরে চাও ফ্রায়া নদীর মুখে এসে নোঙর ফেললো। চ্যাপটা তলির একটা বিশাল বজরা আমাদের তিনশো জন যাত্রীকে তীরে নিয়ে যাবার জন্যে জাহাজের গায়ে এসে ভিড়লো। যাত্রীরা সকলেই অ্যামেরিকান। বজরাটা নদীর মুখে বালির বাধা পেরিয়ে, দুদিন ধরে ব্যাংকক দেখার জন্যে সকলকে তীরে নিয়ে যাবে এবং পরদিন সন্ধ্যায় ফের নদী পেরিয়ে সকলকে যাত্রী-জাহাজে পৌঁছে দেবে।

অবিশ্বাস্য হলেও, আমাদের মতো যাত্রী-জাহাজে চেপে আসা দুদিনের পর্যটকদের ক্ষেত্রে ব্যাংককে আসা বা ব্যাংকক থেকে যাবার জন্যে শুল্ক বিভাগীয় তল্লাশির কোনো বন্দোবস্ত নেই। এই কারণেই আমি একজন পর্যটক হিসেবে শহরে ঢোকার এবং শহর থেকে কেটে পড়ার মতলব এঁটেছিলুম।

শুধুমাত্র ক্যামেরার বিশাল ব্যাগ, দাঁত মাজার ব্রাশ, ক্ষুর আর ছাতাটা নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে জাহাজ থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর ব্যাংককে পৌঁছে সহযাত্রীদের সঙ্গ এড়িয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রতনোকোসিন হোটেলে গিয়ে উঠলুম। হোটেলটা রয়াল প্লাজা এবং সবুজ রঙের বানর-রাজার মন্দির থেকে মাত্র দুটো বাড়ি পরে। পরিচারক আমার ঘরটা দেখিয়ে দেবার পর, আমি জ্যাকেট আর টাই খুলে, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটা পূর্ণবেগে চালিয়ে দিয়ে, জিন পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলুম।

আশা ও আনন্দে দীপ্ত হয়ে পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে সমস্ত

পরিকল্পনাটা আমি পেশাদারী দৃষ্টিকোণ থেকে আরও একবার সতর্ক-ভাবে যাচাই করে নিলুম। কাজটা একেবারে চরম সহজ। আমার ক্যামেরার থলেটা সম্পর্কে কেউ যে কোনো প্রশ্ন তুলবে না, এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিত ছিলুম। যে শহরের হরেক মন্দির, খাল এবং মিনার ছবি তোলার পক্ষে এতো চমৎকার, সেখানে চিত্রগ্রাহীর সংখ্যা চীনদেশের আরশোলার মতোই অঢেল। আর আমার ছাতাটাকেও কেউ নিশ্চয়ই সন্দেহ করবে না, কারণ বর্ষা ঋতুর শুরুতে ব্যাংককের পথে-ঘাটে এটা একটা অতি সাধারণ দৃশ্য। আজ, এখন শনিবারের বিকেল। রোববারের আগে আমার আসল কাজ শুরু হচ্ছে না, কারণ সাধারণের জন্যে বানর-রাজার মন্দির শুধুমাত্র রোববারই খোলা থাকে।

রোববার একটু দেরী করেই ঘুম থেকে উঠলুম। দিনটা মেঘলা, যে কোনো মুহূর্তেই বৃষ্টি শুরু হবার আশঙ্কা। নিজেকে দিব্যি সতেজ লাগছিলো, আস্থা পাচ্ছিলুম নিজের ওপরে। মনের আনন্দে প্রাতরাশ শেষ করে ঘণ্টাখানেক ধরে হোটেলের লবিতে বসে তিনজন শ্যাম-দেশীয়ের বাজানো 'রানাড এক' বা বাঁশের জাইলোফোন বাজনা শুনলুম। তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে ক্যামেরার থলে আর ছাতাটা নিয়ে, সময়টা দেখে, সবুজ বানরের আবাসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলুম।

কারুকার্য করা মন্দিরটার অর্ধবৃত্তাকার ছাদের নিচে দরজাজোড়া যেমন উঁচু তেমনি চওড়া। দরজার গায়ে অসংখ্য মৌক্তিক সুন্দর ভাবে বসানো। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, শুক্তির ভেতরকার যে অংশটুকু মুক্তোয় পরিণত হয় তাকেই মৌক্তিক বলে।···দুধারে চকচকে টালির তৈরি একজোড়া দৈত্য মৌক্তিকগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়াও মন্দির যখন সর্বসাধারণের জন্যে খোলা হয়, তখন বেঁটে-খাটো শক্ত সমর্থ চেহারার জনা ছয়েক শ্যামদেশীয় পাহারাদার বাইরে থেকে মন্দিরটাকে টহল দিয়ে বেড়ায়।

মন্দিরের ঘণ্টাগুলোর সুমধুর টুংটাং শব্দ তখন সমস্ত ব্যাংককের বাতাসে ভরে রয়েছে। কিন্তু আমার কানে কিছুই ঢুকছে না। আমার দৃষ্টি তখন এক দিকে স্থির। খোলা দরজা দিয়ে আমি তখন অস্পষ্ট

তারপর ক্যামেরার ঝুলিটা থেকে যে বস্তুটি বের করলুম, সেটাই হচ্ছে আমার আসল পরিকল্পনাটির মোক্ষম অঙ্গ।

আপনারা কখনও কোনো কাচ তৈরির কারখানা দেখছেন কি? কাচ তৈরির চুল্লি নতুন করে সাজাবার আগে চুল্লির ভেতর থেকে এবড়ো-খেবড়ো ধরনের কিছু নিরেট সবুজ কাচের পিণ্ড বের করে নেওয়া হয়। হয়তো আপনারা তা দেখেন নি। কিন্তু আমি ক্যামেরার থলে থেকে যে জিনিসটা বের করে নিলুম, সেটা আসলে ঠিক তেমনি একটা ত্রিকোণ আকৃতির কাচের পিণ্ড। কিন্তু ওই ধরনের পিণ্ডগুলোর তুলনায় এটা এক বিষয়ে সম্পূর্ণ আলাদা—এটার ওপরের অংশটা কোনো রকমে খোদাই করে, মোটামুটি একটা বানরের মাথার মতো করে নেওয়া হয়েছে। সত্যিকথা বলতে কি, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এটাই আমার প্রথম প্রচেষ্টা এবং আমার ধারণা, এটা খুব একটা খারাপও হয় নি। ক্যালিফোর্নিয়ার একটা কারখানা থেকে এই কাচের পিণ্ডটা আমি হাতসাফাই করে নিয়ে এসেছিলুম। তারপর দীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ ধরে নিজের ঘরে বসে একমনে মিহি বালি ঘষে ঘষে ওটার চাকচিক্য নষ্ট করেছি, ওটাকে খোদাই করে বানরের মুখ বানিয়েছি।

জিনিসটাকে আস্তে করে মেঝের ওপরে রেখে, মইটাকে আমি বানর-রাজার সিংহাসনে ঠেস দিয়ে রাখলুম। তারপর এক হাতে টর্চ নিয়ে সাবধানে মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলুম। মূর্তিটার নাগাল পাবার মতো উচ্চতায় উঠে টর্চটাকে আমি মুখের মধ্যে ধরে, দু হাত দিয়ে বেদীর ওপর থেকে মূর্তিটাকে তুলে নিলুম। তারপর রাজ-পোশাক পরানো মূর্তিটাকে নিয়ে সন্তর্পণে ফের নিচে নেমে এলুম। এবারে মূর্তিটার দামী পোশাক আর মণিমুক্তো বসানো রাজমুকুটটা খুলে, সেগুলোকে আমার তৈরি করা বানরের মূর্তিটাকে পরিয়ে দিলুম। টর্চের আলোয় কাচের মূর্তিটা ভালো করে লক্ষ্য করে অখুশি হলুম না, নিজের মনেই মুখ মুচকে হাসলুম একটু। পোশাক আর মুকুটের আড়ালে এটার খুঁতগুলো অনেকটাই ঢেকে গেছে। অন্তত মন্দিরের স্বল্প আলোয় অতো উঁচুতে বসানো অবস্থায় দর্শনার্থীদের চোখে

প্রভেদটা সহসা ধরা পড়ার মতো নয়।

ফের মই বেয়ে উঠে কাচের মূর্তিটাকে আমি বানর-রাজার সিংহাসনে বসিয়ে দিলুম। মইটার জোড়া লাগানো অংশগুলো খুলে, ফাঁপা নলগুলোকে ছাতার বাঁটের মধ্যে ভরে নিলুম। তারপর, এতোক্ষণে এই প্রথম, টর্চের আলোটা মেঝের ওপরে রাখা আসল জেড পাথরের নগ্ন মূর্তিটার ওপরে ফেললুম।

মূর্তিটার সৌন্দর্য দেখে আমার একেবারে দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা! দু চোখ দিয়ে আমি গোগ্রাসে ওর সৌন্দর্য গিলতে লাগলুম। আঙুলের ডগা দিয়ে আস্তে করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলুম, গালে ঘষলুম, হাতে নিয়ে এক চক্কর নেচে নিলুম, আদর করলুম প্রাণ ভরে।···সবুজ রঙের বানর রাজা এখন আমার!

অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মূর্তিটাকে আমি ক্যামেরার ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলুম—যেখানে খানিকক্ষণ আগে পর্যন্তও কাচের পিণ্ডটা ছিলো। তারপর ঝোলার মুখ বন্ধ করে, মন্দিরের দরজা ফের খোলার অপেক্ষায় অন্ধকারের মধ্যে সিংহাসনের পেছনে চুপটি করে বসে রইলুম। মাথায় অজস্র চিন্তা। সময় কাটছে দ্রুতবেগে।···মন্দির খোলার মিনিট দশেক আগে মাথার ওপরে ছাদের শব্দ শুনে বুঝলুম, বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।···একটু পরেই মন্দিরের ভেতরে আলো জ্বলে উঠলো, অপরাহ্ণের দর্শনার্থীদের জন্যে খুলে গেলো মন্দিরের বিশাল দরজা।

ভয় ছিলো, দর্শনার্থীদের সংখ্যা অল্প হলে আমার পক্ষে হয়তো কারুর মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে কেটে পড়তে মুশকিল হবে। কিন্তু আমার আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও প্রচুর লোক ভেতরে এসে ঢুকলো। সিংহাসনের পেছন থেকে আনমনা ভাবে এক পা-দু পা করে এগিয়ে এসে আমিও একদল পর্যটকের সঙ্গে মিশে গেলুম। ভাঙা কাচের পিণ্ডটাকে আসল বানর-রাজার মূর্তি ভেবে ওদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে, মনে মনে খুব একচোট হাসতে হাসতে ওদের সঙ্গেই মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম আমি।

দরজার বাইরে এসে মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়া ছাদের আশ্রয়ে

দাঁড়িয়ে দেখি, প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। মনে মনে খুশিই হলুম। তারপর অধিকাংশ সঙ্গীদের মতো আমিও ছাতাটা খুলে বৃষ্টিতে নামার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিলুম। আমার কাঁধে ক্যামেরার ঝোলার নিরাপদ আশ্রয়ে সবুজ রঙের বানর-রাজা হনুমানের মূর্তি, খোলা ছাতার আওতায় ঝোলাটাও সম্পূর্ণ আড়াল হয়ে গেছে।...দরজার সামনে বর্ষাতি পরা টহলরত শ্যামদেশীয় পাহারাদাররা দর্শনার্থীদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখছিলো। সকালে যারা পাহারা দিচ্ছিলো, এরা সে লোক নয়—অতএব আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছাতা খোলার সংক্ষিপ্ত অবকাশটুকুতে পাহারাদারগুলোর জন্যে করুণা অনুভব করলুম আমি। ওদের জীবনের প্রতিটি রোববারেই ওরা সবুজ বানর-মূর্তিটাকে দেখছে, সত্যি। কিন্তু আমার মতো ওরা কি কোনদিনও ওই অসামান্য সবুজ জেড পাথরের অনাবৃত সৌন্দর্য দেখতে পেয়েছে? অনুভব করেছে তার হিমেল কোমল মসৃণতা? কোনদিনও কি দেখেছে, সবুজ পাথরে খোদাই করা এশিয়ার এক আশ্চর্য সৃষ্টির বুকে টর্চের দ্যুতি কি অবিশ্বাস্য রূপকল্প ফুটিয়ে তোলে? না, দেখেনি। বেচারা দেহরক্ষীর দল! ওরা শুধুই দেহরক্ষী মাত্র, তার বেশি কিছু নয়।

বৃষ্টিতে পা বাড়াতেই লক্ষ্য করলুম, ওদের মধ্যে একজনের চোখ-দুটো আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানিত অনুভূতি আমার শরীরের ভেতরে শিরশিরিয়ে উঠলো। মনে হলো, বিশ ফুট দূর থেকেও লোকটা আমার মনের কথা টের পেয়ে গেছে। কারণ আচমকা তার ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো—এক পলকের জন্যেও আমার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে সে এগিয়ে আসতে লাগলো ক্রমশ। এবং সেই সঙ্গে কাছের অন্য দুজন পাহারাদারকেও কি যেন ইঙ্গিত করে দিলো, তারাও অবিলম্বে এগিয়ে এলো আমার দিকে।

'খো আপিয়া,' প্রথমজন বিনীত ভাবে বললো। তারপরেই ইংরেজীতে বললো, 'মাফ করবেন স্যার, দয়া করে আমাদের সঙ্গে একটু আসবেন?'

'কেন?' বিস্ময়ে হতবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকালুম আমি।

'বৃষ্টিতে কথাবার্তা বলা যায় না। দয়া করে আমাদের গাড়িতে আসুন।' লোকটার ভঙ্গিমা ভীষণ ভদ্র, অথচ রীতিমতো কঠোর।

'আপনাদের সঙ্গে? গাড়িতে? আপনারা কি পাগল, নাকি?' সত্যিকারের বিপদের আশঙ্কায় আমার গলা বুজে আসে, ছাতার তলা থেকে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকি আমি।

অন্য পাহারাদার দুজন এগিয়ে এসে আমার দুহাতে আলতো করে হাত রাখে। 'আসুন,' বলে প্রথম লোকটা এগিয়ে যায় রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়িটার দিকে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন জুতোর মধ্যে খসে পড়ে। পাহারাদার দুজনের মাঝখানে অসহায়ের মতো এগিয়ে চলি গাড়িটার দিকে। কাঁধের ঝুলিটাকে আচমকা অসহ্য রকমের ভারি বলে মনে হয়। মনে হয়, বানর-রাজার ওজন বুঝি বা দশ লক্ষ পাউণ্ড।

ওরা আমাকে পুলিসের সদর দপ্তরে নিয়ে গেলো। সেখানে পুতুলের মতো একজন হাকিম সাহেব আমার পাহারাদারদের মুখ থেকে খানিকক্ষণ শ্যামদেশীয় বাক্য প্লাবন শ্রবণ করলেন। কথার মাঝে মাঝে ওরা বুড়ো আঙুলে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলো আমাকে। তারপরেই হাকিম সাহেবের মুচমুচে নির্দেশ—সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে পাসপোর্ট, ক্যামেরার ঝুলি আর ছাতাটা নিয়ে নেওয়া হলো। পলকের মধ্যে বানর-রাজাকে পেয়ে গেলো ওরা।

আমাকে কয়েদখানায় পুরে দেওয়া হলো। তখনও আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত। ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিলো না। পাহারাদারটা এক ঝলক তাকিয়েই আমাকে ধরে ফেললো। কিন্তু কি করে? সব কিছুই তো আমি সুন্দর মসৃণভাবে সেরে এনেছিলুম। তাহলে? নিশ্চয়ই লোকটা অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে। কিংবা কোনো জাদুবিদ্যার কারসাজি। সবাই বলে, প্রাচ্য দেশের মানুষরা কখনও কখনও অদ্ভুত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে। এটাও নিশ্চয় তাই।

ইংরেজী জানা যে পাহারাদারটি আমাকে নির্জন কুঠরিটাতে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করছিলো, তাকে জিগেস করলুম, 'আচ্ছা, আপনারা কি করে বুঝলেন যে আমিই বানর-রাজাকে চুরি করেছি ?'...বামাল সমেত আমি ধরা পরেছি, কাজেই নির্দোষী হবার ভান করা অর্থহীন।

'দুপুর বেলা একমাত্র আপনিই মন্দিরের ভেতরে ছিলেন,' লোকটা স্মিত মুখে তাকালো। 'সেটা খুবই সন্দেহজনক, তাই নয় কি ?'

'হ্যাঁ, খুবই সন্দেহজনক। কিন্তু আমাকে শুধুমাত্র দেখেই বা কি করে বুঝলেন যে আমি ভেতরে ছিলুম ?'

'বৃষ্টি,' চমৎকার ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো লোকটা।

'বৃষ্টি ?...কিন্তু তার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?'

'বিকেল বেলায় মন্দির খোলার আগেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিলো—তাইতো ?'

মাথা নাড়লুম আমি।

'তাতেই রহস্যটা খোলসা হয়ে গেলো।'...লোকটা চলে গেলো।

খুব দেরিতে হলেও তখন আলো দেখতে পেলুম আমি।...মন্দির থেকে বেরুবার সময় যখন আমি ছাতা খুলেছিলুম, তখন ছাতাটা শুকনো ছিলো।

মাংকি কিঙ্ : জেমস হোলডিং

আদিম অরণ্যে

কোনো স্বাভাবিক মানুষ এ ধরনের বেনামী ফোন করবে না। এ নিশ্চয়ই কোনো বাতিকগ্রস্ত মানুষের কাজ—নিশ্চয়ই কোনো জড়বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশী একটা ঝামেলা পাকিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।...জন রোশ দূরভাষ যন্ত্রটার দিকে তাকালো। না, এবারে সে কিছুতেই ওটার ডাকে সাড়া দেবে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার দিকে এগিয়ে যায় জন। আধ খোলা পর্দার ওধারে, লনটা পেরিয়ে, সারি সারি আলোকিত বাতায়ন।

সকলেই জনের প্রতিবেশী। কিন্তু ওদের মধ্যে কে ?···চিন্তাটা মনে জাগতেই নিজেকে সামলে নেয় জন। ও ধরনের একটা উড়ো ফোনে সে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। ঘুরে দাঁড়াতেই ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে তার। এগারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি। আর মাত্র ষাট সেকেণ্ড, তারপরেই যন্ত্রটা ফের বেজে উঠবে।···জনের ভেতরকার উত্তেজনা সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে। আলো আর বাতাস সবই যেন স্থির হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে—নিজের পারিপার্শ্বিক সব কিছুই অপরিচিত হয়ে ওঠে জনের কাছে।

দূরাভাষ বেজে উঠতেই জন নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যায়। গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরে সে, 'হ্যালো—'

কিছুক্ষণের বিরতি···কিন্তু সেটা স্বাভাবিক। তারপরেই শোনা যায় কণ্ঠস্বরটা। ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে উঠেছে কণ্ঠস্বরটা, তবু তা বিরক্তিকর। একজন প্রতিবেশী এবং এখনও তার পরিচয় অজ্ঞাত।

'জন, আমি আপনার স্ত্রীর কথা বলছিলাম।' কণ্ঠস্বরের অধিকারী জানালো, 'সেদিন আপনি যখন অনেক রাত অব্দি অফিসে কাজ করছিলেন, তখন আপনার স্ত্রী আবার তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো। তবে এ জন্যে আপনার স্ত্রীকে দোষ দেবেন না। লোকটা ভীষণ চালাক, মেয়ে পটাতে দারুণ ওস্তাদ।'

'এক মিনিট', জন বললো, 'আপনি কে কথা বলছেন ?'

'আপনার একজন প্রতিবেশী।'

'কিন্তু ওতে করে তো কিছুই বলা হলো না।'

'তা হয়তো হলো না, কিন্তু আমার নামটা আপনাকে না জানানোই ভালো। হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি—যে লোকটা আপনার স্ত্রীর কাছে আসে, সে-ও আপনার একজন প্রতিবেশী।'

'কে সে ?'

'আপনি তাকে আপনার একজন বন্ধু বলে মনে করেন। সে-ও ওই রকমের একটা ভান করে এবং···'

'আপনি এ সমস্ত কথা জানলেন কি করে ?'

'আমার চোখ আছে এবং আমি জানি, কবে কবে আপনি বেশি রাত অব্দি কাজ করেন। আপনার সেই তথাকথিত বন্ধুটিও তা জানে। তখনই সে আপনার স্ত্রীর কাছে আসে। আমি আমার জানলা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করেছি। লোকটা একেবারে ঘড়ির মতো নিয়মিত—আপনি বাড়িতে ফেরার আধঘণ্টা আগেই সে কেটে পড়ে।'

গ্রাহযন্ত্রটা চেপে ধরে জন। মিথ্যে…সমস্ত মিথ্যে কথা। এর একটা বর্ণও তার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। গ্রাহযন্ত্রটা সশব্দে রেখে দিতে ইচ্ছে করে তার। কিন্তু রেখে দিলেও ফের ফোন আসবে।…

'আচ্ছা, আপনি কেন আমাকে এ সমস্ত কথা বলছেন, বলুন তো?' প্রশ্ন করে সে।

'কারণ, আমি আপনার বন্ধু।'

'সত্যিই যদি আমার বন্ধু হন, তবে আপনার নামটা আমাকে জানাচ্ছেন না কেন?'

কিছুক্ষণের বিরতি। তারপর লোকটা ফের বললো, 'তা জেনে আপনার কোনো লাভ হবে না। তা ছাড়া আমি এর মধ্যে জড়িত হয়ে পড়তে চাই না। আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছি এবং আমার ধারণা, সেটুকুই যথেষ্ট। হয়তো আপনি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে চান না। কিন্তু সে জন্যে আমি আপনাকে দোষীও বলতে পারি না—কারণ সেটা সত্যিই খুব যন্ত্রণাদায়ক। তবে চিরদিন কি আপনি এ ভাবে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে পারবেন?'

জন কোনো জবাব দেয় না। গ্রাহযন্ত্রটা রেখে দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দেয়ালের দিকে। দেয়ালটা যেন একটু একটু করে সরে গিয়ে একটা ফাটল ফুটিয়ে তোলে। সেখান থেকে চোখ মেলে বাইরের রাস্তাটা দেখতে পায় জন। ওই রাস্তাটার ধারেই তার বাড়ি, তার প্রতিবেশীদের বাড়ি। ওই বাড়িগুলোর মধ্যেই একটা বাড়িতে সেই অজ্ঞাতপরিচয় লোকটা রয়েছে, যে ওকে উড়ো ফোন করে। আর অন্য একটাতে রয়েছে আরও একজন, যে…

বেস্পতি আর শনিবার দিন জন অনেক রাত অব্দি শহরে কাজ করে, বাড়িতে ফেরে রাত দশটায়। ওই দিনগুলোতে যদি সে তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরবে বলে আশা করে, তাহলে আগেই গ্রেসকে ফোন করে খবরটা জানিয়ে দেয়।

শুক্রবার দিন রাতে সে অপরিচিত প্রতিবেশীর ফোনের মাধ্যমে সাবধানী সংকেত পেয়েছিলো বলে পরদিন সন্ধ্যাবেলায় গ্রেসকে ফোন না করেই আগে আগে বাড়ির দিকে রওনা হলো। নটা পনেরোর সময় বাড়ির কাছাকাছি একটা সরাইখানায় গাড়ি থামিয়ে দু পাত্তর মদ গিলে নিলো জন। দশ মিনিট পরে নিজের বাড়িতে গাড়ি হাঁকিয়ে এসে রাস্তার উলটো দিকে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু কেউই বাড়ি থেকে বেরোলো না। অবশেষে গ্রেসকে অবিশ্বাস করার জন্যে লজ্জিত হয়ে সাড়ে দশটার সময় গাড়ি থেকে নেমে এলো সে। এমন একটা উড়ো খবরে বিশ্বাস করেছিলো বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিলো তার।

জন যখন বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো, গ্রেস তখন দূরদর্শন দেখছিলো। বললো, 'আজ কিন্তু তোমার ফিরতে বেশি দেরী হয়েছে।' জনের অভিব্যক্তিকে ক্লান্তির চিহ্ন বলে ভুল করলো ও। এগিয়ে গিয়ে তাকে চুমু দিলো গ্রেস, 'আজ নিশ্চয়ই তোমার খুব খাটুনি গেছে! তুমি বসো, আমি তোমার রাতের খাবারের বন্দোবস্ত করি গে।'

এগারোটার সময় দূরভাষ বাজলো। গ্রেস সাড়া দিতেই, অপর প্রান্ত থেকে কেটে দেওয়া হলো লাইনটা। তিতিবিরক্ত হয়ে জনের দিকে তাকালো গ্রেস, 'আবার সেই ধরনের ফোন! কি যে বিচ্ছিরি লাগে! আচ্ছা, আমরা কি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারি না?'

'তেমন কিছুই করার নেই,' জবাব দিলো জন। 'তবে ও নিয়ে সম্ভবত দুশ্চিন্তা করারও কিছু নেই। ছেলে-ছোকরারা ও সব করতে ভালোবাসে।'

জনের কথায় শান্ত হয় গ্রেস। কয়েক মিনিট পরেই ও শুতে চলে যায়। সারাটা দিন যদিও খুব পরিশ্রম গেছে, তবু জন ক্লান্তি অনুভব

করে না—বৈঠকখানায় বসে সান্ধ্য-পত্রিকাটা পড়তে থাকে।

আধঘণ্টা বাদে ফের দূরভাষ বেজে ওঠে, গ্রাহযন্ত্রটা তুলে ধরে জন। সেই বেনামা ফোন।···প্রচণ্ড রাগে কয়েক মুহূর্ত জন কোনো ভাষা খুঁজে পায় না।

'আজ রাতে তেমন কিছু ঘটে নি', লোকটা বললো। 'আপনার স্ত্রীর বন্ধুটির আজ অন্যত্র একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিলো। তবে সে আবার আসবে। আশা করি সেদিনও আপনি তার জন্যে অপেক্ষা করবেন, যেমন আজ করেছেন।'

'আপনি আমাকে দেখেছেন?'

'দেখেছি বইকি, আমার জানলা দিয়েই দেখেছি। যাক গে, অনেক রাত হলো। তাহলে শুভরাত্রি—'

গ্রাহযন্ত্রটা নামিয়ে রাখে জন। সে কিছু চিন্তা করতে পারছিলো না, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেকার রাগটা ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে গেছে। গ্রেসের প্রেমিকটি তাহলে কে? কোন প্রতিবেশীটি? জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে জন। নিস্তব্ধ রাস্তা। সারি সারি নিঝুম অট্টালিকা। তার অনুপস্থিতিতে কে এ বাড়িতে এসেছিলো, কোথাও তার কোনো ঠিকানা নেই।

অবশেষে বেস্পতি বার ঘটনাটা ঘটলো।

বাড়ির উলটো দিকে গাড়ি থামিয়ে অপেক্ষা করছিলো জন। এতো উত্তেজনা, যে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতে পারছিলো না সে। পাঁচ মিনিট—যেন অনন্ত সময়—আস্তে আস্তে কেটে গেলো। সমস্ত কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠছিলো তার, অথচ এক অদ্ভুত শীত শীত ভাব অনুভব করছিলো সে। ধীরে ধীরে অনুভূতিটা তার সমস্ত দেহ মন অধিকার করে ফেললো। যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্যে একটু একটু করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিচ্ছিলো জন।···আজ রাতেই ঘটনাটা ঘটবে—আজ রাতেই একটা মানুষকে খুন করবে সে।

কিন্তু কাকে? এই প্রশ্নটাই তাকে উত্যক্ত করে তুলছিলো। যদি

তা জানতো, তা হলে কাজটা তার পক্ষে অনেক সহজ হয়ে যেতো।... আরও কয়েক মিনিট সময় বৃথাই কেটে গেলো। সময় বয়ে যাচ্ছে, অথচ কিছুই ঘটছে না। তবে কি আজও শনিবারের রাত্রির ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে?

আচমকা একটা দরজা খোলার শব্দ জনকে সচকিত করে তোলে—মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার উলটো দিকে তাকায় সে।...তার বাড়ির বারান্দায় একটা লোক। সিঁড়ি পেরিয়ে দ্রুত পায়ে নেমে আসছে লোকটা... ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। লোকটা পাশপথে নেমে আসতেই তাকে চিনতে পারে জন।

'জর্জ?'

থমকে দাঁড়িয়ে, চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নেয় লোকটা। জন ফের তাকে ডাকতেই, জর্জ সরাসরি তাকায় তার দিকে। একটু যেন ইতস্তত করে। তারপর রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে আসতে থাকে জনের দিকে।

গাড়ির কাছে এসে জর্জ ভেতরের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওঃ তুমি! তা, এখানে বসে রয়েছো কেন?'

এক মুহূর্ত কোনো জবাব না দিয়ে জর্জের দিকে তাকিয়ে রইলো জন। তাহলে তুমিই সেই ব্যক্তি—ভাবলো সে। যদিও জর্জ তার নিকটতম বন্ধু, কিন্তু এখন তাতে আর কিছুই এসে যায় না...সে সব কিছুই এখন শেষ হয়ে গেছে। জনের মনে এখন কোনো অনুভূতির লেশমাত্র নেই, শুধু ভয়ঙ্কর এক মুখব্যাদিত শূন্যতা।

'গাড়িতে ওঠো,' বললো সে।

'কি হয়েছে, জন?'

'কিছু না, গাড়িতে ওঠো—' কথাটা জোর দিয়ে বোঝাবার জন্যে নিজের হাতটা তুলে ধরলো জন, আলোর আভা ঝিকমিকিয়ে উঠলো পিস্তলের কালো নলটাতে। 'চালকের আসনে গিয়ে বোসো।'

দরজা খুলে স্টিয়ারিঙের সামনে হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়লো জর্জ।

'এবারে চালাও—'

নির্দেশটা বিভ্রান্তিকর। কারণ কোন্ দিকে যেতে হবে, জন তা বলে নি।

'কোথায় যেতে হবে?' জর্জের নিজের কানেই কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন ফ্যাসফেসে শোনায়। এ কণ্ঠস্বরটা কি তারই?

'জানি না চালাতে থাকো।'

'আমি…' কপালের পাশে রগের কাছটাতে পিস্তলের স্পর্শ অনুভব করে স্তব্ধ হয়ে যায় জর্জ। সে মরতে চায় না। সে…

রাস্তাঘাট কি অন্ধকার আর নির্জন, ভাবলো জর্জ। মানুষজন সব গেলো কোথায়? একটা খসে পড়া তারা কালো আকাশটাকে দুভাগ করে ছিঁড়ে দিয়ে পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। রাস্তাটা নেমে এলো উতরাইতে। গাছগুলো এগিয়ে আসছে ক্রমশ। সামনেই হোয়াইট ওকস—এক ফালি সঙ্কীর্ণ বনভূমি, যেমন করেই হোক বুলডোজারের কুচকাওয়াজকে উপেক্ষা করে যা এখনও নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেছে।

'আমরা কোথায় চলেছি?' জিগেস করলো জর্জ। জবাব দিলো তার কপালের পাশে ঠেস দিয়ে রাখা পিস্তলের কঠিন অথচ শীতল নলটা। আকাশের মতো কালো বনাঞ্চলটা এগিয়ে আসছে ক্রমেই। কোথাও এক বিন্দু আলো নেই, এক টুকরো শব্দ নেই, কোনো জন মানুষেরও চিহ্ন নেই। এমন কি প্রেমিক যুগলসহ এমন কোনো গাড়িও দাঁড় করানো নেই, সাহায্যের জন্যে চিৎকার করলে যারা হয়তো বা সাড়া দিতে পারতো।

'এখানে থামো,' জন বললো।

জর্জ ব্রেক কষলো। গাড়ি থেকে নেমে এসে উলটো দিকের দরজার কাছে দাঁড়ালো জন, 'বেরিয়ে এসো।'

'কেন?'

'প্রশ্ন কোরো না। যা বলা হয়েছে, তাই করো।'

সামান্য ইতস্তত করে গাড়ি থেকে নেমে এলো জর্জ। সামনেই বিস্তৃত প্রান্তর। তার বুক চিরে একটা আঁকাবাঁকা পায়ে চলা

পথ বনভূমির আগ্রাসী অন্ধকারের মাঝে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে।

'চলো,' জন বললো।

পায়ে চলা পথ ধরে প্রান্তরটা পেরিয়ে এলো ওরা। সামনেই বনভূমি—যেন নিকষ ছায়ার এক ঘনকৃষ্ণ প্রাচীর। গাছগুলো অতি প্রাচীন, কিন্তু বিশাল ও মজবুত। পথটা আরও অস্পষ্ট এবং আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে, অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রাণহীন বিরাট দানবের মতো বাকল খুলে নেওয়া একটা মৃত ওক গাছ পড়ে রয়েছে পথের ধারে। শেষ ডালপালা আর পাতাটা খোয়ানো সত্বেও মৃত্যুর মধ্যে মহান হয়ে রয়েছে গাছটা।

'এখানে,' বললো জন। থেমে দাঁড়ালো দুজনে। গাছগাছালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে দূরের বাড়িগুলোর আলোকিত জানলাগুলি যেন টিমটিম করে জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগে কালো আকাশটাকে দুভাগ করে ছুটে যাওয়া তারাটার কথা মনে পড়লো জর্জের, এক নিবিড় আতঙ্কে সমস্ত অনুভূতি ভরে উঠলো তার। জনকে সে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে চাইছিলো। বুঝিয়ে সে বলতে পারে। কিন্তু জন তাকে মুখ বন্ধ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। একে উন্মাদ, তার ওপরে হাতে পিস্তল। ওকে খ্যাপানো চলবে না। যতো কম কথা হয়, ততোই মঙ্গল। কিন্তু সে যদি কিছুই না বলে···

জর্জ এগিয়ে গিয়েছিলো খানিকটা। ফিরে আসতেই জন বললো, 'ঘুরে দাঁড়াও।'

শরীরকে শিরশিরিয়ে তোলা এক অদ্ভুত অনুরোধ।

'কেন?'

'আমি তোমাকে বলেছি, তাই।'

জনের নির্দেশ মেনে চললে ভুল করা হবে। কিন্তু কি করে জর্জ এর প্রতিবাদ জানাবে? পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালো সে, কাঁপতে লাগলো থরথর করে। এক্ষুনি তাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে···এই মুহূর্তে ···অতি দ্রুত। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর, তার অসমাপ্ত ব্যাখ্যা পিস্তলের

শব্দে হারিয়ে যায়—মৃত ওক গাছটার ওপরে মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়ে জর্জ।

বাড়ির আলোগুলোকে এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে। তখনকার চাইতে অনেক উজ্জ্বল। যেমনটি হওয়ার কথা।

এক লাফে বাড়ির বারান্দায় উঠে এলো জন। জঙ্গলের ঘটনাটা সম্পর্কে তার মনে এখন আর কোনো অনুভূতিই খেলা করছে না। অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়াময় শরীর শুধু ছিটকে পড়ছে আর উধাও হয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা তার স্মৃতিতে এতোই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মনে হচ্ছে যেন তা কোন্ দূর অতীতের ঘটনা। মৃত বন্ধুর জন্যে জনের মনে আর কোনো অনুভূতিই নেই।···বন্ধু!

বন্ধ তালার গায়ে নিজের চাবিটা গলিয়ে নিলো জন।

"ওই এসেছে! তোমার এতো দেরী হলো কেন, জর্জ?"

বৈঠকখানায় এসে ঢুকলো জন। গ্রেসের মুখখানা নিচের দিকে নামানো। জর্জের স্ত্রী রবার্টা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে শূন্য দৃষ্টিতে।

ঘরের আলোগুলো ইতিমধ্যে উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে। রাতের উষ্ণ বাতাস যেন শিরশিরে হয়ে উঠেছে আচমকা। দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখা পুতুলের মতো গ্রেস আর রবার্টা তাকিয়ে রয়েছে জনের দিকে—যেন সে একটা অপরিচিত আগন্তুক।

'আমরা ভেবেছিলাম, তুমি জর্জ।' গ্রেস বললো, 'জর্জ সেই কখন রাস্তার মোড় থেকে আইসক্রিম আনতে গেছে, কিন্তু এখনও ফিরে এলো না।'

কি করে ফিরবে জর্জ? সে তো জঙ্গলের মধ্যে একটা মরা ওক গাছের পেছনে পড়ে রয়েছে। মরে গেছে।·· ভুল···সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। জর্জ কক্ষনো গ্রেসের প্রেমিক ছিলো না।

'তুমি একটু মোড়ে গিয়ে দেখবে?' রবার্টা বললো, 'আমি জানি, জর্জ আড্ডা মারতে ভালোবাসে। কিন্তু সেই কখন গেছে···'

জন কোনো কথা বলতে পারছিলো না। ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেলো

সে এবং পাঁচ মিনিট বাদেই ফিরে এসে জানালো, জর্জ আইসক্রিমের দোকানে আদৌ যায় নি।

'তাহলে নিশ্চয়ই ওর কিছু হয়েছে,' আশঙ্কায় কেঁদে ফেললো রবার্টা।

খুনী। ভুল করে একটা নিরপরাধ মানুষকে খুন করে ফেলেছে জন। এখন কি হবে? জন ভাবলো, সে কি পুলিসের কাছে গিয়ে ধরা দেবে? না, অতোটা সাহস তার নেই। বরঞ্চ ওরাই তাকে খুঁজে বের করে অভিযুক্ত করুক। না, সে নিজে থেকে কিছুই বলবে না। এবং যতোদিন সে নিজে থেকে কিছু না বলবে, ততোদিন সে নিরাপদ। কেউই তাকে সন্দেহ করবে না।

নিরাপদ? কিন্তু সেই লোকটা—যে নিজের জানলা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে, উড়ো ফোন করে? কাল কেউ হয়তো জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে লাশটা দেখে ফেলবে। তখন সবাই খুনের ঘটনাটা জানবে···আর সেই অজানা লোকটা তখন ফোন করে পুলিসকে সব কথা ফাঁস করে দেবে।···কিন্তু আজ রাতে যা ঘটেছে, লোকটা এখন অব্দি তা জানে না। হয়তো যথারীতি আজও সে জনকে ফোন করবে। কাজেই এখনও কিছুটা আশা আছে। লোকটা যদি জর্জকে তার গাড়িতে ঢুকতে না দেখে থাকে, তাহলে সে কোনো সাক্ষ্যই দিতে পারবে না। আর যদিও বা পারে, তাহলেও হয়তো তাকে এ কথা বোঝানো সম্ভব হবে যে, এই মারাত্মক ভুলে তারও সমান দায়িত্ব রয়ে গেছে। কাজেই এই অপরাধে সে-ও সমান অপরাধী। হয়তো এভাবেই লোকটাকে চুপ করিয়ে দেওয়া যাবে।

রাত এগারোটার সময় দূরভাষ যন্ত্রটাকে নাগালের মধ্যে নিয়ে অপেক্ষা করে রইলো জন। কিন্তু মূক যন্ত্রটা নীরবতা বজায় রেখেই চললো। স্থাণু হয়ে বসে রইলো জন। নিবিড় উদ্বেগের মধ্যে একটা ঘণ্টা কেটে গেলো একটু একটু করে। তবু কোনো ফোন এলো না। জন তথাপি অপেক্ষা করে রইলো। কারণ সে জানতো না—যে তাকে

ফোন করতো, সে চিরদিনের মতো নিশ্চুপ হয়ে গেছে···তার ঠাণ্ডা এবং শক্ত হয়ে ওঠা দেহটা অন্ধকার অরণ্যে মরা ওক গাছটার পাশে পড়ে রয়েছে টানটান হয়ে।

ডেড ওক ইন এ ডার্ক উডস : হাল এলসন

বিপন্ন বিস্ময়

দস্তানাপরা শক্ত হাতে দড়িটা আঁকড়ে ধরে ভণ্ডারহার্স্টের শোবার ঘরের জানলার কার্নিসে নেমে এলো নেড স্প্যাংলার। আটতলা নিচে নাইনথ এভিন্যুতে তখনও যানবাহনের অবিশ্রান্ত স্রোত, অগুন্তি গতিশীল আলোকবিন্দু আর নৈশ বাতাসের অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি। রাস্তার উলটোদিকের অফিসবাড়িটা সম্পূর্ণ অন্ধকার—কাজেই কারুর চোখে ধরা পড়ার মতো কোনো আশঙ্কা নেই। ভণ্ডারহার্স্টের ঘরের ভেতরটা দেখে নেবার জন্যে সন্তর্পণে নিজের মাথাটা এগিয়ে দিলো নেড স্প্যাংলার।

শোবার ঘরটাতে আলো জ্বলছিলো। শূন্য ঘর। কিন্তু স্প্যাংলার যা খুঁজছিলো, তা সযত্নে সাজানো ছিলো বিশাল খাটটার ওপরে। সাবধানে জানলার কাচটা তোলার চেষ্টা করলো সে। সামান্য শব্দ করে ওপরের দিকে উঠে গেলো শার্সিটা।

ঘরের অপর প্রান্তে বন্ধ দরজার ওধার থেকে হাসি, নারীকণ্ঠে অনুযোগ আর গ্লাসের ঠনঠান আওয়াজ ভেসে আসছিলো। মজলিসী আওয়াজ। মৃদু হাসলো স্প্যাংলার। পত্রিকার যে পৃষ্ঠায় এসব মজলিসের খবর বেরোয়, সেটা তস্করদের পরম বন্ধু। একটা আলতো দোল খেয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে, খাটে বিছানো অভ্যাগতদের ফারের মহার্ঘ পোশাকগুলোর দিকে তাকালো নেড। তারপর জামার ভেতর থেকে বড়সড়ো একটা চটের থলে বের করে পোশাকগুলোর দিকে এগিয়ে গেলো।

কিন্তু নেড যখন প্রথম কোটটা—কালো রঙের একটা দামী কোট দ্রুত হাতে থলের মধ্যে গুঁজে নিচ্ছে, ঠিক তখনই ঘরের দরজাটা খুলে গেলো। ফারের পোশাকটার অপরূপ ঐশ্বর্যের দিকে নত হয়ে থাকা অবস্থাতেই মেয়েটির দিকে তাকালো সে, তারপর এক লাফে জানলার দিকে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো। অবিশ্যি লাফটা সে আর দিলো না, কারণ মেয়েটি ততোক্ষণে ওর সান্ধ্য ব্যাগটা থেকে একটা ছোট্ট অথচ ভয়ঙ্কর-দর্শন অটোম্যাটিক বের করে নিয়েছে।

সুন্দর ধূসর চোখ দুটির অপলক দৃষ্টি স্প্যাংলারের দিকে অবিচল রেখে পা দিয়ে আধখোলা দরজাটা বন্ধ করে দিলো মেয়েটি। ওর পরনের শুভ্র সান্ধ্য পোশাকটা ওর নিখুঁত দেহখানিকে যেন আরও অপরূপ স্তুতিময় করে তুলেছে। সোনালী চুলগুলো মাথার পেছন দিকে টেনে বাঁধা। সুচারু ভাস্কর্যের শোভা আঁকা মুখখানি প্রসাধনের স্পর্শ-বিহীন। এবং ওর চোখদুটিতে এক আশ্চর্য দীপ্তি, যে দীপ্তির সঠিক অর্থ স্প্যাংলার কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না।

'আমার ধারণা, একেই 'হাতে-নাতে-ধরা' বলে,' ঠাণ্ডা গলায় বললো মেয়েটি। পিস্তলের নলটা কিন্তু এক বিন্দুও নড়লো না।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হলো স্প্যাংলার। মেয়েটা তাহলে গুলি ছুঁড়বে না বা চিৎকারও করবে না—অন্তত এই মুহূর্তে তো নয়ই।

'হ্যাঁ, তাই বলে বটে,' জবাব দেবার সংক্ষিপ্ত অবকাশে জানলাটার দূরত্ব দেখে নিলো স্প্যাংলার। নাঃ, মেয়েটা গুলি চালানোয় একেবারে এলেবেলে হলেও তার পক্ষে জানলা দিয়ে পালানো সম্ভব হবে না।

'কি নাম তোমার?'

প্রশ্নটা এতোই অভাবিত যে মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় স্প্যাংলার।

'পুলিস সেটা পরে আপনাকে জানিয়ে দেবে,' কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পরে জবাব দেয় সে।

'সেটা হয়তো না-ও হতে পারে। হয়তো আমরাই একটা বোঝা-পড়া করে নিতে পারি।'

স্প্যাংলার কি মেয়েটির ঠোঁটের কোণদুটি চোরা হাসিতে ঈষৎ উঁচু হয়ে উঠতে দেখলো? 'আমি আদৌ কোনো বোঝাপড়া করার মতো অবস্থায় আছি, তা বলা চলে না', জবাব দিলো সে।

'ঠিক সেই কারণেই আমি প্রস্তাবটা রেখেছি,' মেয়েটির ধূসর চোখে কৌতুকের ছবি ফুটে ওঠে। 'তোমার মতো একটা মানুষ—এই সমস্ত কাজই যার জীবিকা—যার মুখে অমনতরো একটা কাটা দাগ···পুলিস খুব সহজেই তার হদিশ করে, তাকে সনাক্ত করে ফেলতে পারবে।'

বাঁ গালের লম্বা কাটা দাগটাতে আঙুল বুলিয়ে নেয় স্প্যাংলার। দশবছর আগে সার্কাসের দলে একটা ঝগড়ার ফলস্বরূপ একজন সহ-খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আঘাতটা পেয়েছিলো সে।

মেয়েটা ঠিকই বলেছে। এমন ভাবে দাগী হয়ে যাওয়া একজন প্রাক্তন দড়াবাজিকরকে খুঁজে বের করা পুলিসের পক্ষে মোটেই কঠিন হবে না।

'অতএব আমি তোমাকে এ ঘর থেকে যেতে দিলেও, তোমার যা পরিস্থিতি—তাতে তোমার পক্ষে বোঝাপড়া করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।' বন্ধ দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সপ্রশংস চোখে স্প্যাংলারের দিকে তাকালো মেয়েটি।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও মেয়েটির মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলো না স্প্যাংলার।

'বলে ফেলুন,' বললো সে।

'আমার টেলিফোন নম্বর, ইয়র্ক টাউন ৫-০:০৫।' শান্তগলায় সংখ্যাটা পুনরাবৃত্তি করলো মেয়েটি, 'তিন দিনের মধ্যে আমাকে ফোন করবে, আর তা না হলে···'

'আপনি সব কিছু ফাঁস করে দেবেন,' ওর কথা থামিয়ে বললো স্প্যাংলার।

ঘাড় নেড়ে সায় জানালো মেয়েটি। তারপর চকচকে পিস্তলটা স্প্যাংলারের দিকে অবিচল রেখে খাটের ওপর থেকে একটা ফারের চাদর তুলে নিলো। 'পার্টি-টার্টি থেকে আমি চিরদিনই একটু

আগে আগে সরে পড়ি', স্প্যাংলারের দিকে মুখ রেখে পায়ে পায়ে দরজা অব্দি পিছিয়ে গিয়ে পিস্তলটা হাতব্যাগের মধ্যে রেখে দিলো ও। 'আমার ধারণা, অন্তত মিনিট দশেকের মধ্যে অন্য কোনো অতিথি এ ঘরে এসে ঢুকবে না।' ফের ওর ঠোঁট দুটিতে হাসির ইঙ্গিত ফুটে ওঠে 'সেই সময়টুকু তুমি কিভাবে কাজে লাগাবে, তা তোমার ব্যাপার।'

পরক্ষণেই দরজার বাইরে চলে গেলো মেয়েটি। এক মুহূর্ত স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো স্প্যাংলার। তারপর কাজে হাত লাগালো। সব চাইতে ভালো ভালো জিনিসগুলো বেছে নিয়ে দ্রুত এবং সুদক্ষ হাতে এমনভাবে সেগুলোকে ভাঁজ করে নিলো, যাতে সেগুলো থলেতে গুঁজে রাখতে সব চাইতে কম জায়গার প্রয়োজন হয়। পোশাকের আলমারিটাও দেখে নিলো সে এবং সেখানেই সব থেকে সেরা জিনিসটা পেয়ে গেলো, যেটা মিসেস ভণ্ডারহার্স্টের নামের আদ্যাক্ষর লেখা কালো মিঙ্কের একটা লম্বা কোট।

কাজ শেষ করে থলির মুখে দড়ির বাঁধনটা টেনে দিয়ে, এক লাফে জানলার তাকে উঠে পড়লো স্প্যাংলার। ঘরের চারদিকে শেষ বারের মতো চোখ বুলিয়ে নিলো একবার। তারপর ফুলেফেঁপে ওঠা থলিটা কোমরবন্ধের সঙ্গে বেঁধে, দড়ি বেয়ে ছাদে উঠে পড়লো। এবারে দড়িটাকে বাড়ির পেছন দিকে ঝুলিয়ে দিলো সে। তারপর সেটার সাহায্যে জরুরী প্রয়োজনের সিঁড়িতে নেমে এসে, সিঁড়ি বেয়ে নিচের সরু গলিটাতে নেমে পড়লো। ওই গলিতেই তার গাড়িটা দাঁড় করানো ছিলো।...পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরেই বাড়িতে ফিরে যথারীতি কাজ-শেষের পানীয়তে একটু একটু করে চুমুক লাগাবে সে, পকেটের রেস্তও বেড়ে যাবে পুরো পাঁচ হাজার ডলার।

তৃতীয় দিনে মেয়েটিকে টেলিফোন করলো স্প্যাংলার। নিজের নামটা ওকে বলতেই হলো এবং, অবাক কাণ্ড, মেয়েটিও তাকে নিজের নাম জানালো—ভেরোনিকা অ্যাকলিং। নামটা শুনেই মিসেস

ভণ্ডারহার্স্টের মতো একজন ধনবতী এব কারুশিল্পের পৃষ্ঠপোষকের বাড়িতে আয়োজিত ককটেল পার্টিতে মেয়েটির উপস্থিতির কারণ বুঝতে পারলো স্প্যাংলার। ভেরোনিকার স্বামী, হার্বার্ট অ্যাকলিং, দুর্লভ পুঁথিপত্রের একজন সুপরিচিত সংগ্রাহক এবং খবরের কাগজের বিশেষ স্তম্ভে অ্যাকলিঙের নাম প্রায়ই দেখা যায়।

ভেরোনিকা আদৌ মুখচোরা মেয়ে নয়। বোঝাপড়ার ব্যাপারটাতে স্প্যাংলারের ভূমিকা কি হবে, তা ও স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিলো। বললো যে, ওর স্বামীর অজ্ঞাতে ওর অলঙ্কারগুলো স্প্যাংলারকে চুরি করতে হবে এবং এজন্যে সে বিমার টাকার দশ শতাংশ ছাড়াও অলঙ্কারগুলো থেকে যে টাকা পাওয়া যাবে, তারও দশ শতাংশ পাবে। ভেরোনিকা আরও জানালো, ওর স্বামী নেহাতই কিপটে, প্রতিটা ডলার টিপে টিপে খরচ করেন এবং হাত-খরচ হিসাবে ভেরোনিকা যা পায়, তা ওর রুচি-মাফিক চলার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। স্প্যাংলারকে ও এই বলে আশ্বস্ত করলো যে, এই চুরি এবং তারপরে বিমা কোম্পানীর সঙ্গে মিটমাট করে নেবার ব্যাপারগুলো ওর স্বামীর অজ্ঞাতেই সেরে ফেলা যাবে—কারণ একটা দুর্লভ প্রথম সংস্করণের বই খোঁজ করার জন্যে আসছে মাসে তিনি ইউরোপে থাকবেন।

ব্যাপারটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিলো, যা স্প্যাংলারের কাছে ঠিক সুবিধের বলে মনে হচ্ছিলো না। স্বভাবত সে সুশৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষ এবং কাজকর্ম সে একা একাই করে থাকে—কাজেই এ ব্যাপারটা হয়তো সে এড়িয়েই যেতো। নিজের কাজে সে কোনো সঙ্গী-সাথী চায় না, প্রয়োজনও অনুভব করে না—অন্তত ভেরোনিকা অ্যাকলিঙের মতো একজন মহিলা, যার থই পাওয়া বলতে গেলে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার—তেমন সঙ্গী তো কখনই নয়। কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে মেয়েটা তাকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে।

অলঙ্কারগুলো নব্বুই হাজার ডলারে বিমা করা আছে শুনে অনেকটা স্বস্তি পেলো স্প্যাংলার। তার মানে সুনিশ্চিত নহাজার ডলার। তাছাড়া গয়নাগুলো বিক্কিরি করার সময় দামটা খানিকটা

কমাতে হলেও, তার শতকরা দশ ভাগ—ভালো পয়সাই হবে। আগে সার্কাসের দলে থাকার সময়েও গয়নাগাঁটি চুরি করেছে স্প্যাংলার। কাজেই সে জানে, নব্বুই হাজারী গয়নাপত্র চোরাপথে লোভাতুর অথচ দ্বিধাগ্রস্ত হাতে গিয়ে পড়লে, কখনো সখনো তিরিশ হাজারেও নেমে আসে।

চুরি করার জন্যে অবিশ্বাস্য রকমের সহজ পরিকল্পনাটা স্প্যাংলারকে বাতলে দিলো ভেরোনিকা। স্প্যাংলারও বিষয়টার খুঁটিনাটি ভাবতে ভাবতে টেলিফোন করার খুপরি থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

রাত ছুটোর সময় রবারের তলি লাগানো জুতো পরে নিঃশব্দে পাঁচ সারি সিঁড়ি পেরিয়ে ফ্রিমণ্ট অ্যাপার্টমেণ্ট বিলডিঙের সব চাইতে ওপরের তলায় উঠে এলো স্প্যাংলার। পাশের বার্টন আর্মসেই অ্যাকলিংদের বাস। সে বাড়ির মতো এ বাড়িটা অতোটা জাঁকালো নয় বলে, এ বাড়িতে কোনো দারোয়ানও নেই। দ্রুত পায়ে লম্বা বারান্দাটা পেরিয়ে, ভেরোনিকার কথা মতো ছাদে ওঠার পথ খুঁজে পেলো স্প্যাংলার। পথ আগলে রাখা সস্তা তালাটা খুলে ফেলতেই আচমকা একরাশ ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার সর্বাঙ্গে।

বার্টন আর্মস এবং ফ্রিমণ্ট অ্যাপার্টমেণ্টের মাঝখানকার রাস্তাটা চওড়ায় দশ ফুট। কিন্তু স্প্যাংলার সহজেই একলাফে বার্টন আর্মসের ছাদে এসে পড়লো। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ছাদের ধার ঘেঁষে ঠিক অ্যাকলিঙদের জানলার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো সে। তারপর ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া দড়িটা যাতে ওপরের তলাগুলোর জানলা দিয়ে দেখা না যায়, সে জন্যে ফুট চারেক পাশের দিকে সরে এলো। এবারে স্প্যাংলার তার দড়িটার একটা প্রান্ত বেঁধে নিলো বাজ আটকাবার লোহার ডাণ্ডাটার সঙ্গে। অন্য প্রান্তটা যাতে হাওয়ায় না দোলে, সে জন্যে তার সঙ্গে কিছুটা ওজন বাঁধা ছিলো। ত্রস্ত হাতে দড়িটা এবারে সে বাড়ির ধার ঘেঁষে নিচের দিকে নামিয়ে দিলো।

ভেরোনিকার সঙ্গে আগেকার সিদ্ধান্ত মতো হার্বার্ট অ্যাকলিঙের জানলাটা বন্ধ করাই ছিলো। কিন্তু কাচ কাটার একটা চমৎকার

যন্ত্রের সাহায্যে স্প্যাংলার দ্রুত সে সমস্যাটার সমাধান করে ফেললো। তারপর দস্তানা পরা হাতে ছিটকিনি খুলে, আস্তে আস্তে জানলাটা তুলে, হার্বার্ট অ্যাকলিঙের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বাড়িতে অবশ্যই কেউ ছিলো না। অ্যাকলিঙ ইউরোপে এবং বিমা কোম্পানীর যে কোনো সম্ভাব্য সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্যে একটা জোরদার অ্যালিবি প্রতিষ্ঠিত করতে ভেরোনিকাও বাড়ির বাইরে। ঘটনাটা যে প্রকৃতই ডাকাতি, তা বোঝাবার জন্যে টর্চের স্বল্প হলদে আলোয় সমস্ত ফ্ল্যাটটা আঁতিপাঁতি করে হাতড়ালো স্প্যাংলার। এমন কি টেবিলের ওপর থেকে একটা দামী লাইটারও পকেটস্থ করলো। তারপর শোবার ঘরে গিয়ে পোশাকের আলমারির সব কটা দেরাজ টেনে খুললো। অবশেষে ওপরের দেরাজে একগাদা এলোমেলো রুমাল আর নাইলনের মোজার জটলার পেছনে গয়নার বাক্সটা খুঁজে পেলো সে।

বাক্সটা মেঝেতে রেখে, খুব সহজেই তালাটা খুলে ফেললো স্প্যাংলার। টর্চের আলোয় ঝলমল করে উঠলো মহার্ঘ অলঙ্কারগুলো। এগুলোর দাম যে নব্বুই হাজার ডলার, তা সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলো তার। প্রতিটা ঝকঝকে অলঙ্কারের তারিফ করতে করতে দ্রুত হাতে ওগুলোকে সে জ্যাকেটের সেলাইয়ের ফাঁকে গলিয়ে নিলো। কাজ শেষ করে ফের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে টর্চের আলোটা চতুর্দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো একবার। তারপর নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো।

'আলোটা নিভিয়ে দাও, লক্ষ্মীটি,' চাদরটা চিবুক অব্দি তুলে, স্প্যাংলারের বিছানায় শুয়ে থাকা ভেরোনিকা কণ্ঠস্বরে 'আদুরে সুর ফোটালো। ওর চোখদুটি বন্ধ। এবং যদিও ওর দুই ভুরু মাঝখানে একটি মৃদু কুঞ্চন রেখা, তবু 'অধরে অস্ফুট হাসির রেশ।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। স্প্যাংলার বিছানার ধারে বসে নিজের সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলো। সে জানতো, ভেরোনিকাকে সে

ভালোবেসে ফেলেছে। ভেরোনিকা তাকে ভাগের টাকাটা দেবার পরে তারা দুজনে একসঙ্গে বসে কয়েক পাত্র পান করেছে, কথা বলেছে এবং এক সময় আবিষ্কার করে ফেলেছে যে তারা দুজনেই দুজনার প্রতি ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে বেশবাস সেরে ফেলা স্প্যাংলার বোতাম টিপে বিছানার পাশে রাখা আলোটা নিভিয়ে দিতেই খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ভোরের আধো-আলো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মাথার নিচে একটা বালিশ গুঁজে. ভেরোনিকাকে ঘিরে থাকা মহার্ঘ সুগন্ধির ঘ্রাণ নিয়ে মৃদু হাসলো স্প্যাংলার।

'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে,' স্প্যাংলারের কাঁধে মাথা রাখলো ভেরোনিকা। 'আমার ইচ্ছে, তুমি আবার আমার ঘরে ডাকাতি করবে।'

'কি বলছো তুমি। আমি কি ঠিক শুনেছি?'

'মতলবটা কিন্তু সত্যিই তেমন কিছু খারাপ নয়। এর আগেও তুমি একই জায়গায় দুবার করে হানা দিয়েছো। এটা তোমার বৈশিষ্ট্য।'

'ধরা পড়ার ব্যাপারে আমি আদৌ চিন্তিত নই.' স্প্যাংলার বললো। 'তাছাড়া আমার ধারণা. এবারেও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর চোখে ধুলো দেওয়া যাবে। কাজটা যে একই লোকের, সে বিষয়ে কারুরই কোনো সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু অতো লোভ করা কেন?'

'আসছে সপ্তাহে হার্বার্ট ফের পারীতে যাচ্ছে।' শান্তগলায় ভেরোনিকা বললো, 'তখন ফের যদি একটা চুরি হয় এবং এবারের মতো সেবারেও আমি যদি এতোগুলো টাকা পাই, তাহলে আমি ওকে ছেড়ে চলে যাবো। গয়নাগুলো তো আমার। হার্বার্ট না হয় বিমার টাকাটা ফেরত পাবার চেষ্টা করবে—অবিশ্যি তাও যদি আমাকে খুঁজে পায়।'

'তুমি তাহলে কোথায় থাকবে?'

'তোমার সঙ্গে।'

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে রইলো স্প্যাংলার। সে বুঝতে

পারছিলো, গতবারের মতো এ বারেও এ ব্যাপারে তার নিজস্ব মতামতের কোনো দাম নেই। ভেরোনিকা তাকে ফাঁসাতে চাইলেও সে কোনো ভাবেই ভেরোনিকাকে এর মধ্যে জড়াতে পারবে না।

'তোমার নতুন গয়নাগুলোতে কতো টাকার বিমা করা আছে?' জিগেস করলো স্প্যাংলার।

'আশি হাজার। বিমা কোম্পানীর কাছ থেকে পাওয়া টাকার মধ্যে আমার অংশ দিয়ে আমি চুরি হয়ে যাওয়া গয়নাগুলোর বদলে নতুন গয়না করে নিয়েছি। হার্বার্ট অবিশ্যি এ সমস্ত ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও জানে না। আমি কি গয়না পরি, আদৌ পরি কি না, হার্বার্ট তা কোনদিনই খেয়াল করে দেখে না।'

ভেরোনিকার ব্যাগ থেকে সিগারেট নেবার জন্যে রাত-টেবিলটার দিকে হাত বাড়ালো স্প্যাংলার।

'এবারে গয়না বিক্রি করে যা পাবে, তার অর্ধেক বখরা তোমার।'

এমন মোটা রোজগার হলে আর অনেক দিনই ঝুঁকি নিয়ে কোনো কাজ করতে হবে না, ভাবলো স্প্যাংলার। তা ছাড়া ভেরো-নিকাও তার সঙ্গে কেটে আসবে—এটাই বা কম কি!

'রাজী,' ভেরোনিকাকে আস্তে করে নিজের কাছে টানলো স্প্যাংলার।

মৃদু হাসলো ভেরোনিকা। 'আমরা একসঙ্গে মিলে খরচ করবো টাকাটা,' স্প্যাংলারকে চুমু দেবার আগে বললো ও।

এক সপ্তাহ বাদে ফের কাজে নামলো স্প্যাংলার। ফ্রিমণ্টের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে পড়লো সে। তারপর এক লাফে পাশের বাড়ির ছাদে এসে হাতের দড়িটা নামিয়ে দিলো নিচের দিকে। হার্বার্ট অ্যাকলিঙের জানলা অব্দি নেমে এসে স্প্যাংলার সবিস্ময়ে দেখলো, ঘরে আলো জ্বলছে। তবে কি ভেরোনিকা আলোটা নিভিয়ে যেতে ভুলে গেছে? অতি সন্তর্পণে ভেতরের দিকে তাকালো স্প্যাংলার। দেখলো, ঘরে স্বয়ং হার্বার্ট অ্যাকলিং—স্কুলের ছেলেদের মতো

ঝিমোনোর ভঙ্গিতে তাঁর মাথাটা টেবিলের ওপরে নামানো। টেবিল আর সামনের খোলা বইটার পাতায় এক ঝলক টকটকে লাল রক্ত। স্প্যাংলার এতোক্ষণে খেয়াল করলো, তার সামনের জানলাটা সপাটে খোলা এবং জানলার ঠিক কাছেই মেঝেতে বিছানো পুরু কার্পেটের ওপরে একটা চকচকে কালো অটোম্যাটিক—যেটা ভেরোনিকা সব সময় নিজের হাতব্যাগে বয়ে বেড়ায়।···সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো স্প্যাংলার।

ঠিক তখনই হঠাৎ ভেরোনিকা দরজার কাছে এসে তীক্ষ্ণ স্বরে, অনেকক্ষণ ধরে, একটা আর্তচিৎকার করে উঠলো। অথচ স্প্যাংলার এবং অ্যাকলিঙের লাশটাকে দেখা সত্ত্বেও ওর মুখ অভিব্যক্তিহীন··· সেটা ও হয়তো তারিফ করার মতো উপযুক্ত কোনো দর্শকের জন্যেই আলাদা করে রেখেছে। পরক্ষণেই পেছন ফিরে ছুট লাগালো ভেরোনিকা।

বিদ্যুৎগতিতে দড়ি বেয়ে ফের ছাদে উঠে পড়লো স্প্যাংলার। ইস, এমন একটা সম্ভাবনার কথা কেন সে আগে থেকে চিন্তা করে নি? এখন ভেরোনিকা, যে ভেরোনিকাকে সে ভালোবেসেছিলো, সেই ভেরোনিকাই অ্যাকলিঙের বিমার টাকাটা পেয়ে যাবে। কিন্তু তার চাইতে আরও একটা প্রয়োজনীয় বস্তু ওর হাতের মুঠোয়—সেটা হচ্ছে পুলিসের হাতে তুলে দেবার জন্যে খুনীর হদিস।

পাশের বাড়ির ছাদে যাবার জন্যে ঝাঁপ দেবার মুহূর্তে দূর থেকে সাইরেনের কাঁপা কাঁপা আওয়াজ শুনতে পেলো স্প্যাংলার। এখন নিজের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না, তা নিয়ে সে আর কোনো পরোয়া করে না। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিচের দিকে নামতে লাগলো সে। সাইরেনের শব্দটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। আরও···আরও কাছে এসে পড়বে—একেবারে কাছে।···

একতলায় নেমেই বারান্দা ধরে পেছনের দরজাটার দিকে ছুট লাগালো স্প্যাংলার। আর ঠিক তখনই আচমকা সদর দরজাটা খুলে গেলো। একটা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো স্প্যাংলার, 'থামো!'···

গুলির শব্দটা সে শুনতে পায় নি, কিন্তু একটা কিছুর আকস্মিক আঘাতে তার কাছাকাছি দেয়ালটা থেকে এক রাশ চাকলা উঠে এলো। একটুও ইতস্তত না করে পেছনের দরজায় ঘা দিলো সে। দরজা খুলে গেলো —সরু গলিটাতে বেরিয়ে এলো স্প্যাংলার··· যে গলিটা সামান্য কয়েক মুহূর্ত আগেই সে পাঁচতলার ওপর থেকে এক লাফে পেরিয়ে এসেছিলো।

এক মুহূর্তের সামান্য এক ভগ্নাংশের জন্যে একটু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দম ছেড়ে নিলো স্প্যাংলার, তারপর ফের ছুটতে শুরু করলো ঊর্ধ্বশ্বাসে। একটা বাড়ির উঁচুতলার এক জানলা থেকে এক মহিলা চিৎকার করে উঠলেন, 'খুনে · ওই যে খুনেটা!'···পরক্ষণেই গলিটার যেদিকে স্প্যাংলার ছুটে যাচ্ছিলো, সে দিকে একটুকরো লালচে আলো ঠিকরে উঠলো।···গোড়ালির ওপরে একটা পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো স্প্যাংলার। এবারে শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণাও অনুভব করলো সে।

তখনও স্প্যাংলার সম্পূর্ণ সচেতন। দুধারে উঁচু উঁচু বাড়িগুলোর মাঝখানে শীতের উজ্জ্বল তারায় ভরা একফালি আকাশ। পিঠের নিচে শান বাঁধানো পথের কঠিন শীতল স্পর্শ। কিন্তু ওর হাত দুটো এলিয়ে রয়েছে উষ্ণ আর আঠালো কি একটা পদার্থের ওপরে। স্প্যাংলার বুঝতে পারলো, সে দ্রুত রক্ত হারিয়ে ফেলছে।

কর্তৃত্বব্যঞ্জক গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো, 'সরে যান, সরে যান আপনারা।···অ্যাম্বুলেন্স না আসা অব্দি কাউকে গলিতে ঢুকতে দেবে না।'

অ্যাম্বুলেন্সের জন্যে এখন আর পরোয়া করে না স্প্যাংলার। সে শুধু ভাবছিলো ভেরোনিকার কথা। এবং অদ্ভুত হলেও, ভেরোনিকার ওপরে এতটুকুও রাগ হচ্ছিলো না তার।···এটা ছিলো একটা খেলা।' খেলায় ভেরোনিকা তাকে হারিয়ে দিয়েছে এবং সেজন্যে ভেরোনিকাকে সে শুধুমাত্র তারিফই করতে পারে। যদি সে আশা না করে যে ভেরোনিকাই বিমার টাকাটা উপভোগ করবে, তাহলে ধিক্ স্প্যাংলারকে।

থিভস্ অনার : জন লুৎজ

শেষ পরিচ্ছেদ

আমার ধারণা, জীবিত বা মৃত—এমন সাংবাদিক সম্ভবত একজনও নেই, যিনি জীবনের কোনো না কোনো সময়ে একখানা মহান উপন্যাস লেখার কথা স্বপ্ন দেখেছেন। এমন উপন্যাস, যা জীবিকা অর্জনের নোংরা প্রতিযোগিতা থেকে তাঁকে মুক্তি দেবে, যার জন্যে তিনি সহকর্মীদের কাছ থেকে অর্জন করবেন আন্তরিক ঈর্ষা।...বলাবাহুল্য, আমিও এর ব্যতিক্রম নই।

ইতিমধ্যেই আমি যে এমন একখানা বই লিখে ফেলতে পারিনি তার একটা কারণ হচ্ছে এই যে, অবসরের অবকাশে আমি দু হাঁটুর মাঝখানে আমার টাইপ যন্ত্রটাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় না কাটিয়ে, তার বদলে এ পেশায় নিযুক্ত অন্যান্য আশান্বিত মানুষদের মতো টুফিজ ট্যাভার্নে বসে রাজনীতি, বিদেশ-নীতি, প্রতিবাদ করার অধিকার, সুগৌর স্বর্ণকেশী বনাম শ্যামাঙ্গী পিঙ্গলকেশী—এবং এই ধরনের অন্যান্য সমান জরুরী বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু আসল কারণ, যা আমি সততই নিজেকে বলেছি তা হচ্ছে এই যে, লেখার মতো তেমন দুনিয়া-কাঁপানো বিষয়বস্তু আমি আজও পাইনি। এবং যতোদিন তা না পাচ্ছি, ততোদিন শুধু শুধু কাগজ আর টাইপ যন্ত্রের ফিতে নষ্ট করার কোনো অর্থ ই হয় না। তবু আমার মন প্রতি মুহূর্তেই অনুসন্ধান চালিয়ে গেছে—প্রতীক্ষা করে থেকেছে তেমন কোনো বিরাট ভাবধারণার জন্যে, যা আমার প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলবে...যার জন্যে উপন্যাসটা বলতে গেলে আপনা থেকেই লেখা হয়ে যাবে।

যাই হোক, মাইক কেলসনের শেষতম উপাখ্যানটা যখন দেশের প্রতিটা প্রধান প্রধান খবরের কাগজে আচমকা বড় বড় শিরোনামায়

ফেটে বেরুলো, তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম, এটার জন্যেই আমি এতোদিন অপেক্ষায় ছিলাম কি না। ব্যাপারটা নিয়ে যতোই চিন্তা করতে লাগলাম, ততোই আমার আরও বেশি করে প্রত্যয় জন্মাতে শুরু করলো, অবশেষে এতোদিনে আমি খাঁটি জিনিসটা পেয়ে গেছি। ঘটনাটা সংক্ষেপে এই :

বস্তি অঞ্চলের বাসিন্দা মাইক কেলসন প্রথম যেদিন রাস্তা ধরে হাঁটতে শিখেছিলো, সেদিনই অপরাধীর জীবন বেছে নিয়েছিলো—কিংবা নিতে বাধ্য হয়েছিলো। ত্রিশ বছর বয়েস হবার মধ্যেই সে বহুবার গ্রেপ্তার হয়েছে, ছিঁচকে চুরির অপরাধে কয়েকবার সাজা পেয়েছে এবং কয়েক বছর কারাদণ্ডও ভোগ করেছে। তারপরেই এলো পার্কের সেই চরম রাত্রি, যেদিন নিয়ম মাফিক টহল দেবার সময় অফিসার ম্যাক ক্ল্যাসকি ছোট ছোট গাছের ঘন জঙ্গলের আড়াল থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলেন—যেটাকে তিনি 'যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ' বলে বর্ণনা করেছেন। পিস্তল বাগিয়ে তিনি তখন দ্রুত সেদিকে এগিয়ে যান এবং দৃশ্যস্থলে পৌঁছে দেখতে পান, একটা লোক ঘাসের ওপরে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে আর তার হৃৎপিণ্ডটা বুকের মাঝখানকার একটা ফুটো দিয়ে শরীরের শেষ রক্তটুকুকেও সবেগে ঠেলে বের করে দিচ্ছে। লোকটার দিকে যে মানুষটা ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলো তারই নাম মাইক কেলসন—তার হাতে একটা ছুরি, ছুরিটার পাতলা ফলা বেয়ে তখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে।

মাইকের বক্তব্য অবিশ্যি কেউই বিশ্বাস করে নি। মাইক বলে-ছিলো, সেদিন রাত্রিবেলা পার্কের ভেতর দিয়ে যাবার সময় সে ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পায়। ব্যাপার-টার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে দেখতে পায়, একটি অল্পবয়সী মেয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে—তার শরীরে পোশাক আশাক প্রায় নেই বললেই চলে এবং একটা লোক মেয়েটির গলার সামনে একটা ছুরি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কথাও কেউ বিশ্বাস করে নি যে, মাইক তখন দ্রুত লোকটাকে আক্রমণ করে, লোকটা ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে

পড়ে তার ওপরে, মেয়েটি পোশাক-আশাক সামলে পালিয়ে যায় এবং ধস্তাধস্তির সময় ছুরিটা সোজা ঢুকে যায় লোকটার বুকে।

আগে থেকেই মাইকের নামটা পুলিসের খাতায় ছিলো। এদিকে মৃত ব্যক্তি, বার্টাস সি. ম্যাকলেস নামক জনৈক ভদ্রলোক ছিলেন একজন সম্মানিত নাগরিক। কাজেই মাইককে গিয়ে ঢুকতে হলো গ্যাস চেম্বারে।

তারপর, মাইক কেলসনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যাবার সংবাদটা খবরের কাগজে ছেপে বের হবার ছুদিন পরে, একটি মূর্ছারোগগ্রস্ত মেয়ে পুলিসের সদর দপ্তরে ছুটে এসে ফোঁপাতে ফোঁপাতে তার কাহিনীটা জানায়। মেয়েটির নাম মেরি হেজথর্ন, বয়েস পনেরো বছর, কাকিমার কড়া শাসনে মানুষ। ছুরি দেখিয়ে ওকে ঝোপের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করা হয়। মেয়েটি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে অন্য মানুষটা যদি ছুটে এসে সেই অত্যাচারীর ওপরে ঝাঁপিয়ে না পড়তো, তাহলে নিজের শনাক্ত হবার সম্ভাবনাকে দূর করার জন্যে শয়তানটা অবশ্যই ওকে খুন করে ফেলতো। যাই হোক, ধস্তাধস্তির অবকাশে মেয়েটি তখন পোশাক-আশাক সামলে পালিয়ে যায়। তারপর মানসিক আঘাত, ফলে ইউরোপ ভ্রমণ এবং অবশেষে ফের কাকিমার কাছে ফিরে আসা। লজ্জায় এতোদিন মুখ বন্ধ করে রেখেছিলো ও, নিজের অভিজ্ঞতার কথা কাউকেই বলে নি। মাইক কেলসনের বিচার বা তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ—কোনো খবরই মেয়েটি পড়ে নি। কিন্তু হঠাৎ মাইকের গ্যাস চেম্বারে যাবার খবরটা পড়ে সম্পূর্ণ ঘটনাটা ওর আবার মনে পড়ে যায়। তারপর ছুদিন মূর্ছাহত হয়ে থাকার পর, ও পুলিসের কাছে ছুটে এসেছে।

এই হচ্ছে কাহিনী—ন্যায়-নীতিভ্রষ্ট মাইক কেলসন, আইনের বিপরীত পথেই যার গতিবিধি, সে বীরের মতো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করেছে। কিন্তু বীরের পদক পাবার বদলে অদৃষ্টের পরিহাসে সেই কাজের জন্যেই তাকে যেতে হয়েছে গ্যাস চেম্বারে।

অতএব আমি কাজে লেগে গেলাম। সমস্ত পত্রিকাগুলো ঘেঁটে-ঘুঁটে ওই ঘটনা এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত চরিত্রগুলো নিয়ে দিন-রাত ঘরে বসে টাইপ যন্ত্রে মুসাবিদা করতে শুরু করলাম। এমন কি টুফিজ ট্যাভার্নেও যাতায়াত করা একদম ছেড়ে দিলাম। আমি যে একখানা বই লিখছি—দেখতে দেখতে সে কথাটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে সহকর্মীরা এমন ভাব দেখাতে শুরু করলো, যেন আমি মঙ্গল গ্রহ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আসা একটা বিরক্তিকর জীব। আপনারা যদি কোনোদিন কোনো বই লিখে থাকেন অথবা লেখার চেষ্টাও করে থাকেন—তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কি বলতে চাইছি। বই লিখছে? ওই শ্রীমান? হুঁঃ—

কিন্তু দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের পর, যা আমি জীবনেও করিনি, যখন আচমকা আবিষ্কার করলাম যে বইটা আসলে ছাই-ভস্ম ছাড়া কিছুই হয় নি, তখন আমার মানসিক অবস্থা যে কি দাঁড়ালো, তা আপনারা সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন। যে সস্তা কাগজে আমি বইখানা লিখেছি, দেখলাম বইটার দাম ওই কাগজের দামের চাইতেও কম। মোদ্দা কথা, খবরের কাগজের মালমশলাগুলো একত্র করে আবেগ মথিত গদগদ ভাষায় যা লিখেছি, তা ইতিমধ্যেই সকলের পড়া হয়ে গেছে।

কিন্তু হতাশার নিতল কালো গহ্বরে তলিয়ে যেতে যেতেও আমি হাল ছাড়লাম না। কারণ অফিসের ওই হতচ্ছাড়া ভাঁড়গুলোর কাছে আমাকে নিজের যোগ্যতা দেখাতেই হবে, নয়তো বাকি জীবনটা মুখ বুজে ওদের উপহাস সয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোনো পথ থাকবে না।

দুঃখ ভুলতে আমি কিন্তু টুফিজ-এ গেলাম না। তার বদলে, জীবনে এই প্রথম, বিষয়টার মুখোমুখি হয়ে রাতের পর রাত একটানা সংগ্রামী সাধনা চালিয়ে অবশেষে বুঝতে পারলাম, গোলমালটা কোথায়।…মাইক ক্লেলসনকে আমি এমন একটা চরিত্রের রূপ দিতে পারিনি যার প্রতি পাঠকের মনে সহানুভূতির জন্ম হয়, যার সঙ্গে পাঠকের

একাত্মবোধ জেগে ওঠে। আমার কাহিনীতে বিচারের ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন অবশ্যই ছিলো। কিন্তু তার চাইতেও বেশি প্রয়োজন ছিলো, শেষের সেই নিদারুণ দিনগুলোতে নির্জন কারাকক্ষে সাহায্যের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকা মানুষটার মানসিক অবস্থা হৃদয় দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। মাইক কেলসন যে আশায় বুক বেঁধে প্রতীক্ষা করছিলো তা হচ্ছে, আসল সত্যটা কেউ নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে—অথচ সে জানতো, প্রতীক্ষার প্রতিটি দিনে সে আরও একদিন করে গ্যাস চেম্বারের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আসলে বইটাতে মনের সবটুকু অনুভূতি ঢেলে একটা শেষ পরিচ্ছেদ লেখা দরকার। যদিও কথাটা চিন্তা করে আমি স্নায়বিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়লাম, কিন্তু ওই চরম পরিচ্ছেদে প্রকৃত পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার জন্যে আমাকে কি করতে হবে—তা বুঝতে আমার এতোটুকুও দেরি হলো না।

পরদিন সকাল বেলা একটু তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছে আমি সোজা পত্রিকার সম্পাদক জে. টি. টলম্যানের কাচের খুপরিতে ঢুকে পড়লাম। বললাম, 'আমার দু সপ্তাহের ছুটি দরকার।'

টলম্যান চোখ তুলে তাকালেন, ওঁর খুদে খুদে চোখের ওপরে পাতলা ভ্রূ জোড়া ধনুকের মতো বেঁকে উঠলো।

বললাম, 'সবেতন ছুটি।'

'তুমি এখানে যোগ দেবার পর থেকে তো সবেতন ছুটিতেই রয়েছো', বললেন টলম্যান।

অপমানটা গায়ে না মেখে বললাম, 'ছুটিটা জরুরী। আমি একখানা বই লিখছি।'

'জানি,' টলম্যান ঘাড় নাড়লেন, 'মহান উপন্যাস।'

ওঁর কথা বলার ভঙ্গিমাটা আমার ঠিক পছন্দ হলো না। বললাম, 'তা হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। সবই নির্ভর করছে আমি আপনার কাছ থেকে কতোটা সহযোগিতা পাবো, তার

ওপরে।' তারপর ওঁকে জানালাম, আমি ঠিক কোন্ জিনিসটা চাইছি।

আমার কথা শেষ হতে টলম্যান আমার দিকে এমন করে তাকালেন, যেন আমার যে মানসিক অবস্থাটার কথা তিনি অনেক দিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন, আমার কথাগুলো তাঁকে সে বিষয়েই নিশ্চিত করে দিলো।

'তুমি একটি উন্মাদ,' উনি বললেন। 'যাই হোক, আমি ওসব পারবো না।'

'তার মানে আপনি যে সব বড়ো বড়ো কথা বলেন, সমস্ত তা বড়া তা বড়া মানুষের সঙ্গে আপনার গলায় গলায় আলাপ আছে বলে বড়াই করেন—সে সমস্তই তবে ফাঁকা আওয়াজ···তার মধ্যে সার পদার্থ বলতে তেমন কিছুই নেই।'

অনেকক্ষণ ধরে যাচাই করে নেবার ভঙ্গিমায় আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন টলম্যান। ওঁর ঠোঁটের একটা কোণ—যে কোণটাতে সিগারেট ধরানো রয়েছে, সেটা বেঁকে বাঁ চোখের দিকে উঠে গেছে। সিগারেটের সর্পিল ধোঁয়া এড়ানোর জন্যে বাঁ চোখটা বন্ধ।

'আসলে আপনার তেমন ক্ষমতাই নেই,' ফের বললাম, 'এ কাজটা করা আপনার পক্ষে অসাধ্য।'

ব্যস, এতেই কাজ হাসিল। এমন কোনো জিনিস যদি থেকে থাকে যা টলম্যান কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারেন না, তা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। সম্ভবত এ জন্যেই তিনি দেশের এ অঞ্চলে সেরা পত্রিকা-সম্পাদকদের মধ্যে একজন।

দু দিন বাদে রাষ্ট্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের সারির একটা কুঠরীতে আমার স্থান হলো। আমার সঙ্গে পেন্সিল আর নোটবই। গায়ে ক্রমিক সংখ্যা ২৪২৪০৩ লেখা ধূসর উর্দি। কুঠরীতে শৌচাশয় আর প্রস্রাবখানা দুইই আছে। আর আছে পান করার জন্যে কাগজের পেয়ালা, একখানা তক্তোপোষ, আর একটা কুর্সি।

আমি যে এখানে রয়েছি, তা কেবল মাত্র জে. টি. টলম্যান, কয়েদখানার ওয়ার্ডেন সিম্‌স্ আর কুঠরীগুলোর নজরদারদের জানার কথা এবং শুধুমাত্র টলম্যানই জানেন, কেন আমি এখানে রয়েছি। গোপনীয়তা রক্ষার সুকঠোর শর্তে আমাকে এখানে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমি যে এখানে ছিলাম, তা এখান থেকে বেরিয়ে কোনো মতেই ফাঁস করা চলবে না। এখানে থাকলে মানসিক আঘাত কতোখানি তীব্র হতে পারে, তা অনুভব করার জন্যেই আমি এখানে এসেছি—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

অনুভূতিটা আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পেতে শুরু করলাম। জায়গাটাতে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা, সমাধি মন্দিরের মতো গাঢ় নৈঃশব্দ্য। আমার ঠিক আগের কুঠরীটা থেকে নিচু গলায় প্রায় অস্পষ্ট যে গোঙানির আওয়াজটা ভেসে আসছিলো, সেটা নৈঃশব্দ্যকে দূর না করে বরং আরও ভয়াবহ করে তুলছিলো। গোঙানিটা বস্টওয়েলের। ওয়ার্ডেন আমাকে সংক্ষেপে ওর সম্পর্কে সমস্ত কথা জানিয়ে দিয়েছেন। লোকটা এখন শেষ যাত্রার পথিক। আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন বাদে লোকটা বিস্মৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়া পথের শেষতম দীর্ঘ অংশটুকু পরিক্রমা করবে।

এই সারিতে শুধুমাত্র আমরা দুজনেই রয়েছি। বারান্দার শেষ প্রান্তে লোহার একটা বিশাল দরজার সাহায্যে অন্যান্য কয়েদী—তথা বাদবাকি গোটা দুনিয়া থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। জীবিত ও মৃতের মাঝামাঝি এটা যেন নরকের সীমান্ত অঞ্চল।

অবিলম্বে আমি কাজে লেগে গেলাম। আমার পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছুর বর্ণনা, যা কিছু আমার চোখে ধরা পড়ছে—তা সবই লিখে নিতে লাগলাম। তাছাড়া চেষ্টা করতে লাগলাম, মৃত্যুদণ্ড পাওয়া মানুষটার জায়গায় নিজেকে রেখে অনুভূতির তীব্রতাকে একান্ত করে তুলতে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই কেমন যেন ভয় ভয় করতে শুরু করলো, মনে হলো একটু ধূমপান করা প্রয়োজন। আমার সঙ্গে আধ প্যাকেট সিগারেট অবশিষ্ট রয়েছে, কিন্তু দেশলাই নেই।

কয়েদীরা যাতে নিজেদের বিছানা-পত্র কিংবা পোশাক-আশাকে আগুন ধরাতে না পারে, সেজন্যে তাদের কাছে কোনো রকমের দাহ্য পদার্থ রাখা নিষেধ। নিজেদের আহত করতে পারে এমন কোনো কিছুই তাদের কাছে থাকে না। এমন কি কাচের গ্লাসও নয়। জুতোগুলো পর্যন্ত কাপড়ের। কি আশ্চর্য পরিহাস! মৃত্যুদণ্ড পাওয়া একটা মানুষ নিজের হাতে নিজেকে খুন করতে পারবে না। তাকে অপেক্ষা করতে হবে—প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে নির্দিষ্ট দিনের সুনির্দিষ্ট সময়টির জন্যে। তার জীবন তখন আর তার নিজের নয়···রাষ্ট্রের।

একটা সিগারেটের প্রান্তভাগ ছিঁড়ে তামাকের কুচোগুলো মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে, ফের আমি নোট বইতে লিখতে শুরু করলাম।··· শর্ত সাপেক্ষে এখানে থাকা কালীন সময়ে আমার জন্যে কোনো রকমের বিশেষ সুবিধে মঞ্জুর করা হয় নি। বুঝতে পারলাম, পুরো একটা সপ্তাহ বিনা ধূমপানে থাকাটাই হয়তো আমার কাছে এক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে উঠবে। যাই হোক, কয়েক মিনিট পরেই বিরক্ত হয়ে তামাকগুলো আমি শৌচাগারে ফেলে দিয়ে, ভালো করে মুখ ধুয়ে এলাম। তারপরেই শব্দ শুনে বুঝলাম, অদূরে লোহার দরজাটা খুলে গেলো। চাকা লাগানো একটা ছোট্ট গাড়িতে করে দুই ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে একজন অফিসার বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছিলেন। অন্যমনস্কভাবে আমি নিজের কব্জির দিকে তাকালাম। ঘড়িটা হাতে নেই। তবে যেহেতু আমি সকাল এবং দুপুরের খাওয়া শেষ করে এখানে এসে ঢুকেছিলাম, তাই অনুমান করলাম—এটা হয়তো সন্ধ্যাবেলাকার খানা। কিন্তু এখনও আমার তেমন করে খিদে পায় নি।

ট্রেটা আমার দরজার একটা ফোকর দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দেওয়া হলো। হাত বাড়িয়ে ট্রেটা নিতে গিয়েই দেখলাম, আমি সরাসরি অফিসার ম্যাক ক্ল্যাসকির চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। এই ম্যাক ক্ল্যাসকিই সেদিন রাত্তিরে পার্কের মধ্যে মাইক কেলসনকে গ্রেপ্তার করেছিলো—যাকে পরবর্তীকালে লেখা কিছু কিছু প্রবন্ধে আমি নির্দয়ভাবে সমালোচনা করেছি। লোকটা আমাকে চিনতে পারলেও,

ভাবভঙ্গিতে তা বুঝতে দিলো না। খাবারটা নিয়ে এসে আমি তক্তোপোষে বসে খেতে শুরু করলাম। খাবারটা ভালোও নয়, আবার খারাপও নয়। মোটামুটি। রাষ্ট্র জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটানো পর্যন্ত এর সাহায্যে জীবনটাকে কোনক্রমে টিকিয়ে রাখা চলে। শক্ত কাগজে তৈরি কাঁটা চামচটা থেকে এক দলা চটকানো আলু আর খানিকটা বর্ণহীন ঝোল হঠাৎ বেসামাল হয়ে নিচে পড়ে গেলো। যে কোনো কারণেই হোক, আমার হাতটা আচমকা কেঁপে উঠেছিলো।

অবশেষে তক্তোপোষে পিঠ ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। শয্যাটি শক্তও নয়, নরমও নয়—তবে শেষ শয্যায় বিশ্রাম নেবার আগে পর্যন্ত শরীরটা এখানে বিশ্রাম নিতে পারে।

হ্যাঁ, অফিসার ম্যাক ক্ল্যাসকির কার্যাবলী সম্পর্কে আমার লেখা প্রবন্ধগুলো আদৌ স্তুতিব্যঞ্জক ছিলো না। একটি তরুণীর ভয়ার্ত চিৎকার এবং তার নিজের ভাষায় 'যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদ'—এ দুয়ের প্রভেদ সে বুঝতে পারে নি। এ জন্যে তাকে আমি রীতিমতো অভিযুক্ত করেছিলাম। অকুস্থলে সামান্যতম অনুসন্ধানের জন্যে মাইকের কাহিনীকে সে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয় নি, অভিযোগ ছিলো সে জন্যেও। সত্যি কথা বলতে কি, মাইক কেলসনের বিনা দোষে গ্যাস চেম্বারে যাবার জন্যে আমি অফিসার ম্যাক ক্ল্যাসকিকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম—আর এখন সেই ম্যাক ক্ল্যাসকিই আমার রক্ষক। জানি না, আমার প্রবন্ধগুলোর জন্যেই লোকটা পুলিস বিভাগ থেকে পালিয়ে এসে এখানে এই রাষ্ট্রীয় কারাগারে আশ্রয় নিয়েছে কি না। হয়তো সে স্রেফ কাজ পালটাতে চেয়েছিলো বলেই এই পরিবর্তন। কিন্তু সে যাই হোক না কেন, তাতে তেমন কিছু এসে যায় না। যা হবার তা হয়ে গেছে।

তবু চিন্তাগুলো আমাকে জ্বালাতন করতে থাকে।

আচমকা আবিষ্কার করি, আমি তক্তোপোষের ধার ঘেঁষে সোজা হয়ে বসে আছি···শিউরে উঠছে আমার মাথার চুলগুলো। যে চিৎকারটা আমাকে আধা-খ্যাচড়া ঘুম থেকে টেনে তুলছে, সেটা একেবারে অমানুষিক—পুরোপুরি জান্তব চিৎকার। প্রতিধ্বনিটা বারান্দায়

মিলিয়ে যাবার আগেই ফের ভেসে আসে চিৎকারটা। তারপর আবার। প্রতিটা অপার্থিব চিৎকারই আগেরটার চাইতে বেশি জোরালো। তারপর তীক্ষ্ণ সুরে সেই কাতর আবেদন: 'বাঁচাও··· বাঁচাও। দয়া করো আমাকে! আমার মরার কথা নয়! আমি ও কাজ করিনি···আমি নির্দোষ!'

আবার সেই আর্তনাদ। একটার পর একটা। অবশেষে লোহার দরজা খুলে রাতের প্রহরী ভেতরে আসে। তার পেছনে কালো ব্যাগ হাতে বেঁটেখাটো একটা লোক—সম্ভবত ডাক্তার। ওরা বস্টওয়েলের কুঠরীতে গিয়ে ঢোকে। স্পষ্টই শুনতে পাই, বস্টওয়েল ওদের কাছে মিনতি করছে। ওরা চলে যাবার পর আর্তনাদটা আস্তে আস্তে কমে গিয়ে আবার আগেকার সেই একঘেয়ে গোঙানি হয়ে যায়।

তাহলে ঘটনাটা এমনিই হয়েছিলো! মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে, পার্থিব কোনো শক্তি নেই যা তাকে রুখতে পারে—এবং তা জানা সত্ত্বেও—তবু আশা, আবেদন, বধির কতকগুলো কানের কাছে অর্থহীন চিৎকার। বস্টওয়েলের সামনে এখনও আরো চারটে রাত, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে ভরা পরিষ্কার চারটে রাত।

পরের রাতে চিৎকার এবং আবেদন-নিবেদন আরও অসহ্য হয়ে ওঠে। শিরদাঁড়া শিরশিরিয়ে ওঠে। স্নায়ুগুলো তছনছ হয়ে যায়! ডাক্তার এবং প্রহরীটা ফের এসে চলে যাওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকে সেই রক্ত জমাট করা বুকফাটা হাহাকার। পরদিন চিৎকারটা আরও তাড়াতাড়ি শুরু হয়ে যায়। ঠিক যেন অসহ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত কোনো বোবা জন্তুর তীক্ষ্ণ-করুণ আর্তনাদ আর সেই সঙ্গে একটানা ধপ্ ধপ্ আওয়াজ—যেন খালি হাতে কেউ দরজার গরাদ আর কুঠরীর দেয়ালে অনবরত ঘুষি মেরে চলেছে। ডাক্তার ভদ্রলোক এসে পৌঁছনোর পরেও আর্তনাদ চলতে থাকে। তারপর পা ঘষটে ঘষটে চলার আওয়াজ।

এক লাফে খাট থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, প্রহরী এবং

ডাক্তার চিৎকাররত বস্টওয়েলকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। ছুজনের মাঝখানে বস্টওয়েলের মাথাটা নিচের দিকে ঝুলছিলো বলে আমি ওর মুখটা দেখতে পেলাম না—শুধু ঘামে ভেজা জামার পেছন দিকে লেখা সংখ্যাটা দেখতে পেলাম। এখন ও আর মানুষ নয়, একটা সংখ্যামাত্র··· সংখ্যাটা ২২২২০।

বারান্দার দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যেতেই চিৎকারটা মিলিয়ে যায়···তক্তোপোষে বসে থরথর করে কাঁপতে থাকি আমি। আরও ছুটো রাত বাকি থাকতেই বস্টওয়েল সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে। এখন লোকটাকে নিয়ে ওরা কি করবে, কে জানে ?

সারাটা রাত আমি ঘুমোতে পারলাম না···তক্তোপোষের ধার ঘেঁষে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। প্রবল ঘামে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে উঠলো। একটু ধূমপানের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ আইঢাই করতে শুরু করলো। খানিকটা তামাকের কুচো খানিকক্ষণের জন্যে মুখে গুঁজে রাখলাম বটে, কিন্তু একটু পরেই থু থু করে সেগুলোকে মেঝের ওপরে ফেলে দিলাম। ভাবলাম, তাহলে মাইক কেলসনকেও এমনি ভাবে শেষ সময়টা কাটাতে হয়েছে···এমনি চরম হতাশার মধ্যে···কারণ সে-ও বুঝতে পেরেছিলো যে কেউ তাকে সাহায্য করতে আসবে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই !

হ্যাঁ, যে জন্যে এখানে এসেছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি। পেয়ে গেছি সেই আবেগ বিধুর নিবিড় অনুভূতি—মাইক কেলসনেব শেষ পরিচ্ছেদ লেখার মূল রসদ।

আচমকা অনুভব করলাম, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছি। বস্টওয়েলকে ওরা যদি ফের এখানে নিয়ে আসে, তাহলে আরও ছুটো রাত তার সেই বুকফাটা আর্তনাদ আমি আর সহ্য করতে পারবো না। আর যদি নিয়ে না-ও আসে, তাহলেও আমাদের চুক্তি মতো আরও চারটে দিন আমার পক্ষে এখানে বসে বসে বুড়ো আঙুল মটকানো একেবারেই অর্থহীন। অতএব প্রহরীটা আমার কুঠরীর মধ্যে প্রাতরাশের থালিটা ঢুকিয়ে দিতেই বললাম,

'ওয়ের্ডেন সিম্‌স্‌কে গিয়ে বলুন, আমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই।'

লোকটার তীক্ষ্ণ মুখখানা প্রশ্নালু ভঙ্গিমায় একটু বেঁকে উঠলো।

ফের বললাম, 'এখানে আমার এক সপ্তাহ থাকার কথা, কিন্তু আমি এক্ষুনি এখান থেকে বেরুতে চাই। আপনি ওয়ার্ডেনকে গিয়ে বলুন, উনি বুঝতে পারবেন।'

আধঘণ্টা বাদে লোকটা বগলের নিচে একপ্রস্থ কাপড়-চোপড় নিয়ে এসে দরজা খুলে বললো, 'এদিকে আসুন।'

তাড়াতাড়ি খাতা-পেন্সিলগুলো গুছিয়ে নিয়ে আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম। আসলে এ জায়গাটার সম্পর্কে আমার মনে কেমন যেন একটা আতঙ্কবোধ জেগে উঠতে শুরু করেছিলো এবং সেটা আমার আদৌ ভালো লাগছিলো না।

লোকটা অন্য একটা কুঠরীর তালা খুললো। তারপর পোশাকের বাণ্ডিলটা তক্তোপোষের ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'ভেতরে ঢুকুন।'

আমার পেছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি যে, বস্টওয়েল এই কুঠরীতেই বন্দী হয়ে ছিলো এবং তক্তোপোষে ছড়িয়ে থাকা বাণ্ডিলটা আসলে আমার জন্যেই নিয়ে আসা আর একপ্রস্থ উর্দি।

'এর আর দরকার হবে না,' ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। 'আপনি ওয়ার্ডেনের সঙ্গে কথা বললেই...'

'ওয়ার্ডেন এখানে নেই—ছুটিতে আছেন।'

'তাঁর জায়গায় অন্য কেউ তো নিশ্চয়ই আছেন! তাঁকে গিয়ে বলুন, আমি এখান থেকে বেরুতে চাই! কিংবা গ্যাজেটের সম্পাদক জে. টি. টলম্যানকে ফোন করুন!'

'কয়েদীদের হয়ে কোনো খবর বাইরে পাঠানো নিষেধ,' মুখ ঘুরিয়ে নিলো লোকটা। 'নিয়ম নেই।'

'আরে!...এই যে, শুনুন—'

কিন্তু লোহার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। তারপর শুধু নিবিড় নৈঃশব্দ্যের একতম রাজত্ব।

বেশ খানিকক্ষণ তক্তোপোষের ধার ঘেঁষে বসে রইলাম আমি। মাথায় অসংখ্য চিন্তার জটিলতা···চিন্তাগুলো ক্রমশ অরুচিকর হয়ে ওঠে। তারপর অন্য কিছু করার নেই বলে উর্দিটা পালটাতে শুরু করি আমি। নতুন পাৎলুনটা পরে, জামাটা হাঁটুর ওপরে রেখে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি ছাদের দিকে। এটা সপ্তাহের শেষ। কাজেই এমনও হতে পারে যে ওয়ার্ডেন হয়তো সাপ্তাহিক ছুটিতে কোথাও গেছেন, হয়তো আজ রাতে কিংবা কালই ফিরে আসবেন। আর যাই হোক জে. টি. হয়তো শীঘ্রিই আমার খবরাখবর নেবার জন্যে একবার টেলিফোন করবেন। কাজেই, বাস্তবিকপক্ষে তেমন দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।···অবশেষে জামাটা তুলে ধরি আমি। এবং পরমুহূর্তেই এক প্রচণ্ড আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে···কাঁপা কাঁপা আঙুলের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে জামাটা লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপরে।··· জামাটার পিঠে বড়ো বড়ো অক্ষরে একটা সংখ্যা লেখা—সংখ্যাটা ২২২২০।

তক্তোপোষ থেকে একলাফে আমি দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। সমস্ত বারান্দাটা একেবারে নির্জন···চতুর্দিক কবরের মতো নিস্তব্ধ নিঝুম। প্রাণপণে চিৎকার করে ডাকলেও সাড়া দেবার মতো কেউ কোথাও নেই। অথচ আমাকে যে মানুষটার উর্দি দেওয়া হয়েছে, আর দুদিনের মধ্যেই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার কথা।

অস্থির পা দুটো ফের আমাকে তক্তোপোষের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু বস্টওয়েলের কি হলো? কোথায় আছে সে? লোকটা কি ইতিমধ্যেই মানসিক আঘাত বা অন্য কিছুতে মারা গেছে? যদি তাই হয়, তাহলে তার সংখ্যাটা আমাকে কেন দেওয়া হলো? কয়েদীদের ক্রমিক সংখ্যা তো কক্ষনো পালটায় না! এখানে এসে ঢোকার সময় প্রত্যেককে একটা করে সংখ্যা দেওয়া হয় এবং বেরুবার সময় তাদের ক্রমিক সংখ্যা সেই একই থাকে। তা হলে? নিশ্চয়ই কেউ

কোথাও একটা ভুল করে ফেলেছে। স্রেফ ভুল। কয়েদীদের জামাগুলো কেউ ভুল করে মিশিয়ে ফেলেছে।

কতোক্ষণ বসে ছিলাম জানি না। এক সময় শুনতে পেলাম, বারান্দার লোহার দরজাটা একবার খুলে ফের বন্ধ হয়ে গেলো। একলাফে দরজার কাছে গিয়ে দেখি, ছোট্ট ঠেলাগাড়িতে করে ম্যাক ক্ল্যাসকি আমার জন্যে খাবার-দাবার নিয়ে আসছে। ম্যাক ক্ল্যাসকি! ওর কাছে আমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব আছে! ওর সম্পর্কে আমি যে প্রবন্ধগুলো লিখেছি, তারপরেও ওর কাছ থেকে অনুগ্রহ চাইতে আমার প্রচণ্ড অনীহা। কিন্তু···

'আচ্ছা ম্যাক ক্ল্যাসকি, আপনি তো আমাকে চেনেন—তাই নয় কি?' লোকটা আমার গরাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই বললাম, 'আমি গ্যাজেট পত্রিকার বিল হেনড্রিকস। মাইক কেলসনের ব্যাপারে আমি আপনার সম্পর্কে গোটা কতক প্রবন্ধ লিখেছিলাম। আমি··· আমি স্বীকার করছি যে সেগুলো আপনার সম্পর্কে খুব একটা ভাল ধারণা প্রকাশ করে নি। কিন্তু···' আমি ইতস্তত করতে থাকি। 'যাই হোক, আপনি আমাকে চেনেন তো?'

'এর আগে আমি জন্মেও আপনার নাম শুনিনি,' আমার চোখে চোখ রেখে খাবারের থালিটা ভেতরের দিকে ঢুকিয়ে দিলো লোকটা। 'আমার কাছে আপনি শুধুমাত্র একটা সংখ্যা—বাইশ হাজার দুশো বিশ নম্বর।'

আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক, আমার হাতে খাবারের থালি। ম্যাক ক্ল্যাসকি ঠেলাগাড়িটা ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে। অসহায়ের মতো আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'ম্যাক ক্ল্যাসকি, শুনুন! আপনি ওয়ার্ডেনকে গিয়ে বলুন যে···'

কিন্তু বৃথাই! জায়গাটার নৈঃশব্দ্য বজায় রাখার জন্যেই বারান্দার শেষপ্রান্তে লোহার দরজাটা যেন দ্রুত বন্ধ হয়ে যায়।

খাবার-দাবার আমি স্পর্শও করলাম না। তক্তোপোষে থালিটা রেখে বসে রইলাম স্থবিরের মতো।···ম্যাক ক্ল্যাসকি মিথ্যে কথা

বলেছে! আমাকে সে নিশ্চয়ই চেনে!···বাইশ হাজার ত্নশো বিশ নম্বরী জামাটা আমাকে ভুল করে দেওয়া হয় নি। ওই সংখ্যাটা কার, ম্যাক ক্ল্যাসকি তা জানে—এবং আমাকে যে ওই জামাটা দেওয়া হয়েছে, তা-ও তার বিলক্ষণ জানা···

ত্ন-হাঁটুর ওপরে কনুই রেখে ত্নহাতের পাতায় আমি নিজের মাথাটা চেপে ধরলাম···অনুভব করলাম, ঘাড়ের কাছে চুলগুলো নিজেদের ইচ্ছে মতো খাড়া হয়ে উঠছে। না না, ম্যাক ক্ল্যাসকি নিশ্চয়ই··· শুধুমাত্র কয়েকটা প্রবন্ধের জন্যে সে নিশ্চয়ই তা করবে না! কিছুতেই না! আর করতে চাইলেও, শেষ অব্দি তা অবশ্যই করতে পারবে না! কিন্তু তা হলেও···

হয়তো আমার ওই প্রবন্ধগুলো সত্যিই লোকটাকে আঘাত দিয়েছে, ওর আত্ম-অহংকার চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে। এদিকে ওয়ার্ডেনও এখানে নেই। ইতিমধ্যেই যদি সব কিছু শেষ হয়ে যায়, তাহলে সরকারী নথিপত্রে এটা একটা 'চরমতম ভুল' বলেই স্থান পাবে এবং ম্যাক ক্ল্যাসকির কপালেও কঠোরতম তিরস্কার জুটবে। কিন্তু তাতে আমার কি লাভ!

ছুটে গিয়ে দরজার গরাদগুলো আঁকড়ে ধরলাম আমি, দরজাটাকে ঝাঁকুনি দিতে চেষ্টা করলাম বারবার। বারান্দার শেষপ্রান্তে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোহার দরজাটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম প্রাণপণে। কিন্তু আমার চিৎকারগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে যেন আমাকেই বিদ্রূপ করতে লাগলো। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নিজের কুঠরীতেই আমি পায়চারি করতে শুরু করলাম—কারণ ম্যাক ক্ল্যাসকি খাবারের থালিটা নিতে না আসা পর্যন্ত আমার আর কিছুই করার নেই। কিন্তু লোকটা এলো সেই সন্ধ্যা বেলাকার খাবার নিয়ে। এবং সে একা আসে নি, সঙ্গে একটা গাট্টাগোট্টা প্রহরীকেও নিয়ে এসেছে।

প্রহরীটা কুঠরীতে ঢুকে আমার ছেড়ে রাখা উর্দি আর সকালের থালিটা তুলে নিলো।

'শুনুন, আপনি দয়া করে···' বলতে শুরু করেই বুঝলাম, লোকটা

আমার কথায় আদৌ কান দিচ্ছে না। ওর হাতে ঘুষি মারতে মারতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে! ওয়ার্ডেন বা তাঁর বদলে যিনি এখানকার দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁকে গিয়ে আপনি বলুন যে…'

লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। অনুভব করলাম, আমার কথা শোনার কোনো ইচ্ছেই লোকটার নেই। এ সমস্ত কথা সে এর আগে বহুবার শুনেছে। আমার আগে বস্টওয়েল, কেলসন এবং আরও অনেকে যা করেছে—আমি সেগুলোরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র। কাজেই লোকটা এসবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।…তক্তোপোষে লুটিয়ে পড়ে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। শব্দ শুনে বুঝলাম, নৈঃশব্দ্যকে ফের আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে ভেতরে রেখে, বারান্দার শেষপ্রান্তে লোহার দরজাটা ফের বন্ধ হয়ে গেলো।…

লোহার দরজা! ওই দরজার ওধারে বাইরের পৃথিবী—আমার এখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পৃথিবী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ওই দরজা দিয়ে একটা খবর আমাকে বাইরে পাঠাতেই হবে। যেমন করেই হোক!

অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করে, মাথায় একটা মতলব এলো। মতলবটা যদিও তেমন আহা মরি কিছু নয়, তবু এতে কাজ হলেও হতে পারে। ঠিক করলাম, খাতার একটা পাতায় আমি সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে লিখবো—লিখবো আমার উপন্যাসের কথা, লিখবো কিভাবে টলম্যান এবং ওয়ার্ডেন সিম্‌স্ উপন্যাসের পরিবেশ রচনায় সাহায্য হবে বলে আমাকে এখানে রাখার বন্দোবস্ত করেছেন এবং যে কোনো কারণেই হোক, কিভাবে একটা সাংঘাতিক রকমের ভুল হয়ে গেছে। পরিশেষে আমি সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাবো। দুটো কাগজে আলাদা করে এই একই কাহিনী লিখবো। তারপর একটা কাগজ আমার খাবারের ট্রেতে থালি চাপা দিয়ে রাখবো, যাতে সেটা রান্না-ঘরে কারুর হাতে গিয়ে পড়ে। আর একটা দেবো সকাল বেলাকার প্রহরীর হাতে—যদি লোকটা কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে কাগজটা পড়ে ছাখে, এই ভরসায়।

খাতা থেকে একটা সাদা পাতা বেছে নিয়ে পেন্সিলটা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু পাগলের মতো খুঁজেও কোনো পেন্সিল পাওয়া গেলো না—প্রহরীটা তখন আমার ছেড়ে রাখা জামাটামার সঙ্গে পেন্সিল-গুলোও নিয়ে গেছে !···মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী নিজের কাছে এমন কিছু রাখতে পারবে না, যার সাহায্যে সে নিজেকে আহত করতে পারে ! কারণ, তার জীবন তখন রাষ্ট্রের হাতে !···হায়, ঈশ্বর !

খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফের তক্তোপোষে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি। দুঃস্বপ্নের মিছিলের মধ্যে সারাটা রাত মূর্হূতের মতো কেটে গেলো। বুঝতে পারছিলাম, আমার অজান্তে আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতর গোঙানি বেরিয়ে আসছে, কিন্তু আমি কিছুতেই তা থামাতে পারছিলাম না।

এখন বাইরের পৃথিবীতে খবর পাঠাবার জন্যে একটি মাত্র উপায়ের কথাই আমি চিন্তা করতে পারছিলাম এবং সেটা সকাল বেলাকার প্রহরীর সাহায্যে। স্রেফ গলার জোরেই লোকটাকে আমার কথা শোনাতে হবে।···

সকালের প্রহরী আসার আগেই আমি তৈরি হয়েছিলাম, তাই বড়ো দরজাটা খোলার শব্দ পেয়েই গরাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর যেমনি দেখলাম লোকটা ছোট্ট ঠেলাগাড়িটা নিয়ে বারান্দা ধরে এগিয়ে আসছে, ওমনি চিৎকার করে বললাম, 'শুনুন, আমি বস্টওয়েল নই ! আমি গ্যাজেট পত্রিকার বিল হেনড্রিকস ! এখন এখানকার যিনি কর্তা, তাঁর কাছে গিয়ে বলুন···'

'শান্ত হোন,' ছোট্ট গাড়িটা থেকে আমার থালিটা তুলতে গিয়ে লোকটার চোখা নাকটা একপাশে কুঁচকে উঠলো। 'শীগগিরই আপনার কষ্টের শেষ হয়ে যাবে—আজ বিকেলেই আপনি সঙ্গী পাবেন।'

'সঙ্গী ?' যান্ত্রিকভাবে থালিটা হাতে নিয়ে আমি তক্তোপোষে গিয়ে বসলাম।···সঙ্গী !···

আচমকা আমার সমস্ত কষ্ট যেন জল হয়ে গলে গেলো। থালিটা এক পাশে সরিয়ে রেখে আমি কুঠরীটার এ মাথা থেকে সে মাথা অব্দি

পায়চারি করতে শুরু করলাম। ওই জামাটাকে—বাইশ হাজার দুশো বিশ নম্বরী ওই জঘন্য জামাটাকে আমি লাথি মেরে ফেলে দিলাম মেঝের ওপরে···ছাদের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম হোহো করে।··· আমি কেমন আছি দেখার জন্যে ওয়ার্ডেন সিম্‌স্‌ বা জে. টি.—যে কোনো একজন আজই আসছেন। এই কুঠরীতে আমাকে দেখে ওরা কি অবাক হবেন না? বেচারী ম্যাক ক্ল্যাসকিকে কতো জবাবদিহিই না দিতে হবে এ জন্যে!

বহুক্ষণ ধরে আমি কিছু খাইনি, প্রাতরাশ খাবার জন্যেও কোনো তাগিদ অনুভব করলাম না। তবে কাগজের ছোট্ট পেয়ালায় করে আনা ঈষদুষ্ণ ঘোলাটে কফিটা খেয়ে নিলাম।···দুপুর বেলা ম্যাক ক্ল্যাসকি যখন খাবারের থালিটা গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরের দিকে এগিয়ে দিলো, তখন ওই খাবার দিয়ে সে কি করতে পারে সে সম্পর্কে ম্যাক ক্ল্যাসকিকে একটা যথোপযুক্ত কথা শুনিয়ে, থালিটা আমি ফের বাইরের দিকে ঠেলে দিলাম। আর খানিকক্ষণের অপেক্ষা মাত্র! শহরে গিয়ে আমি কি করবো, তা এতোক্ষণে ঠিক করা হয়ে গেছে। প্রথমেই টুফিজে গিয়ে কয়েক পাত্র বিয়ার চড়াবো। তারপর যদ্দূর সম্ভব বড়োসড়ো একটা স্টেক খুঁজে বের করে, সেটাকে উদরস্থ করবো। এবং তারপর চমৎকার একটা চুরুট।

বেশ কয়েকঘণ্টা বাদে বড়ো দরজাটা খোলার এবং ফের সশব্দে বন্ধ হয়ে যাবার শব্দ পেলাম। তারপরেই প্রতিধ্বনি তুলে বারান্দা ধরে এগিয়ে আসা একজোড়া পায়ের শব্দ। কুঠরীর দরজাটা খুলতেই আমি যাতে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেজন্যে তাড়াতাড়ি খাতাপত্রগুলো নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু একটু পরেই যাঁকে মুখোমুখি দেখতে পেলাম, তিনি লম্বা রোগা চেহারার এক ভদ্রলোক···পরনে আলখাল্লার মতো লম্বা পোশাক, জামার সাদা কলার পেছনের দিকে ঘোরানো।

আমি হাঁ হয়ে গেলাম।

'আসুন,' গম্ভীর এবং আশ্বাসজনক কণ্ঠস্বরে ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে বসা যাক।'

কুঠরীতে কোনো কুর্সি নেই—থাকা বিপজ্জনক। অতএব তক্তো-পোষের ধার ঘেঁষে দুজনে মুখোমুখি বসলাম।

'আপনি কি আমাকে কিছু বলতে চান?' প্রশ্ন করলেন উনি।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো কাহিনীটা ওকে শুনিয়ে আমি বললাম, 'কাজেই, এ কথাগুলো আপনি ওয়ার্ডেনকে গিয়ে বলুন।'

সহানুভূতির ভঙ্গিমায় ঘাড় নাড়লেন উনি, 'ওয়ার্ডেন বর্তমানে এখানে নেই, তবে আজ রাতে উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন।' এক মুহূর্ত নীরবতার পর উনি ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে বলার মতো আপনার কি আর কোনো কথাই নেই?'

'না। তবে একটা কথা—ওয়ার্ডেন যে আজ রাতেই ফিরে আসছেন, এজন্যে আমি 'যারপর নাই' আনন্দিত!'

প্রহরীকে ডেকে, উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর গরাদের ওধার থেকে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটা কথা আমি আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই। আজ রাত্তিরে আপনি নিজের পছন্দ মতো যে কোনো জিনিস খেতে চাইতে পারেন—মানে, আপনাকে দেওয়া সম্ভব, এমন যে কোনো জিনিস।···আসলে এটাই রীতি কিনা···'

আমার সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তের মধ্যে একতাল নরম তুষার হয়ে ওঠে।

ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আমার মুখের বিবর্ণতা লক্ষ্য করে থাকবেন। তাই স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'মনে সাহস রাখুন। কাল আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্যে আপনার যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপ আমরা আপনার সঙ্গে থাকবো।'

গরাদ আঁকড়ে থাকা আমার মুঠিদুটো রক্তশূন্য হয়ে ওঠে, মাথাটা ঝুলে পড়ে সামনের দিকে।···

লোকটা আমার একটা কথাও বিশ্বাস করে নি!···

ম্যাক ক্ল্যাসকি যখন আমার সান্ধ্য-আহার নিয়ে এলো, তখন আমি আরও একবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালালাম। কিন্তু লোকটা এমনভাবে

তাকালো, যেন ইতিমধ্যেই আমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে।···খাবারের থালিটা আমি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম···লক্ষ্য করলাম, অন্য ধারের দেয়াল বেয়ে আঠালো খাদ্যবস্তুগুলো অবসন্নের মতো একটু একটু করে নিচের দিকে নেমে আসছে।···

তক্তোপোষে বসে আমি আমার কেঁপে কেঁপে ওঠা শরীরটার ওপরে ফের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ওয়ার্ডেন আজ রাত্তিরে ফিরে আসবেন। কাজেই অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া, আমার আর কিছুই করার নেই। এ যেন এক অশেষ অনন্ত প্রতীক্ষা। হঠাৎ মনে হলো, ওয়ার্ডেন ফিরে এলেও আমার কোনো লাভ নেই। কারণ আমার কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা তিনি কিছুই জানতে পারবেন না!

তক্তোপোষ থেকে উঠে একলাফে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেমন করেই হোক, ওয়ার্ডেনকে আমার সমস্ত কথা জানাতেই হবে! চিৎকার করতে শুরু করলাম প্রাণপণে—যাতে আমার কণ্ঠস্বর বারান্দার ওই লোহার বিভাজকটা পেরিয়ে অন্যদিকে গিয়ে পৌছোয়। কিন্তু বারান্দার দেয়ালে বৃথাই আমার চিৎকারের প্রতিধ্বনি মাথা খুঁড়ে মরলো—সাড়া মিললো না। কুঠরীর মধ্যে পাগলের মতো তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখলাম, যদি শব্দ করার মতো কোনো জিনিসের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই নেই। দরজার গরাদগুলো আমি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করলাম, খালি হাতে ঘুষি মারতে লাগলাম গরাদের গায়ে।···কোথাও, কাউকে, আমার কথা শুনতেই হবে···

অনেকক্ষণ পরে বারান্দার দরজাটা খুলে গেলো। রাতের প্রহরী ভেতরে এসে ঢুকলো, সঙ্গে ছোট একটা কালো ব্যাগ হাতে একজন বেঁটেখাটো মানুষ। কুঠরীর দরজা খুলে ওরা ভেতরে এসে ঢুকতেই আমি পাহারাদারটাকে চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলাম, 'ওয়ার্ডেনকে নিয়ে এসো! তাঁকে গিয়ে বলো যে তাঁরা ভুল করে অন্য লোককে এখানে পুরে রেখেছেন—'

অনুভব করলাম, একটা সূচ আমার নগ্ন বাহুতে ঢুকে পড়েছে।

ওষুধটা নিশ্চয়ই খুব কড়া ছিলো, কারণ এক মুহূর্ত পরেই মানুষ দুটোর মুখ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে এলো। ওরা আমাকে তক্তোপোষে শুইয়ে দিলো, অস্পষ্ট কুয়াশার সমুদ্রে ভেসে চললাম আমি। শুধু আবছা আবছা মতো বুঝতে পারলাম, বড়ো দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো…বন্ধ হয়ে গেলো সমস্ত বাস্তবতা আর সবটুকু আশা।…

ঠিক ঘুম নয়—অর্ধ-অচেতন অবস্থায় ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসের কথাটাই বারবার আমার মনে জেগে উঠছিলো। মাইক কেলসনের শেষতম মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমি স্বেচ্ছায় এখানে এসে ঢুকেছিলাম…বুঝতে চেয়েছিলাম, একটা গৌরবময় কাজের ফলস্বরূপ কেলসন যখন নিজের শেষ পরিচ্ছেদটুকু লিখে ফেললো তখন তার মনের অবস্থা ঠিক কেমনটি হয়েছিলো। এখন নিখুঁত ভাবে সেই একই অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার, যে অভিজ্ঞতা আমার নিজের জীবনেরই শেষ পরিচ্ছেদ হয়ে উঠবে। এবং এমনটি হবার একমাত্র কারণ, আমি জীবনে এই প্রথম একটা কাজের মতো কাজ করতে চেষ্টা করেছিলাম!

খুব ভোরে ওরা এসে হাজির হলো—তিনটে পাহারাদার এবং কালো আলখাল্লা পরা আর একজন মানুষ। আমি চিৎকার করে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলাম। কিন্তু ওরা আমাকে জোর করে কুঠরী থেকে বের করে, বারান্দা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চললো সেই বড়ো দরজাটার বিপরীত দিকে। তারপর স্বল্প-আলোকিত একখানা ঘর। আবছা আলোয় আমি শুধু এক সারি অস্পষ্ট মুখ দেখতে পেলাম। ওরা আমাকে জোর করে একটা ছোট ঘরে ঢুকিয়ে দিলো—ঠিক যেন বড়ো ঘরের মধ্যে একটা বাক্স—তারপর বন্ধ করে দিলো দরজাটা।… হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম আমি, গোঙাতে লাগলাম অস্ফুট স্বরে। তারপর যেন গ্যাসের গন্ধ পেলাম। গ্যাস? না না, গ্যাস তো গন্ধ-হীন হবে! আস্তে আস্তে সেটা আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে… শরীরের ভেতরকার সমস্ত অলিগলিতে…

আমি শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে রাখার চেষ্টা করলাম এবং দেখলাম,

আমার কেঁপে কেঁপে ওঠা শরীরটার ওপরে নিজের সবটুকু নিয়ন্ত্রণই আমি হারিয়ে ফেলেছি। পরম ক্লান্তিতে দুচোখ বন্ধ করে আমি অপেক্ষা করে রইলাম, জোর করে শূন্য করে রাখতে চেষ্টা করলাম শ্রান্ত মনটাকে।

ফের যখন চোখ খুললাম, তখন দেখি দরজাটা খোলা। হতবিহ্বল হয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম আমি, টলতে টলতে এগিয়ে চললাম দরজাটার দিকে। তারপর দরজার পাল্লাটা ধরে বাইরের দিকে পা বাড়ালাম।···

বাইরের ঘরটাতে এখন ঝলমলে আলোর রোশনাই। সেই সারি বাঁধা মুখগুলো এবারেও দেখতে পেলাম।···একজন অফিসার—তাঁর কুর্সির পেছনে খুলে রাখা একটা কালো রঙের আলখাল্লা। ম্যাক ক্ল্যাসকি। ওয়ার্ডেন সিম্‌স্‌। এবং জে. টি. টলম্যান।···ওরা সকলেই বনমানুষের মতো মুখ ভেংচে হাসছে—শুধুমাত্র জে. টি. বাদে। জে. টি. একেবারে পাগলের মতো হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন যেন।

আমি যে আবেগময় অনুভূতির খোঁজ করছিলাম, তা কি পেয়েছিলাম ?

পেয়েছি বই কি, আলবৎ পেয়েছি ! জে. টি.কে ধন্যবাদ—আর ধন্যবাদ তাঁর ভাঁড় সদৃশ বিশেষ প্রভাবশালী বন্ধু-বান্ধবদের।

তাহলে এবারে কি আমি সেই মহান অ্যামেরিকান উপন্যাসখানা শেষ করতে যাচ্ছি ?

করবো বইকি, নিশ্চয়ই করবো ! মনটা একটু শান্ত আর হাত-দুটোর এতো কাঁপাকাঁপি একটু বন্ধ হলেই করবো।

দ্য ফাইনাল চ্যাপটার : রিচার্ড ও. লিউইস

॥ আমাদের প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থ ॥

লীলা মজুমদার

গডফাদার—ম্যারি ও পূজো (১ম খণ্ড)

ঐ (২য় খণ্ড)

অসিত সরকার

পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা

হারানো ট্রেন-স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

মপাসাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প

মোরাভিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প

ক্রীতদাস-এরিক করডার

আনা কারেনিনা—লিও তলস্তয়

ভ্যালি অফ ডলস

রূপক মিত্র

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক

সিদ্ধার্থ ঘোষ

লু-শুন শ্রেষ্ঠ গল্প

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী

শৈবাল চক্রবর্তী

জুল ভের্ণ কিশোর অমনিবাস

শার্লক হোমস কিশোর অমনিবাস [যন্ত্রস্থ]